রাসূলুল্লাহর ﷺ শিক্ষাদান পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

রাসূলুল্লাহর ﷺ শিক্ষাদান পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড.মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : যুলহিজ্জা ১৪৩৬
আশ্বিন ১৪২২
সেপ্টেম্বর ২০১৫

মুদ্রণে :
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

Rasulullahr (sm) Shikhkhadan Poddhoti Written by Dr. Muhammad Abdul Mabud & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 1st Edition May 2011, 2nd Edition September- 2015 Price Taka 300.00 only.

প্রকাশকের কথা

একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সামগ্রিকভাবে জাতিটিকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তুলতে হয়। তবে কেউ কেউ বৈষয়িক উন্নতিকেই কেবল উন্নতি মনে করেন, নৈতিক উন্নতির দিকে তাঁরা নজর দেন না। কিন্তু এটি উন্নতির খণ্ডিত চিত্র। সত্যিকার অর্থে একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সেই জাতির বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন শিক্ষাই মানুষের উপযোগী শিক্ষা যেই শিক্ষা মানুষকে বৈষয়িক জ্ঞান এবং নৈতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলে। পৃথিবীর প্রথম মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রথমে বস্তু জ্ঞানের সবক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষাই যেহেতু মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই জন্য ওহীর মাধ্যমে নীতি জ্ঞানও পাঠিয়েছেন। পরিপূর্ণ নীতিজ্ঞানের অনবদ্য গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম।

নতুন নতুন মানব প্রজন্মের নিকট জ্ঞান বিতরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন আব্বা-আম্মা। কিন্তু তাদেরকে ব্যাপক জ্ঞান প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষকগণ।

মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে নীতি জ্ঞান। এই নীতি জ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন নবী-রাসূলগণ। আর এই শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব, জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা, জ্ঞান বিতরণকারীর সুমহান কর্তব্য এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর দিক-নির্দেশনা অতুলনীয় বৈশিষ্ট মণ্ডিত।

সুখের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ সুনিপুণভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তাঁর রচিত "রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষাদান পদ্ধতি" নামক মূল্যবান গ্রন্থে। শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ অবগত হওয়ার জন্য এই বইটি খুবই সহায়ক। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম নাজির আহমদ

সূচিপত্র

এক.

দুই

তিন.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، وصلّى الله على رسوله سيِّدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন উম্মী মানুষ। তিনি নিজেও স্বীকার করতেন এবং বলতেন :

نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نكتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ

'আমরা একটা উম্মী জাতি, আমরা লিখিনা, হিসাব করি না।'

এই উম্মী জাতির পার্শ্ববর্তী পারসিক ও রোমান জাতির মধ্যে তখন যথেষ্ট জ্ঞান চর্চা ছিল এবং তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানী মানুষ বিদ্যমান ছিলেন। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব ঘটে এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে চিরকালের জন্য বিশ্বমানবতার পরিশুদ্ধকারী ও শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠান। আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

তিনিই তাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতিপূর্বে তো তারাই ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (সূরা আল জুমু'আ, আয়াত : ২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও নিজেকে মু'আল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন। যেমন তিনি একদিন একটি

শিক্ষার আসরে এ কথা বলে বসে পড়েন যে : إنما بعثتُ مُعَلِّما আমাকে তো মু'আল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।
আরেক দিন তিনি 'আয়িশাকে (রা) বললেন :

إن الله لم يبعثنى مُعَنِّتاً ولامُتَعَنِّتا، ولكن بَعثَنى مُعَلِّماً مُيَسِّراً

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে কাউকে কষ্টদানকারী এবং কারো পদস্খলন ও কষ্ট কামনাকারী হিসেবে পাঠান নি; বরং সহজ-সরল পথের দিশারী মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে পাঠিয়েছেন।

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম 'আস-সুলামী (রা) সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে সালাতে দাঁড়িয়েছেন। একজন মুসল্লী হাঁচি দিল, আর তিনি জোরে يَرْحَمُكَ الله (ইয়ারহামুকাল্লাহ) উচ্চারণ করলেন। পাশের মুসল্লীরা বড় বড় চোখ করে তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন : তোমরা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছো কেন? তারা নিজেদের উরুতে থাপ্পড় মেরে তাঁকে চুপ করতে বলছিলেন। সবশেষে তিনি চুপ করেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এত সুন্দরভাবে বিষয়টি শিখিয়ে দেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন এই বলে :

ما رأيتُ معلِّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ماكهرنى ولا ضربنى و شَتَمَنِى.

আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে বকাবকি করেন নি, মারেন নি এবং গাল-মন্দও করেন নি।

মু'আবিয়া 'আস-সুলামী (রা) অতি সহজ-সরল ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তাঁর যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে গেছেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবের পূর্বের ও পরের মানবজাতির ইতিহাস তাঁর সেই অভিব্যক্তি শতভাগ সত্য বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানবজাতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে যে সকল মনীষীর নাম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে পাওয়া যায়, আমাদের এই মহানবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে তাদেরকে অতি ম্রিয়মান দেখা যায়।

একজন বরেণ্য শিক্ষকের সত্যিকার পরিচয় যেমন তাঁর কৃতী ছাত্রদের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তেমনি ইতিহাসে তাঁর স্থান ও মর্যাদাও নির্ধারিত হয় অনেকটা তাঁদেরই দ্বারা। যে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী এই মহান শিক্ষকের নিকট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং যাঁদের সংখ্যা হবে লক্ষাধিক, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন শিক্ষকই কি সমসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষক বলে দাবী করতে পারবেন? শুধু কি সংখ্যার দিক দিয়েই অতুলনীয় ছিলেন? না, তা নয়, বরং তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানের দিক দিয়েও তাঁর তুলনা নেই। আমরা যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী বলি, তাঁরাই তো ছিলেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রী। মাত্র তেইশ বছর তিনি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। তাঁর সকল ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু পূর্ণ তেইশ বছর তাঁর দারসে (পাঠ দানের আসরে) বসার সুযোগ পাননি। অনেকে হয়তো তেইশ বছরই পেয়েছেন, যেমন : আবূ বাকর, 'উছমান, 'আলী (রা) ও আরো অনেকে; কিন্তু অনেকে দশ, পাঁচ, দুই, এক বছর এবং অনেকে কয়েক মাস মাত্র বসেছেন। পরবর্তীকালের মানুষ তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁদের উপর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব, তাঁদের নৈতিকতা এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। মানবজাতির ইতিহাসের বিস্ময়কর নায়ক 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চরম দুশমনির মধ্য দিয়ে তাঁর ছয়টি বছর কেটে যায়। যখন তিনি সত্যকে জানলেন তখন তাঁর জীবনেরও অর্ধেক কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কিন্তু মক্কার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারেননি। মক্কার মানুষের নিকট একজন রগচটা ও দুর্ধর্ষ ধরনের মানুষরূপে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার আসরে বসলেন। ইতিহাসে তাঁর স্থান কোথায় তা পৃথিবীর মানুষের সামনেই আছে। সমর বিশারদ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা) দু'জনই ইসলামের ছায়াতলে আসেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে। মাত্র পাঁচটি বছর তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার আসরে বসার সুযোগ পান। এ সময়ের সবটুকু নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহচর্যে কাটাতে পারেন নি। কারণ বেশি সময় তাঁদের কাটাতে হয়েছে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় রণক্ষেত্রে। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা বহু যুদ্ধ করেছেন। যে সমর নৈপুণ্য তাঁরা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন তা শিখলেন কোথা থেকে? আজকের সভ্যতাগর্বী বিশ্ব প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয়ী বাহিনীর হাতে কিভাবে মানবতা ভূলুণ্ঠিত এবং মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। কিন্তু সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের সেই সব সেনানায়ক, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, 'আমর

ইবন আল-'আস, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও অন্যদের হাতে মানবাধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে অথবা মানবতার অপমান হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ ইতিহাস উপস্থাপন করতে পারবে না।

তাঁরা শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় অতি সঙ্কটজনক পর্যায়েও মানবতা, মানবাধিকার, নারীর মান-মর্যাদা, সাধারণ মানুষের বিষয়-সম্পত্তি অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারা দিয়েছেন।

আর যদি শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কথা বলেন, তাহলে এই উম্মী নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মী জাতিকে স্বল্পতম সময়ে যেভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বের মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয় করে তোলেন, তার কোন তুলনা ইতিহাসে নেই। বালাযুরীর মতে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবের সময় মক্কার কুরাইশ গোত্রে হাতে গোনা মাত্র সতের জন মানুষ কিছুটা লিখতে-পড়তে জানতো। মদীনার অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। কিন্তু তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন মক্কা-মদীনায়– নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর এমন কেউ ছিলেন না যারা কিছুটা লিখতে-পড়তে পারতেন না। তখন মক্কা-মদীনা ছাড়াও গোটা আরব উপদীপের প্রতিটি শহর, মরুভূমির প্রতিটি বেদুঈন জনপদে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার প্লাবণ বয়ে চলেছে। আনাস ইবন মালিক ও যায়িদ ইবন ছাবিত (রা) কৈশরে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গ লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের সময় আঠার-বিশ বছরের টগবগে তরুণ তাঁরা। জ্ঞানের জগতে তাঁরা যে অবদান রেখে গেছেন তার কি কোন তুলনা আছে? উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) মাত্র নয়/দশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে যান এবং মাত্র দশ বছর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইসলামের বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ তথা সীরাত বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা কি বিশ্বের অন্য কোন নারীর কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায়? অর্ধ পৃথিবীর শাসক আমিরুল মু'মিনীন 'উমার (রা) মদীনার মসজিদে ভাষণ দিতে গিয়ে যখন মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে বিয়েতে মাহরের পরিমাণ কম করার জন্য উপদেশ দিলেন তখন একজন অখ্যাত মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে 'উমারের (রা) কথার প্রতিবাদ করেন এবং কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিসহকারে তাঁর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেন। 'উমার (রা) নিজের ভুল স্বীকার করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল পুরুষদেরকেই শিক্ষা দেন নি, বরং নারীরাও সমানভাবে শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ সকল ছাত্র ইসলামী খিলাফাতের সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়েন এবং মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ফলে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান এই আরব জাতির অধিকারে চলে আসে।

এমনিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার-ফায়সালা, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সকল ছাত্র পৃথিবীতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কোন তুলনা অন্য কোন মনীষীর জীবনীতে পাওয়া যাবে না। যিনি এত অল্প সময়ে এত সব ছাত্র-ছাত্রীকে পৃথিবীর মানুষের জন্য আদর্শস্থানীয় করে গড়ে তুলেছেন, সেই মহান শিক্ষক সম্পর্কে, তাঁর শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে এবং তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিসহ নানা বিষয়ে জানা বিশ্ববাসীর একান্ত কর্তব্য। বিশেষত: মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চায় তাহলে তাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি যে পদ্ধতিতে স্বল্পতম সময়ে একটি উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, গুণে ও শক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন, তা জানতে হবে। তাদেরকেও সেই জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, সেই শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেন, তাদেরকেও সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এর বিকল্প অন্য কোন পথ মুসলিম উম্মাহর সামনে আছে বলে আমরা মনে করি না।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেন, শিক্ষক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্যের বড় প্রমাণ তাঁরাই। ইমাম আল-কারাফী মনীষীদের নিম্নের এই কথাটি উল্লেখ করেছেন।

لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلاّ

أصحابه، للكفوه لإثبات نبوته. (الفروق-٤/١٧٠)

সাহাবীগণ ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর কোন মু'জিযা যদি নাও থাকতো তাহলে তাঁরাই তাঁর নুবুওয়াতের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিলেন।

ইমাম আল-কারাফীর এই মন্তব্যের সাথে আমরাও একমত।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও কল্যাণের শিক্ষক মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এত জ্ঞান দান করেন যে, মানব জাতির মধ্যে অন্য কাউকে তা দান করেন নি। একটি ব্যক্তি সত্তাকে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য অনন্য ও অতুলনীয় করে তোলে তার সবই তাঁকে পরিপূর্ণরূপে দান করেন। তিনি

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি কৃত অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

...وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

...তুমি যা জানতে না তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আন নিসা, আয়াত : ১১৩)

বর্ণনার সৌন্দর্যে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কথার স্পষ্টতায়, নিয়ম পদ্ধতির মাধুর্যে, ইশারা ইঙ্গিতের চমৎকারিত্বে, প্রাণের আলোকচ্ছটায়, অন্তরের কোমলতায়, বক্ষের প্রশস্ততায়, দয়া-মমতার প্রাচুর্যে, কঠোরতার বিজ্ঞতায়, সতর্কতার মহানুভবতায়, মেধার প্রখরতায়, যত্ন-তত্ত্বাবধানের পরিপক্কতায় এবং মানুষকে সঙ্গদানের পর্যাপ্ততায় তিনি ছিলেন এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই প্রথম কল্যাণকর শিক্ষক। আর এ কারণে তিনি বলতেন : আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

মানব জাতির মহান শিক্ষক হিসেবে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তবে মানুষের মধ্যে অন্য সকল শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষক সত্তার মধ্যে গুণগত বহু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন অন্য শিক্ষকরা মানুষের জন্য কল্যাণকর বা অকল্যাণকর বা যাতে কোন কল্যাণ নেই, এমন সকল জ্ঞান নিজে যেমন শেখেন, তেমনি মানুষকে তা শিক্ষা দেন। কিন্তু আমাদের এই মহান শিক্ষক যে জ্ঞানে মানুষের কোন কল্যাণ নেই তা যেমন নিজে শেখেন নি, তেমনি মানুষকে শিখতে বারণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ) যায়দ ইবন আরকামের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللّٰهُمَّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ ينفع، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يخشع، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهاَ. (كتاب الذكروالدعاء: باب فى الأدعية)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! যে জ্ঞানে কোন কল্যাণ নেই তা থেকে আমি আপনার

নিকট পানাহ চাই। পানাহ চাই- এমন অন্ত:করণ থেকে যা আপনার ভয়ে ভীত হয় না, এমন প্রবৃত্তি থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা আপনার নিকট গৃহীত হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সকল কথা এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই শিক্ষক ছিলেন। তাঁর উল্লেখিত দু'আটি পৃথিবীর সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে এ কথা শিখাচ্ছে যে, ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে যে জ্ঞানে মানুষের কোন কল্যাণ নেই তা যেন কোন শিক্ষার্থী অর্জন না করে, তেমনিভাবে কোন শিক্ষকও যেন কাউকে শিক্ষা দান না করে।

মানবজাতির এই মহান শিক্ষকের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক মাধুর্য এবং শিক্ষকসুলভ উত্তম আদর্শের নিখুঁত চিত্র হাদীছের গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ করে ইমাম আত্ তিরমিযীর (রহ) "আশ-শামায়িল" ও ইমাম আল-মাওয়ারদির (রহ) "আ'লাম আন নুবুওয়াহ্" গ্রন্থ দু'টি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার থেকে অতি সংক্ষেপে ভাসা-ভাসা কিছু কথা আমরা এ গ্রন্থের যথাস্থানে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের প্রতিটি দিকেই রয়েছে মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ। বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ এই উত্তম আদর্শ ছেড়ে পথহারা পথিকের মত এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে চরম বিশৃংখলা। শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে দেখা যাচ্ছে চরম ব্যর্থতা। অথচ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন হলো নূর বা আলোকবর্তিকা। সেই আলো ত্যাগ করে তারা অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই অন্ধকার থেকে রক্ষা পেতে হলে এই আলোর দিকে ফিরে আসতে হবে। এই ভাবনা থেকেই আমি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা ভাবনা, তাঁর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য এই বইটি লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

বইটি তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে রচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে– শিক্ষা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিক-নির্দেশনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে– তাঁর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে– তাঁর শিক্ষা দান পদ্ধতি– এই বিষয়গুলো একাধিক উপশিরোনামে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনায় আমি প্রধানত : আল কুরআন, আল হাদীছ, ইতিহাস, সীরাত ও মুসলিম মনীষীদের রচিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা নিয়েছি।

পূর্বের ন্যায় এ গ্রন্থ রচনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ আমাকে দারুণ উৎসাহিত করেছেন। সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং খুব দ্রুত ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার আবেদন, বইটি পাঠের সময় তাঁদের দৃষ্টিতে কোন ভুল বা অসংগতি ধরা পড়লে তাঁরা আমাকে অবহিত করবেন, যাতে আমি তা সংশোধন করতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফিক দিন। আমীন!

২৯ মার্চ, ২০১১
মঙ্গলবার

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

'ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে
রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিক-নির্দেশনা

সুন্নাহ্‌র আলোকে জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্থান

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও মানুষের নিকট জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে কুরআনে কারীমে বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহুসংখ্যক হাদীছ এসেছে। এ সকল হাদীছে 'আলিম তথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের এত অত্যুচ্চ মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে যে সেখানে পায়ের উপর ভর করে কিংবা ডানা দিয়ে উড়ে উঠা যায় না। সেখানে উঠা যায়, কেবল 'ইলম তথা জ্ঞানের সাহায্যে। জ্ঞান, জ্ঞানার্জন, শিক্ষাদান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত আয়াত ও হাদীছ এসেছে তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিকা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা।

জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা অনেক। আর এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ নেই যে, সর্বোত্তম জ্ঞান হলো 'ইলমে দীন'। যার দ্বারা মানুষ নিজেকে যেমন চিনতে পারে, তেমনি চিনতে পারে আল্লাহকে। তা দ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, পথ খুঁজে পায় এবং জানতে পারে কী তার জন্য কল্যাণকর এবং কী ক্ষতিকর। তাছাড়া প্রত্যেক জ্ঞান এমন গূঢ় রহস্য উন্মোচন করে যা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় অথবা তাদেরকে কল্যাণের নিকটবর্তী করে, অথবা তাদের জন্য যা মঙ্গলজনক তা বাস্তবায়ন এবং যা ক্ষতিকর তা দূরীভূত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :[১]

من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুৎপত্তি ও গভীর জ্ঞান দান করেন।

---

১. আল-হায়ছামী, মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ১২১; সুনান ইবন মাজাহ্, খ. ১, পৃ.৪৯, হাদীছ নং ৬১৫

তিনি আরো বলেন :[২]

مَنْ سَلَك طريقًا يَلْتَمِس فِيْهِ عِلْمًا ، سَهَّل الله به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده.

যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কিছু পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তার বিনিময়ে তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি ঘরে যখন কোন একটি সম্প্রদায় বা দল সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পর পাঠ করে শোনায় তখন ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে ঘিরে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, দয়া-অনুগ্রহ তাঁদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর পাশে যাঁরা আছেন তাঁদের নিকট এদের বিষয় আলোচনা করেন।

তিনি আরো বলেন :[৩]

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، و إن العالم ليستغفرله من فى السماوات ومن فى الأرض، حتى الحيتان فى الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

ফেরেশতাকুল শিক্ষার্থীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য নিজেদের ডানা মেলে দেয়, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলে, এমনকি পানির মধ্যে মাছও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। 'আবিদ ব্যক্তির উপর

---

২. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যিক্র ওয়াদ. দু'আ, হাদীছ নং ২৬৯৯

৩. আবূ দাঊদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ নং-৩৬৪১; তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ নং-২৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

'আলিম ব্যক্তির মর্যাদা এমন অত্যুজ্জ্বল যেমন নক্ষত্ররাজির উপর চাঁদের অত্যুজ্জ্বল মর্যাদা। 'আলিমগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিছ তথা উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়ায়ে কিরাম উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না, তাঁরা 'ইলম তথা জ্ঞান রেখে যান। যে তা গ্রহণ করে সে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

এ সকল হাদীছ 'ইলম তথা জ্ঞানের অতুচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করছে। বিশেষত: দীনী 'ইলম, যাকে হাদীছের ভাষায় الفقه فى الدين (দীনের তত্ত্বজ্ঞান) বলা হয়েছে। العلم بالدين (দীনী 'ইলম) এবং الفقه فى الدين (দীনের তত্ত্বজ্ঞান) দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। الفقه فى الدين অন্যটির চেয়ে অধিক গভীর ও বিশেষত্বপূর্ণ। 'ইলম হলো কেবলমাত্র বাহ্যিক ভাবে জানার নাম, আর আল-ফিক্হ হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তর উভয় ভাবে জানা।

উল্লেখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় 'তালিবুল 'ইলম' তথা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশতাগণ সম্মান করে, ভালোবাসে ও সাহায্য করে। তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে প্রশান্তি, দয়া ও করুণা বর্ষিত হয় এবং আ'লা 'ইল্লীয়্যীনে আল্লাহ তাদের কথা স্মরণ করেন।

আল কুরআনের বহু আয়াতের পাশাপাশি উল্লেখিত হাদীছ দু'টির মত বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ, তাবি'ঈন, তাবি'-তাবি'ঈন তথা মুসলিম উম্মাহকে যুগ যুগ ধরে জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক হতে যেমন উৎসাহিত করেছে তেমনি জ্ঞান অন্বেষণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ এবং মূর্খতার গ্লানি থেকে সতর্ক করেছে। 'উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) বলতেন :[৪]

أيُّها الناس! عليكم بطلب العلم فإنَّ لله رداء محبة، فمن طلب بابامن العلم، ردَّاه الله بردائه ذاك.

ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার একটি চাদর আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের কোন একটি অধ্যায় অর্জন করবে, আল্লাহ তার দেহে সেই চাদর পেঁচিয়ে দেবেন।

একবার এক ব্যক্তি ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট জিহাদ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি

৪. ইবনু 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, খ. ১, পৃ. ৭০

লোকটিকে বলেন :[৫]

ألا أدلك على ما هو خيرلك من الجهاد؟ تبنى مسجداً تعلم فيه القرآن و سنن النبى صلى الله عليه وسلم، و الفقه فى الدين.

আমি কি তোমাকে জিহাদ থেকেও উত্তম জিনিসের কথা বলবো? তুমি একটি মাসজিদ বানাবে এবং সেখানে (মানুষকে) আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ্ ও দীনের ফিক্‌হ (বিধি-বিধান) শিক্ষা দেবে।

ইবন মাস'উদ (রা) বলেন :[৬]

نِعْمَ الْمَجْلِسُ مَجْلِسٌ تنشر فيه الحكمة، و تنشر فيه الرحمة يعنى مجلس العلم.

সেই মাজলিস কতনা ভালো যেখানে জ্ঞানের প্রচার হয় এবং করুণা ও দয়ার প্রসার ঘটে।

অর্থাৎ জ্ঞান চর্চার মাজলিস। মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন:[৭]

تَعَلَّمُوا العِلْمَ، فإنَّ تَعَلُّمَه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس فى الوحدة، والصاحب فى الخلوة، والدليل على الدين، والنصير على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند القرباء، ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقوامًا، فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداة يقتدي بهم أدلة فى الخير تقتفى آثارهم، وترمق أفعالهم، ترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتها

---

৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩, ৭৪
৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০
৭. ড. ইউসুফ আল-কারদাবী, আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ. ১৪

تمسحهم، وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها... إلى أن قال : به يطاع الله، وبه يعبد، وبه يوحد، وبه يمجد وبه يتورع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. وهو إمام والعمل تابعه ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.

তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কারণ, জ্ঞানার্জন করা হলো আল্লাহভীতি, জ্ঞানের অন্বেষণ হলো 'ইবাদাত, পঠন-পাঠন হলো তাসবীহ্ পাঠ, গবেষণা হলো জিহাদ, যে জানেনা তাকে শিক্ষাদান হলো সাদাকা, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা ব্যয় করা হলো নৈকট্য, সেটি একাকীত্বে সঙ্গী, নির্জনে বন্ধু, দীনের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক, স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটনে সাহায্যকারী, বন্ধুদের সাথে অবস্থানকালে মন্ত্রণাদাতা এবং ঘনিষ্ঠজনদের সাথে থাকার সময় অতি ঘনিষ্ঠ। এই জ্ঞান জান্নাতের পথের আলোকবর্তিকা। আল্লাহ্ এর দ্বারা বহু জাতিকে উন্নত করেন এবং সত্য ও কল্যাণে তাদেরকে নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শকের আসন দান করেন। ফলে কল্যাণের পথে জ্ঞানী ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয় এবং তাদের কর্ম ও আচরণ গভীরভাবে তাকিয়ে দেখা হয়। ফেরেশতামণ্ডলী তাদেরকে ভালোবাসে এবং ডানা দিয়ে তাদেরকে স্পর্শ করে। সতেজ ও শুস্ক সকল বস্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সাগরের সকল প্রকার মাছ ও ডাঙ্গার হিংস্র ও গৃহপালিত জীবজন্তু এবং আকাশ ও তার তারকারাজি তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে। .... এমনকি তারা বলে: এই জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহর আনুগত্য ও 'ইবাদাত করা হয়। এর দ্বারাই আল্লাহর একত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারাই তাকওয়া-পরহেযগারি অবলম্বন করা হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা হয়, হালাল-হারাম চেনা যায়। জ্ঞান হলো ইমাম তুল্য, 'আমল তার অনুসারী। সৌভাগ্যবানরা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে তা লাভ করে, আর হতভাগারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

আল-হাসান আল-বসরী বলেন:

لَوْ لاَ الْعُلَمَاءُ لَصَارَ النَّاسُ مِثْلَ الْبَهَا ئِمِ.

জ্ঞানীব্যক্তিগণ যদি না থাকতেন তাহলে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত হয়ে যেত।

অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে পশুত্বের সীমা থেকে বের করে মনুষ্যত্বের সীমায় নিয়ে আসেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মু'আয (রহ) বলেন:

العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم.

'আলিম তথা জ্ঞানীগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের প্রতি তাদের পিতা-মাতা থেকেও বেশি দয়াশীল।

প্রশ্ন করা হলো: কিভাবে? বললেন:

لأن أبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة.

কারণ তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করেন, আর তাঁরা অর্থাৎ 'আলিমগণ তাদেরকে আখিরাতের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ)-কে প্রশ্ন করা হলো: মানুষ কারা? বললেন: 'আলিমগণ। আবার প্রশ্ন করা হলো: রাজা-বাদশাহ কারা? বললেন: যাহিদ তথা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তিগণ।"[৮]

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন: "'আলিম ব্যতীত অন্যদেরকে মানুষ গণ্য করা হয়নি। কারণ, যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুণ মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে পৃথক হয়ে যায় তা হলো 'ইলম তথা জ্ঞান। মানুষ তার জ্ঞানের মর্যাদার কারণেই মানুষ, দৈহিক শক্তির কারণে নয়। উট তো তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আকার-আকৃতির কারণেও নয়, হাতী তো মানুষের চেয়েও বিশাল আকৃতির। বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যও নয়। হিংস্র বন্য জন্তু তো তার চেয়ে বেশি সাহসী। বেশি আহারের জন্যও মানুষ মানুষ নয়। কারণ, গরুর পেট মানুষের পেটের তুলনায় বিশাল আকৃতির। আর মানুষ এজন্যও মানুষ নয় যে সে বেশি যৌনকর্মে পারঙ্গম। কারণ, অতি নগণ্য চড়ুই পাখিটিও এক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। মানুষকে এ সবকিছুর জন্য নয়, বরং কেবল 'ইলম তথা জ্ঞানের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৯]

---

৮. ইমাম আল-গাযালী, ইয়াহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ৭

৯. প্রাগুক্ত

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন:

حاجة الإنسان ألى العلم أكثر من حاجة إلى الطعام.

খাদ্য ও পানীয়ের চেয়ে মানুষের বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের।[১০]

মু'আল্লিম তথা শিক্ষককে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শিক্ষার্থীদের মন-মগযে একথা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন যে, শিক্ষকই হলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহর নিকট তাঁরা উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে আল্লাহ ও সৃষ্টিকুলের নিকট শিক্ষকের মর্যাদা অত্যুচ্চে। তাই সৃষ্টিকুল শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ ও ইসতিগফার করে। তিনি সাহাবীদেরকে বলেন:

إن الله وملائكته و أهل السماوات والأرض حتى النملة فِي حجرها و حتى الحوت، ليصلون على معلِّمِي النَّاس الخير.

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তে অবস্থানরত পিঁপড়ারা এবং মাছ পর্যন্ত মানুষকে সৎ ও কল্যাণের কথা শিক্ষাদানকারীদের জন্য অবশ্যই দু'আ ও ইসতিগফার করে।[১১]

একজন শিক্ষকের এর চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার কথা পৃথিবীর আর কোন মনীষী শিখিয়েছেন বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে আরো শিখিয়েছেন:

لاحسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فِي الحق، و رجل آتاه الله الحكمة فهويقضى بها و يعلمُها.

দু'টি জিনিস ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য ঈর্ষা করা ঠিক নয়; একজন

---

১০. আর রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ. ১৫

১১. জামি'আত তিরমিযী, হাদীছ নং-২৬৮৩

মানুষ, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সঠিক পথে তা ব্যয় করার ক্ষমতাও দান করেছেন। আরেকজন মানুষ, আল্লাহ তাকে জ্ঞান দিয়েছেন, তা দিয়ে সে সঠিক বিচার করে এবং সে জ্ঞান অন্যকে শেখায়।[১২]

হাদীছে উল্লেখিত حسد (হিংসা) শব্দটি غبطة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, حَسَدَ (হাসাদ) হলো নিজের কোন লাভ হোক বা না হোক অন্যের সুখ-সমৃদ্ধির ধ্বংস কামনা করা। আর غِبْطَة (গিবতা) হলো অন্যেরটা ধ্বংস কামনা না করে তার মত সুখ-সমৃদ্ধি নিজের জন্যও কামনা করা। একজন কৃতজ্ঞ বিত্তশালী ও শিক্ষক 'আলিম সত্যিই ঈর্ষার পাত্র। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাও শিখিয়েছেন, জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে যে সাদাকা করা হয় তা অর্থ-সম্পদ, সাদাকার চেয়ে উত্তম। আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علماً ثم يعلمه أخاه المسلم.

উত্তম সাদাকা হলো, একজন মানুষ কোন জ্ঞান শিখবে এবং তা তার একজন মুসলিম ভাইকে শেখাবে।[১৩]

তিনি আরো বলেন:

ما من رجل مسلم تعلم كلمة أوكلمتين أوثلا ثاً أو أربعاً أو خمساً مما فرض الله عزوجل، فيتعلمهن و يعلمهن إلا دخل الجنة.

যে কোন মুসলিম আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছেন তার একটি, দু'টি, তিনটি, চারটি অথবা পাঁচটি কথা শিখবে এবং সেগুলো অন্যকে শেখাবে, বিনিময়ে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪]

তিনি আরো বলেছেন:

---

১২. আল বুখারী, বাবুল ইগতিবারি ফিল 'ইলম ওয়াল হিকমাতি, হাদীছ-৭১; জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ১৭; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৭৭, হাদীছ নং-৭৭

১৩. ইবন মাজাহ, ফিল মুকাদ্দিমা, হাদীছ নং-২৪৩; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীছ নং-৭৬

১৪. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৬, হাদীছ নং-৭৫

خيركم من تعلم القرآن و علمه.

তোমাদের মধ্যে যে কুরআন শেখে এবং তা অন্যকে শেখায়, সেই উত্তম।[১৫]

এ কারণে আবূ হুরাইরা (রা) বলতেন:

فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى عليه وسلم.

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে শোনার পর একটি হাদীছও ভুলিনি।[১৬]

তিনি সাহাবীদেরকে একথা শিখিয়েছেন যে, একজন শিক্ষকের নিকট থেকে যত মানুষ শিখবে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা যত মানুষ উপকৃত হবে তাদের সকলের প্রতিদানের সমান প্রতিদান সে লাভ করবে। তিনি বলেন:[১৭]

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعله.

কোন ব্যক্তি কোন ভালো কাজের পথ দেখালে, কেউ সে কাজ করলে সে তার সমান প্রতিদান পাবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জ্ঞান, জ্ঞান চর্চাকারী এবং যে জ্ঞানদান করে তার মর্যাদার কথা সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে তুলে ধরে তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এখানে তেমন একটি হাদীছ তুলে ধরা হলো:

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৮]

مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نقيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فأَنْبَتَتْ الْكَلأَ

---

১৫. আল বুখারী ও তিরমিযী, ফী ফাদায়িলিল কুরআন
১৬. আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৬, হাদীছ নং-৭৭
১৭. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, হাদীছ-১৮৯৩; আবূ দাউদ, বাবুল আদাব, হাদীছ-৫১২৯
১৮. আল বুখারী, বাবু ফাদলি মান 'আলিমা ওয়া 'আল্লামা; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৮, হাদীছ নং-৬৮

وَالْعُشْبَ الكثير وكانت منها أَجادبُ أمْسَكَتِ الماءَ فنفع الله بِهَا الناسَ فشربوا وسَقَوْا وزرَعوْا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لاتمسك ماءً ولاتُنبِتُ كلأً فذلك مَثَلُ من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به، فعلم وعلَّم، ومثلُ من لم يَرفَعَ بذلك رأسًا ولم يَقْبَلْ هدى الله الذى أرسلت به.

আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইলম দান করে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই মূষলধারার বর্ষণের মত, যা ভূমিতে পড়ে, অতঃপর সেই ভূমির একটা পরিচ্ছন্ন অংশ পানি শোষণ করে নেয়। তারপর সেখানে প্রচুর ঘাস ও লতাগুল্ম জন্মায়। সেই ভূমির অপর একটি অংশ উদ্ভিদ অঙ্কুরণের অনুপযোগী, তবে তা পানি ধরে রাখে। আল্লাহ্ সেই পানি দ্বারা মানুষের উপকার করেন। মানুষ সেই পানি পান করে, অন্যদেরকে পান করায় এবং তা কৃষিকাজে লাগায়। সেই ভূমির আরেকটি অংশ হলো প্রস্তরময় প্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত, যা পানি ধরে রাখেনা এবং সেখানে উদ্ভিদও গজায় না। এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্র দীন ভালোমত বুঝেছে এবং আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তার উপকারে এসেছে। তা সে নিজে শিখেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে 'ইলম ও হিদায়াত আসার পর মূর্খতা থেকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি এবং আল্লাহ্র হিদায়াত যা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কবুল করেনি।

উল্লেখিত হাদীছে চমৎকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছেঃ

১. নুবুওয়াতী 'ইলমকে মুষলধারার বৃষ্টি বলা হয়েছে। কারণ দু'টিরই রয়েছে প্রাণদান ক্ষমতা। বৃষ্টি মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে, তেমনিভাবে 'ইলম তথা জ্ঞান-বুদ্ধিও অন্তরকে অজ্ঞতারূপ মৃত্যুর পর জীবন্ত করে।
২. 'ইলম ও হিদায়াতের সংগে মানুষের সম্পর্ক হলো বৃষ্টির সংগে ভূমির সম্পর্কের মত।
৩. যে ভালো ভূমি পানি শুষে নেয়, তা দ্বারা সে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর ঘাস, লতাগুল্ম জন্মায়, তার উপমা হলো সেই জ্ঞানী লোকটির মত যে 'আলিম

শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে। তা দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যদেরকে উপকৃত করে।

৪. আর যে ভূমি পানি ধরে রাখে তা যেন হাউজের মত যাতে পানি গড়িয়ে যেতে না পারে, কেবল পানি ধরে রাখে, যাতে যে ইচ্ছা করে পান করবে, অন্যকে পান করাবে ও কৃষিতে সেচ দেবে; তার উপমা হলো সেই জ্ঞানীর মত যে জ্ঞান মুখস্থ রাখে, অন্যের জন্য বহন করে, যদিও সে তার গভীর উপলব্ধি রাখে না, তা থেকে গবেষণা করে নতুন কিছু বের করে না।

৫. তৃতীয় প্রকারের ভূমি যা একেবারে নিকৃষ্ট, যা পানি দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অন্যের জন্যেও সংরক্ষণ করে না, তার উপমা সেই সকল মানুষের মত যারা 'ইলম ও হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করে। তারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না, অন্যের উপকার করে না, জ্ঞান সংরক্ষণ করে না এবং বোঝেও না। তারা 'ইলম বর্ণনাকারীদের কেউ নয়, গভীর তাৎপর্য উপলব্ধিকারীদেরও কেউ নয়।[১৯]

তিনি আরো বলেছেন, 'ইলম অনুযায়ী 'আমলকারী ও অন্যকে অর্জিত 'ইলম শিক্ষাদানকারী ব্যক্তিই হলো সত্যিকার অর্থে নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরাধিকারী।

একজন মু'আল্লিমের সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকে মু'আল্লিম বলে অভিহিত করেছেন। ইবন 'উমার (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে:[২০]

أن رسول الله صلى عليه وسلم مر بمجلسين فى مسجده، أحد المجلسين يدعون الله و يرغبون إليه، و الآخر يتعلمون الفقه و يعلمونه، قال: كلا المجلسين على خير، و أحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله و يرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم، و إن شاء منعهم، و أما هؤلاء فيتعلمون الفقه و العلم و يعلمون الجا هل، فهؤلاء أفضل. و إنما بعثت معلما، ثم جلس فيهم.

---

১৯. ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহুস সা'আদাহ্, খ. ১, পৃ. ৬০
২০. সুনানু দারিমী, খ. ১, পৃ. ১১৭

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাসজিদে অনুষ্ঠানরত দু'টি মাজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি মাজলিসে আল্লাহর নিকট দু'আ-ইসতিগফার ও তাঁর নিকট আশা-আকাংখা ব্যক্ত করা হচ্ছিল। আর অন্যটিতে চলছিল দ্বীনের বিধি-বিধান শেখা ও শেখানোর কাজ। তিনি মন্তব্য করলেন: দু'টি মাজলিসেই ভালো কাজ হচ্ছে। তবে একটি অপরটির চেয়ে বেশি ভালো। এই যে এরা, আল্লাহর নিকট দু'আ করছে, তার কাছে আশা-আকাংখা ব্যক্ত করছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। আর এরা দীনের ফিক্হ ও 'ইলম শিখছে এবং মূর্খদের তা শেখাচ্ছে, এরাই উত্তম। আর আমি তো মু'আল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে তিনি শেষোক্ত মাজলিসে বসে পড়েন।

ইমাম মুসলিম উপরোক্ত মর্মের এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[২১]

إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرًا.

আল্লাহ আমাকে না জোর-জবরদস্তকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আর না কঠোর করে। তবে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সহজ স্বাভাবিক মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে অন্ততঃ চারটি আয়াতে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূল দায়িত্ব হলো তাঁর উম্মাতকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়া। দু'টি সূরা বাকারায়, একটি সূরা আলে 'ইমরানে এবং অপরটি সূরা জুমু'আতে।

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল করে এবং সে জ্ঞান অন্যকে শেখায়, আমাদের পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ এ ধরনের লোকদেরকে 'রাব্বানী' নামে অভিহিত করতেন। মূলতঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করতেন:[২২]

...وَلَـٰكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

---

২১. মুসলিম, কিতাবুত তালাক, হাদীছ নং-১৪৭৮; তাফসীরু ইবন কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৮৪১, মুসনাদু আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩২৮

২২. সূরাতু 'আলি 'ইমরান-৭৯

...বরং তোমরা 'রাব্বানী' হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।

আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রব' গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'রাব্বানী' বলা হয়। আর সেই গুণ হলো কিতাবের জ্ঞান শিক্ষাদান ও অধ্যয়ন।

'ইলম (জ্ঞান) হলো ঈমান তথা বিশ্বাসের দলীল-প্রমাণ

ইসলামের দৃষ্টিতে 'ইলম (জ্ঞান) ঈমানের বিপরীতে নয়, বৈরী হওয়া তো দূরের কথা। যেমন এরকম একটা চিন্তা মধ্য যুগে ইউরোপে প্রসার লাভ করেছিল। সে সময় গীর্জা কুসংস্কারের পক্ষ নিয়ে জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা জড়ত্ব ও অন্ধ আনুগত্যের সহযোগিতা করে এবং স্বাধীন চিন্তা, নতুন নতুন আবিষ্কার ইত্যাদি প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা পালন করে। শাসক শ্রেণী ও সামন্তবাদীদের পক্ষ নিয়ে নিপীড়িত মানুষের বিপক্ষে দাঁড়ায়। জ্ঞান ও বিশ্বাসের এ ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন ঘটনার কথা ইসলামের ইতিহাসে নেই। কারণ ইসলামী শিক্ষায় এ জাতীয় চিন্তার কোন অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে খৃস্টবাদ এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ঈমান বা বিশ্বাস এমন একটি বিষয়, চিন্তার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, বরং চিন্তা হলো বিশ্বাসের বিপরীত। সুতরাং খৃস্টবাদ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের সীমা-সরহদের মধ্যেই প্রবেশ করে না। বরং তা আবেগ-অনুভূতি ও অন্তরের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ। আকীদা বা বিশ্বাস বুদ্ধিগত দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোন শর্ত নেই। বরং বিশ্বাস বুদ্ধি ও যুক্তির উর্ধ্বে থাকাই শ্রেয়। এ কারণে খৃস্টবাদের অন্যতম শ্লোগান হল : "বিশ্বাস কর, তারপর জান", অথবা "বিশ্বাস কর এমনভাবে যেন তুমি একজন অন্ধ", কোন কোন মানুষ যেমন বলে থাকেন "তুমি তোমার দু'চোখ বন্ধ করে, আমার অনুসরণ কর।" এর কারণ হলো, খৃস্টবাদ এমন কিছু বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের সুস্থ আকল-বুদ্ধি প্রত্যাখান করে । যেমন : ত্রিত্ববাদ, মুক্তিদান ও আত্মোৎসর্গ করণ ইত্যাদি। তাছাড়া এর থেকে যে সকল শাখা-প্রশাখা বের হয় অথবা যা কিছু যুক্ত হয়, সবকিছু। আর এ কারণে কোন কোন খৃস্টান দার্শনিক তাদের কোন কোন বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছেন, "আমি এটা বিশ্বাস করি, কারণ এটা অসম্ভব।" আর এটাকে তারা অযৌক্তিক বা বুদ্ধির অগম্য বলে থাকেন।

ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীতে। এ তার আকীদার ভিত্তি স্থাপনকালেই অন্ধ অনুসরণ ও অনুগামিতা সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেছে। যেমন, অন্ধ অনুসারী ও অনুগামী লোকদের বক্তব্য কুরআন বর্ণনা করেছে এভাবে:

...قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا...

...তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট...।[২৩]

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا.

তারা বলে, আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।[২৪]

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীছে এসেছে :[২৫]

لايكن أحدكم إمعةً، يقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت و إن أساءوا أسأت.

তোমাদের কেউ যেন সুযোগবাদী না হয়। সে বলে যে, আমি মানুষের সংগে আছি। তারা যদি ভালো করে আমিও ভালো করবো এবং যদি খারাপ করে আমিও খারাপ করবো।

ইসলাম অনুমান ও ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে। আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান ও নিশ্চয়তা ছাড়া আন্দাজ-অনুমানের কোন গুরুত্ব ইসলামে নেই। এ কারণে ক্রুশ বিষয়ে খৃস্টানদের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আল্লাহ এভাবে:

...مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ...

...এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না...।[২৬]

আল্লাহ, মুশরিকগণ ও তাদের ধারণাকৃত ইলাহ- লাত, 'উয্‌যা ও মানাত আছ-ছালিছা সম্পর্কে বলছেন এভাবে:

إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ...

---

২৩. সূরা আল-মায়িদা-১০৪
২৪. সূরা আল-আহ্‌যাব-৬৭
২৫. জামি' আত তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, হাদীছ-২০০৮
২৬. সূরা আন-নিসা-১৫৭

এগুলো কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল পাঠাননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে...।[২৭]

তারপর তিনি বলছেন:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

এবং এই বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।[২৮]

আল-কুরআন গভীর পর্যবেক্ষণ ও সঠিক চিন্তা-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়ানো 'আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া সবকিছুই অস্বীকার করেছে। এ কারণে আল-কুরআন অসার ও অযৌক্তিক 'আকীদা-বিশ্বাস ধারণকারীদের সম্পর্কে বলিষ্ঠভাবে বলছে:

...قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

...বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।[২৯]

মানবজাতিকে চিন্তা-ভাবনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং তার কণ্ঠ থেকে অন্ধ আনুগত্য ও জড়ত্বের বেড়ি ছিড়ে ফেলে মুক্ত হওয়ার জন্য আল-কুরআন বহু স্থানে বার বার নিম্নের এ জাতীয় শব্দ ও বাক্য এনে মানুষকে সতর্ক করেছে:

أفلا تعقلون - তারা কি বুঝে না?

أفلا تتفكرون - তারা কি চিন্তা করেনা?

أفلا ينظرون - তারা কি দেখেনা?

أو لم ينظروا - তারা কি দেখেনি?

أو لم يتفكروا - তারা কি চিন্তা করেনি?

لقوم يعقلون - সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে।

---

২৭. সূরা আন-নাজম-২৩

২৮. প্রাগুক্ত-২৮

২৯. সূরা আল-বাকারাহ্-১১১

لقوم يعلمون - সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

لقوم يتفكرون - সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

আল-কুরআন চিন্তা-অনুধ্যান করার জন্য মানুষকে যে বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছে সে ব্যাপারে নিম্নের আয়াতটি যথেষ্ট:

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا...

বল, তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, অত:পর তোমরা চিন্তা করে দেখ।[৩০]

এ কারণে কোন কোন মুসলিম চিন্তাবিদ বলেছেন التفكير فريضة اسلامية –চিন্তা-ভাবনা করা ইসলামের অপরিহার্য বিধান। বিশ শতকের মিসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তাবিদ 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ উপরোক্ত শিরোনামে একটি গ্রন্থই রচনা করেছেন। ইসলাম মানুষের উপর আল্লাহর 'ইবাদাত যেমন ফরজ করেছে, তেমনি ফরয করেছে চিন্তা-ভাবনা করাও।

সুতরাং আমরা বলতে পারি ইসলামে 'আকীদার বিষয়টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্ধ আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের উপর নয়। কুরআন বলছে:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ...

সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।[৩১]

اعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩২]

...وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

---

৩০. সূরা সাবা'-৪৬
৩১. সূরা মুহাম্মাদ-১৯
৩২. সূরা আল-মায়িদা-৯৮

...এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।[৩৩]

গভীর পর্যবেক্ষণ, চিন্তা-অনুধ্যান ও জ্ঞানের দিকে আল-কুরআন যখন মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে তখন এ আশঙ্কা বা ভয় করেনি যে, এর পরিণতি ও ফলাফল দীনের সত্য বিধান ও বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে। কারণ, ইসলামের চিন্তা এ রকম যে, দীনের সত্য কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক সত্যের পরিপন্থী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সত্য সত্যের বিপরীত হবে না, বিশ্বাস বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে না। বিরোধ যদি হয় তাহলে তা হবে বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে। সত্য সর্বদা সন্দেহ, ধারণা ও অনুমানকে অস্বীকার করে।

আর তাই আমরা বলতে পারি দীনের সঠিক কোন বর্ণনা কোন স্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীত হতে পারেনা। এমন যদি কখনো হয় তাহলে হয় বর্ণনা, নয়তো বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত, এর যে কোন একটি সঠিক নয়। এমনটি অতীতে অনেক সময় হয়েছে। কোন একটি বিধানকে দীনের বিধান বলে ধারণা করা হয়েছে, অথচ তা সঠিক নয়, আবার কোন কিছুকে বুদ্ধি ও জ্ঞানগত সত্য মনে করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল ভুল। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সকল বোধ ও উপলব্ধি যেমন দীন নয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সকল যুক্তি ও মতামত জ্ঞান নয়।

আল-কুরআন ঘোষণা করছে, সঠিক জ্ঞান মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানায় এবং সেদিকে পথ দেখায়। আল্লাহ বলেন:

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ...

যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অত:পর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়।...[৩৪]

উল্লেখিত আয়াতে বিধৃত তিনটি ভাব ক্রমানুসারে একটির পর একটি অর্জিত হয় যা 'ফা' (ف) বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। যখন একের পর এক ক্রমানুসারে অর্জিত হয় তখন 'ফা' দ্বারা বাক্য সংযুক্ত করা হয়।

জ্ঞানের পশ্চাদানুসারী হলো ঈমান বা প্রত্যয়। জানার পর কোন রকম বিরতি ছাড়াই

---

৩৩. সূরা আল-বাকারাহ-২৩৫
৩৪. সূরা আল-হাজ্জ-৫৪

ঈমান বা প্রত্যয়ের সৃষ্টি হবে। আর ঈমানের পরেই অন্ত:করণের তৎপরতা শুরু হয়, আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়। এভাবে জ্ঞানের ফল হলো ঈমান এবং ঈমানের ফল হলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি বিনীত হওয়া। আল-কুরআনে অপর একটি আয়াতে 'ইলম (জ্ঞান) ও ঈমানকে পাশাপাশি و او (ওয়াও) হরফ দ্বারা 'আত্‌ফ বা সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ...

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো...।[৩৫]

এ আয়াতে 'ইলম ও ঈমান পাশাপাশি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করে ক্রমানুসারে এসেছে। একটি অপরটির বিপরীত নয় যে, একটির উপস্থিতিতে অপরটির বিলুপ্তি ঘটবে।

আমরা যখন 'ইলম (জ্ঞান) বলি তখন 'ইলম বলতে বর্তমান সময়ে প্রচলিত অর্থই বুঝি। আর তা হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত বস্তুগত জ্ঞান। এই জ্ঞানের মূল্য এবং মানুষের প্রয়োজনের কথা আমরা অস্বীকার করিনা। কারণ বস্তুগত জ্ঞান যে মানুষের কাম্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তা হবে মাধ্যম হিসেবে, চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নয়।

এ জ্ঞান মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে, জীবন-যাপনকে সহজ করে; সময়কে সংক্ষেপ করে, স্থানকে নিকটবর্তী করে দেয়।

তবে কেবল এই জ্ঞান মানুষের জীবনকে আনন্দময় করতে ও মানুষের চলার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না। মানুষের আত্ম-অহমিকা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করতে পারে না। এ কারণে মানুষের "দীনী 'ইলম" তথা ধর্মীয় জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। সে জ্ঞান তার ঈমানকে সমৃদ্ধ করবে, অন্ত:করণকে জীবন্ত করে তাতে উন্নত নৈতিকতার চারা রোপন করবে। মানুষকে তার অন্তরের কার্পণ্য এবং মানুষের আকল-বুদ্ধির উপর তার স্বভাব-প্রকৃতির বাড়িবাড়ি থেকে রক্ষা করবে। এই দীনী জ্ঞানই শত্রুতা ও ধ্বংসাত্মক কাজে তা ব্যবহারের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

আল-কুরআন আমাদের সামনে সুলায়মান (আ)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ তাঁকে এমন বিশাল এক সাম্রাজ্য দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে তারপরে দান করেননি। চোখের পলকে ইয়ামানের সাবা সাম্রাজ্যের রানী বিলকীসের সিংহাসন

---

৩৫. সূরা আর-রূম-৫৬

ফিলিস্তিনে অবস্থানরত সুলায়মানের (আ) সামনে উপস্থাপন করা হয়। সুলায়মান (আ) এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার কৃতিত্ব আল্লাহর প্রতি আরোপ করেন। আল-কুরআন তা বর্ণনা করেছে এ ভাষায় : و عنده علم الكتاب "তার আছে কিতাবের জ্ঞান"। সুলায়মানের (আ) ঈমান সেই মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। এই কৃতিত্ব নিজের দিকে আরোপ না করে আল্লাহর প্রতি তিনি আরোপ করেন। তাঁর মধ্যে কোন রকম অহমিকা ও অহঙ্কার কাজ করতে পারেনি। তিনি অকপটে বলে ওঠেন:

...قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

সে বললো, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন- আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।[৩৬]

যুল কারনাইনের ভূমিকাও ছিল সুলায়মানের (আ) মত। তিনি পূর্ব-পশ্চিমে বিজয় অভিযান চালিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, শক্ত-মজবুত বাঁধ নির্মাণ করে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন। আর এ কাজে তিনি তৎকালীন সময়ের যাবতীয় জ্ঞান ও উপায় উপকরণ কাজে লাগান। বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যে মনোভাব ব্যক্ত করেন আল-কুরআন তা বর্ণনা করেছে এভাবে:

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا.

সে বললো, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।[৩৭]

আমাদের জানা থাকা উচিত যে, সত্য-সঠিক জ্ঞান তা-ই যা মানুষকে ঈমানের দিকে চালিত করে, আর সত্য-সঠিক ঈমান তা-ই যা জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রশস্ত করে। অতএব তখন এ দু'টি বিষয় একে অপরের অংশীদার হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। বরং বলা যায় তখন দু'টি বিষয় পরস্পর সহযোগী দু'ভাইয়ের মত হয়ে যায়।

---

৩৬. সূরা আন-নামল-৪০
৩৭. সূরা আল-কাহাফ-৯৮

এই 'ইলম তথা জ্ঞানই ইসলাম চায়। তার বিষয় এবং গবেষণার ক্ষেত্র যাই হোক না কেন। ইসলাম চায় এমন 'ইলম যা হবে ঈমানের ছায়াতলে, এবং উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শের সেবায় নিয়োজিত। আল-কুরআন তার সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলছে:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ.

পাঠ কর সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৩৮]

কিরায়াত তথা পঠন হলো 'ইলমের শিরোনাম, চাবি ও প্রদীপ স্বরূপ। আল-কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতে যখন কিরায়াত তথা পাঠের কথা বলা হলো তখন বুঝা যায় ইসলামে 'ইলম তথা জ্ঞানের স্থান ও মর্যাদা কোন পর্যায়ে। তবে আল-কুরআন নিরংকুশ পড়ার কথা বলেনি, বরং বিশেষ শর্তযুক্ত পড়ার কথা বলেছে। আর সেই পড়া হবে بسم الله অর্থাৎ আল্লাহর নামে। যেমন কুরআন বলছে :

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ.

তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

পড়া যখন আল্লাহর নামে হয় তখন তার উদ্দেশ্য হয় সত্য, কল্যাণ ও সঠিক পথ। আর এ সবকিছুর উৎস হলেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামের ইতিহাসে 'ইলম (জ্ঞান) বেড়ে উঠেছে দীনের কোলে এবং মাদরাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাসজিদের আঙ্গিনায়। প্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জামি মাসজিদের ছাদের তলে যাত্রা শুরু করে। এমনকি সেগুলোর নামও জামি' (جامع) হয়ে যায়। যেমন: জামি'উল আযহার, জামি'উল কারবিয়্যীন, জামি'উল যায়তুনা ইত্যাদি।

এ সকল আল-জামি'তে অথবা আল-জামি'আত আল-ইসলামিয়্যা-তে দীনী ও দুনিয়াবী তথা ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান একই সাথে দান করা হতো। গবেষণাগারে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণবাদী বহু 'আলিম (জ্ঞানী ব্যক্তি) একই সাথে ছিলেন দীনী 'আলিমও। যেমন: কাজী ইবন রাশীদ আল-হাফীদ, যিনি তুলণামূলক ফিক্হের গ্রন্থ "বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ" এর লেখক এবং একই সাথে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত "আল-কুল্লিয়াত" গ্রন্থেরও রচয়িতা। যেমন: আল-খাওয়ারযিমী, যিনি তাঁর বীজগণিত বিষয়ক অনন্য গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত: তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন ফিক্হ শাস্ত্রের ওসীয়াত ও মীরাছ বিষয়ক জটিলতা সমাধানের উদ্দেশ্যে।

---

৩৮. সূরা আল 'আলাক-১

'ইলম (জ্ঞান) হলো 'আমল (কর্ম)-এর গাইড বা নির্দেশিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে 'ইলম তথা জ্ঞান হলো 'আমল তথা কর্মের গাইড বা নির্দেশিকা, যেমন তা ঈমানের পথ প্রদর্শক। ইমাম আল-বুখারী (রহ) তাঁর আল-জামি' আস-সাহীহ্ গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে:

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ

কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান এর পরিচ্ছেদ।

ইবনুল মুনীর বলেন: এই শিরোনাম দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কথা ও কাজ শুদ্ধ-সঠিক হওয়ার জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত। সুতরাং জ্ঞান ছাড়া কথা ও কাজ গুরুত্বহীন। এ দু'টির থেকে জ্ঞান অগ্রগামী এবং নিয়্যাতের পরিশুদ্ধকারী, যা 'আমল বা কর্মকে শুদ্ধ করে। ইমাম আল বুখারী এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যাতে আগে ভাগেই জ্ঞানের তুচ্ছতার ধারণা মাথায় ঢুকে না যায় এবং তা অন্বেষণে অসতর্ক হয়ে না পড়ে। যেমন অনেকে বলে থাকেন:

أَنَّ الْعِلْمَ لَايَنْفَعُ إِلاَّ بِالْعَمَلِ.

'আমলের দ্বারা ছাড়া 'ইলম কোন উপকারে আসেনা।[৩৯]

ইমাম আল-বুখারী নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআনের অনেকগুলো আয়াত ও হাদীছ উপস্থাপন করেছেন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...

সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য...।[৪০]

আল্লাহ 'ইলম দ্বারা বাক্যটি আরম্ভ করেছেন। তারপর 'আমলের প্রশংসা করেছেন। জ্ঞানের চূড়া হলো আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর একত্ব। এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে তা তাঁর সকল উম্মাতকে সন্নিবেশ করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্যত্র বলেছেন:

...إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...

---

৩৯. ফাতহুল বারী, খ-১, পৃ.১৬৯ (তাব'আ আল-হালাবী)
৪০. সূরা মুহাম্মাদ-১৯

...আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা 'আলিম তথা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে... ।[৪১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, সত্যিকারভাবে 'আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করে, যথাযথভাবে তাঁর মূল্য ও মর্যাদা দেয় এবং তাঁর বিশাল ক্ষমতা, সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর নিরংকুশ আধিপত্য সম্পর্কে জানে। আর এটা সম্ভব হয় আল্লাহর সৃষ্টিজগত ও আইন-বিধান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ফলে। আর এ ভীতিই তাদেরকে সৎ কাজ করতে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীন বা ধর্মে পারদর্শিতা দান করেন।

আর তা এ কারণে যে, সে যখন পারদর্শিতা অর্জন করবে, তখন 'আমল করবে। আর তার সে 'আমল সুন্দর হবে। ইমাম আল-গাযালী (রহ) যেমন বলেছেন, একজন ফকীহ্ তথা দীনে পারদর্শী ব্যক্তির সর্বনিম্ন স্তর এই যে, তিনি এতটুকু জানবেন যে, দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম। এই জানা যখন সত্যে পরিণত হয় এবং তার উপর বিজয়ী হয় তখন সে নিফাক (কপটতা) ও রিয়া (প্রদর্শনী মনোভাব) থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[৪২]

উপরোক্ত কথার সমর্থনে যায়দ ইবন আসলাম (রা)-এর এই বর্ণনাটির উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে বলেন, তাকে শেখাও। তিনি লোকটিকে কুরআন শিখাতে লাগলেন। যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে

তখন শিক্ষার্থী বললেন: থাক, যথেষ্ট হয়েছে। শিক্ষক বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি জানেন, যে লোকটিকে শেখানোর দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন, সে যখন " فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه " পর্যন্ত পৌঁছলো, অমনি বলে উঠলো: থাক, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: دَعْهُ فَقَدْ فَقِهَ. -"তাকে ছেড়ে দাও, সে পারদর্শিতা অর্জন করে ফেলেছে।"[৪৩]

---

৪১. সূরা ফাতির-২৮
৪২. ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ.-১, পৃ.৫
৪৩. আদ-দুররুল মানছূর, খ.৬, পৃ. ৩৮১, ৩৮২

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপট এই অর্থ ব্যক্ত করে যে, তার অন্ত:করণ ঈমানের দীপ্তিতে দীপ্তমান এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে। আর এই অর্থই সমর্থন করে আল-মুত্তালিব ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হানতাব (রা)-এর এই বর্ণনাটি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মাজলিসে পাঠ করেন:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

কেউ অণূ পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সেও তা দেখবে। (সূরা আল্‌ যিলযাল : ৭-৮)

সেই মাজলিসে একজন মরুবাসী বেদুঈন উপস্থিত ছিল। সে আয়াতটি শুনে বলে উঠলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সরিষা পরিমাণ? বললেন: হাঁ। বেদুঈন বললো: হায়রে মন্দকপাল! তারপর সে উঠে দাঁড়ালো এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে করতে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বেদুঈনের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেছে।[৪৪]

এখানে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা:
لَقَدْ دَخَلَ قَلْبَ الأَعْرَابِيِّ الإِيمَانُ –(বেদুঈনের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেছে), আর পূর্ববর্তী হাদীছের কথা: فَقَدْ فَقِهَ (সে পারদর্শী বা বুৎপত্তি অর্জন করেছে) একই অর্থ ও ভাব প্রকাশ করছে।

'আমল (কর্ম) সঠিক হওয়ার জন্য 'ইলম (জ্ঞান) পূর্বশর্ত

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 'আমল তথা কর্মের জন্য 'ইলম তথা জ্ঞান অত্যাবশ্যক। যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী 'আমল শুদ্ধ, সঠিক ও যথাযথ হতে পারে। সেই 'আমল আল্লাহর 'ইবাদাত হোক বা হোক না তা মানুষের সাথে আচরণ ও আদান-প্রদান মূলক। 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) বলেন:

مَنْ عَمِلَ فِيْ غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفْسُدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلَحُ

যে ব্যক্তি জ্ঞান ('ইলম) ছাড়া কাজ (عمل) করে, সে যতটুকু ঠিক করে তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে।[৪৫]

---

৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.৩৩

পূর্ববর্তী মু'আয ইবন জাবালের (রা) 'ইলমের মর্যাদা বিষয়ক হাদীছে এসেছে :

وهو إمام العمل والعمل تابعه.

'ইলম হলো 'আমলের ইমাম, আর 'আমল তার অনুসারী।

'ইলম (জ্ঞান) ছাড়া 'ইবাদাত সঠিক হয় না

কোন 'ইবাদাতই সঠিকভাবে আদায় হতে পারে না যদি 'ইবাদাতকারী সেই 'ইবাদাতের শর্ত, রুকনসমূহ এবং কিসে সেই 'ইবাদাত বাতিল হয়ে যায় সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে যথাযথভাবে রুকু'-সাজদা না করে খুব দ্রুততার সাথে সালাত আদায় করে। সালাত শেষ হলে তিনি লোকটিকে বলেন:

إِرْجَعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

যাও, আবার সালাত আদায় কর, তুমি সালাত আদায় করনি।[৪৬]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বলেন: لَمْ تُصَلِّ (তুমি সালাত আদায় করনি), অথচ সে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনেই সালাত আদায় করেছিল। এর কারণ হলো, তার সালাত ছিল এমন ত্রুটিপূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত যে, তা যেন কোন সালাতই ছিল না।

'ইলম (জ্ঞান) ছাড়া কোন আচরণ সঠিক হবে না

মানুষের জীবনের বিভিন্ন আচরণ ও কর্মকাণ্ড, তা হোক ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক, মোট কথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ঠিক-বেঠিক, হালাল-হারাম ইত্যাদি ভালোমত জানা অপরিহার্য। তা না হলে যে কোন সময় সে অজ্ঞতাবশত: হারাম কাজ করে বসতে পারে। আর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন ক্ষমার যোগ্য ওজর হিসেবে গণ্য করা হয় না।

স্পষ্টভাবে যা কিছু হালাল তা করা বা না করাতে কোন দোষ নেই। ঠিক তেমনিভাবে যা কিছু স্পষ্টভাবে হারাম তা করার পেছনে কোন যুক্তি বা ওজর থাকতে পারে না। আর যা কিছু এ দু'য়ের মাঝখানে সন্দেহযুক্ত- لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ "যা

---

৪৬. আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ.২, পৃ. ২৯৫

অধিকাংশ মানুষ জানেনা", যে এটা হালাল না হারাম, সে ক্ষেত্রে সন্দেহের শেষ সীমা পর্যন্ত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يوا قعه.

যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে দূরে থাকলো সে তার দীন ও মান-ইজ্জতের মুক্তি কামনা করলো। আর যে সন্দেহে পড়লো সে হারামের মধ্যে পড়লো। যেমন একজন রাখাল সংরক্ষিত ভূমির পাশে ছাগল চরায়। যে কোন মুহূর্তে সে সংরক্ষিত ভূমিতে ঢুকে যেতে পারে।

আমাদের পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ীদেরকে কেনাবেচার ও লেনদেনের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন ভালো মত জেনে নেয়ার অথবা এ বিষয়ে একজন পারদর্শী ফকীহ্র পরামর্শ গ্রহণ করার উপদেশ দিতেন। একইভাবে তাঁরা মানুষের নেতৃত্ব দিতে অথবা মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তিদেরকে পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই এ সংক্রান্ত জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনেরও উপদেশ দিতেন। যাতে সে তার জ্ঞানের আলোকে পথ চলতে পারে। তাদের থেকে একথাটি প্রচলিত আছেঃ

تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تَسَوَّدُوْا.

নেতৃত্ব দেওয়ার আগে তা ভালোভাবে জেনে বুঝে পারদর্শিতা অর্জন কর।

নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের পদসমূহে নিয়োগ লাভের পূর্বশর্ত 'ইলম (জ্ঞান)

নবী ইউসুফ (আ) চাচ্ছিলেন মিসর-রাজ তাঁকে মিসরের মাটিতে এমন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করুন যেখানে তাঁর মত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকে করা হয়। তিনি নিজের ব্যক্তিগত যে সকল যোগ্যতার কথা তুলে ধরেন তার শীর্ষে হলো হিফ্য ও 'ইলম তথা আমানতদারী ও জ্ঞান। তিনি বলেনঃ

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, জ্ঞানী।[৪৭]

৪৭. সূরা ইউসুফ-৫৫

সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বমূলক কর্মসমূহে, যেমন রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারপতির দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি, যারা নিয়োগ লাভ করবেন তাদের জন্য ফকীহ্গণ এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, তাকে এতখানি স্বতন্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে যাতে তিনি মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছতে পারেন। কেউ কোন ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা ফাতওয়া দিতে পারেন, কোন আদেশ করলে সত্য-সঠিক আদেশ করতে পারেন, কোন বিচার করলে ন্যায় বিচার করতে পারেন এবং কোন আহ্বান জানালে দূরদৃষ্টির সাথে জানাতে পারেন। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন মুকাল্লিদ তথা অন্ধ অনুসারীকে গ্রহণ করা হয়নি। তবে উপযুক্ত কাউকে না পেলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে এই মূলনীতি প্রয়োগ করা হয় :

الضرورات تبيح المحظورات

প্রয়োজন নিষিদ্ধ কাজকেও বৈধ করে।

সর্বোচ্চ আদর্শ ও নৈতিকতা থেকে সর্বনিম্নের বাস্তবতায় নেমে আসতে হয়। তবে উম্মাতের এটা অপরিহার্য দায়িত্ব যে, তারা তাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য যেন যোগ্যতম ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ সেই পদে অধিষ্ঠিত হতে না পারে। এই নেতৃত্ব ও পরিচালকের জন্য 'ইলম ও 'আমলে (জ্ঞান ও কর্মে) যোগ্যতমরাই উপযুক্ত।

আল্লাহর শরী'আত তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ কোন ব্যক্তি মুসলিমদের রাজনীতি ও বিচার বিভাগের পদে আসীন হোক, ফকীহ্গণের কেউ তা বৈধ মনে করেননি। কারণ আল্লাহর শরী'আতই হলো দু'জন মুসলিমের মধ্যে বিচার-ফায়সালার ভিত্তি। সুতরাং সে বিচারে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে হয় অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অথবা নিজের খেয়াল-খুশিমত বিচার করবে। সেক্ষেত্রে সে হবে জাহান্নামী।[৪৮]

বুরাইদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন:

القضاء ثلاثة، واحد فى الجنة، و اثنان فى النار، فأما الذى فى الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار فى الحق فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار.

বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে এবং অপর

৪৮. নায়লুল আওতার, খ.৯, পৃ. ১৬৭

দু'প্রকারের বিচারক যাবে জাহান্নামে। জান্নাতে সেই ব্যক্তি যাবেন যিনি সত্যকে জেনে সেই অনুযায়ী বিচার করেন। আর যে ব্যক্তি সত্যকে জানলো এবং অন্যায় ভাবে সিদ্ধান্ত দিল, সে যাবে জাহান্নামে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে বিচার করে সেও জাহান্নামে যাবে।[৪৯]

'ইলম হলো 'আমলের স্তর ও অগ্রাধিকারের নির্দেশক

'ইলমই বলে দেয় কোন 'আমলটি অগ্রাধিকার যোগ্য, কোনটি মর্যাদাবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ, গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি সুন্নাত ও কোনটি বিদ'আত ইত্যাদি। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোনটির কী মূল্য তা 'ইলমই নির্ধারণ করে। অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা 'আমলের সীমা ও স্তরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তালগোল পাকিয়ে ফেলে। শরী'আত যে আমলের যতটুকু মর্যাদা দিয়েছে, তা দিতে ব্যর্থ হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বাড়াবাড়ি করে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে। তারা দীন পালনে হয় কঠোরতা, নয়তো শিথিলতা করে। আমরা এ জাতীয় লোকদেরকে অনেক সময় দেখে থাকি, তাদের সরলতা ও নিষ্ঠার কারণে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন 'আমলকে অগ্রাধিকার দান করে থাকে। তারা তুলনামূলকভাবে অধিক মর্যাদাপূর্ণ 'আমল ছেড়ে কম মর্যাদার আমলে ডুবে থাকে।

আর একটি 'আমল এক সময় অগ্রাধিকারযোগ্য হলেও অন্য সময় সেটিই হয়ে যায় কম গুরুত্বসম্পন্ন। ফলে তার অগ্রাধিকারের মর্যাদা আর থাকে না। স্বল্প জ্ঞানের কারণে অনেকে তা জানেনা। তারা দু'টি সময়ের পার্থক্য করতে যেমন পারে না তেমনি পারে না দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে।

কোন 'আমলটি অগ্রাধিকারযোগ্য সে ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অভাবে মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন দেখা যায় অনেকে মাসজিদ নির্মাণের জন্য লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করেন, কিন্তু কুফর-নাস্তিকতা প্রতিরোধ, অনৈসলামী শক্তির মুকাবিলায় অথবা ইসলামের প্রচার প্রসারে বা এ জাতীয় বড় কোন উদ্দেশ্য সাধনে তাদের নিকট আর্থিক সহায়তা চাইলে একটি পয়সাও দিতে চান না। হজ্জের মওসুমে অনেক মুসলিম ধনী ব্যক্তিকে বার বার নফল হজ্জ আদায় করতে দেখা যায়, রামাদান মাসে হারামাইনে প্রতিবছর ই'তিকাফ করতে, 'উমরা করতে যায় এবং সংগে অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকেও নিয়ে যায় যাদের উপর হজ্জ-'উমরা ফরজই নয়, তাদের পেছনে

---

৪৯. আবূ দাঊদ, কিতাবুল আকদিয়্যাতি, হাদীছ-৩৫৭৩; তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, হাদীছ-১৩২২; ইবন মাজাহ্-২৩১৫

মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে। এর কিছু অংশ যদি দেশের গরিব-নিঃস্ব মানুষকে স্বচ্ছল করার প্রকল্পে দানের জন্য, অথবা দেশের অভাবী মানুষের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য চাওয়া হয় তখন তাদের উদার হস্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। তারা ঘাড় বাঁকিয়ে গর্ব ভরে চলে যায়।

আল-কুরআন আল-কারীমে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, শ্রেণীগতভাবে জিহাদের কার্যক্রম শ্রেণীগত হজ্জ কার্যক্রমের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ বলেন:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِندَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ.

হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সম জ্ঞান কর, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরাত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।[৫০]

উল্লেখিত আয়াতে ফরজ হজ্জের থেকে জিহাদকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা নফল হজ্জ ও 'উমরার জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন তারা কিন্তু নিজ দেশে কুফরী, নাস্তিকতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার যে প্রবল তৎপরতা ও প্রবাহ বিদ্যমান তা প্রতিরোধে সে টাকা দান করতে রাজি নন। অথচ এ কাজই বর্তমান সময়ের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ফরজ বা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

৫০. সূরা আত-তাওবা-১৯-২১

আজকাল অনেক নিষ্ঠাবান মুসলিম যুবককে দেখা যায় মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষি, কলা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান নিয়ে বের হচ্ছে। তারা অনেকে খুবই ভালো ফলাফল নিয়ে বের হয়। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যায় তারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পেছনে ছেড়ে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে বেরিয়ে পড়ে। অথচ তাদের এই বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করার কাজটি ফরজে কিফায়া পর্যায়ের। কেউ তা অর্জন না করলে অথবা জ্ঞান অর্জন করে তা দ্বারা উম্মাতের সেবা না করলে অথবা শৈথিল্য দেখালে সমগ্র উম্মাত ফরজ ত্যাগ করার জন্য দায়ী থাকবে। যদি তাদের নিয়্যাত সঠিক হতো এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিয়ম-নীতি মেনে কাজ করতো তাহলে তাদের এ কাজকে তারা 'ইবাদাত ও জিহাদে পরিণত করতে পারতো।

প্রত্যেক মুসলিমই যদি তার নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করে তাহলে মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করবে কে? দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভূত হলেন, তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। তিনি তাঁদের নিজ নিজ পেশা ছেড়ে দা'ওয়াত ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগের দাবি করেননি। তাঁরা সকলে নিজ নিজ পেশা ও কর্মে নিয়োজিত থাকেন- তা হিজরাতের আগে হোক বা পরে। তবে যখন জিহাদের ডাক আসতো তখন সকলে জান-মালসহ আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন। ইমাম আল-গাযালী (রহ) তাঁর সময়ের সকল শিক্ষার্থী ফিক্হ বা এ জাতীয় বিষয় কেবল অধ্যয়ন করুক তা মোটেই পছন্দ করতেন না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মুসলিমদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হয় ইহুদী নতুবা খৃস্টান ডাক্তারদের নিকট নিজেদের জীবন ও ইজ্জত সমর্পন করা ছাড়া উপায় থাকবে না, আর তা ইসলাম সমর্থন করে না।

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এবং কোন কাজটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য তা না জানার কারণে দেখা যায় মুসলিমগণ অতি ছোট-খাট বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতপার্থক্য করছে, যা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। অথচ তাদের সামনেই ঘটে চলেছে ইসলাম বিদ্বেষীদের সর্বনাশা সব ষড়যন্ত্র। অথচ সে দিকে তাদের কোন রকম দৃষ্টি নেই। সে সব প্রতিরোধে কিছু অর্থ ব্যয়ের কথা বললে তারা বিরক্তি প্রকাশ করে।

ইসলামের প্রতি বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান অনেক যুবককে দেখা যায় তারা তাদের পিতা-মাতার সাথে, ভাই-বোনদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে, অথচ তারা আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। তারা তাদের এ কাজের স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় যে, তাদের মা-বাবা ও ভাই-বোন দীনের বিধি বিধানের প্রতি উদাসীন হয়ে নানারকম পাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে, পিতা-মাতা মুশরিক হলেও এবং তারা তাদের সন্তানদেরকে শিরকের উপর অটল রাখার জন্য বাড়াবাড়ি

করলেও আল্লাহ্ তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا...

তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদভাবে...।[৫১]

পিতা-মাতার অনমনীয় আচরণ, কুরআন যাকে শিরকের উপর অটল রাখার জন্য জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছে, সত্ত্বেও তাদের সাথে পার্থিব জীবনে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, পিতা-মাতার এমন অধিকার যার উপর কেবল আল্লাহর অধিকার ছাড়া আর কোন কিছু নেই। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

...أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ

...সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।[৫২]

শিরকের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কারণ :

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق

স্রষ্টার অবাধ্যতা হয় এমন কোন কিছুতে সৃষ্টির আনুগত্য নেই।

তবে সদ্ভাবের সাথে ভদ্রভাবে তাদের সাথে আচরণের ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য বা গাফলতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ঐচ্ছিক তথা নফল 'ইবাদাত থেকে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকা উত্তম

পূর্বে উল্লেখিত সকল হাদীছ, এই মর্মে অন্য যে সকল হাদীছ এসেছে এবং সাধারণভাবে জ্ঞানের মর্যাদা বিষয়ে আসা অন্যান্য হাদীছ আমাদের পূর্ববর্তী বহু সত্যনিষ্ঠ 'আলিমকে এমন কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যে সকল ঐচ্ছিক 'ইবাদাত করা হয় তার চেয়ে জ্ঞান চর্চা করা উত্তম। ইবন মাস'উদ (রা) বলেন: অধ্যয়ন হলো সালাত। আবুদ দারদা' (রা) বলেন:

---

৫১. সূরা লুকমান-১৫।
৫২. প্রাগুক্ত-১৪।

مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليل

এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল 'ইবাদাত-বন্দেগী করা থেকে উত্তম।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন:

مذاكرة العلم بعض ليله أحب إليَّ من إحيائهما

সারা রাত নফল 'ইবাদাত-বন্দেগী করা থেকে রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা আমার নিকট বেশি প্রিয়।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

لأن أجلس ساعة فأفقه فى دنيى أحب إلى من أن أحيى ليلة إلى الصباح.

সকাল পর্যন্ত রাত জেগে 'ইবাদাত-বন্দেগী করি, তার চেয়ে এক ঘন্টা বসে আমি আমার দীনের ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করি- তা-ই আমার নিকট বেশি প্রিয়।

সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন:

ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم.

ফরজসমূহের পরে জ্ঞান অন্বেষণের চেয়ে উত্তম কিছু নেই।

তিনি আরো বলেন:

ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم.

আজ আমি জ্ঞান অন্বেষণের চেয়ে উত্তম কোন কিছু আছে বলে জানি না।

ইবন ওয়াহাব (রহ) বলেন: আমি ইমাম মালিকের (রহ) নিকট বসে প্রশ্ন করছিলাম। এক সময় উঠার জন্য বই-পুস্তক গোছাতে লাগলাম। মালিক (রহ) বললেন: কোথায় যাচ্ছো? বললাম: সালাত আদায় করতে। বললেন: তুমি যে কাজের দিকে যাচ্ছো তার চেয়ে এখন যে কাজের মধ্যে আছো, যদি নিয়্যাত সঠিক থাকে, তাহলে তা তুচ্ছ কিছু নয়। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুতার্‌রিফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আশ্‌-শিখ্‌খীর (রহ) বলেন:

حظٌّ من علم أحب إليَّ من حظٍّ من عبادة.

জ্ঞানের কিছু অংশ 'ইবাদাতের কিছু অংশ থেকে আমার বেশি প্রিয়।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেন:

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

জ্ঞান অন্বেষণ করা নফল সালাত থেকেও উত্তম।

ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ)-এর সকল নফল 'ইবাদাতের উপর জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিষয়ে যে মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তদ্রূপ মত ইমাম আবূ হানীফাও (রহ) পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরাই হলেন ফিক্‌হ ও অসুসৃত মাযহাবসমূহের সম্মানিত ইমাম।[৫৩]

উল্লেখ্য যে, এখানে 'ইলম ও 'ইবাদাতের মধ্যে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের যে সকল কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ফরজ 'ইলম ও ফরজ 'ইবাদাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা যেমন নয়, তেমনি নফল 'ইলম ও ফরজ 'ইবাদাতের বা এর বিপরীতের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা নয়। কারণ, দু'টি অপরিহার্য ফরজের মধ্যে তুলণামূলক শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। ফরজ 'ইবাদাত যেমন: সালাত যথাসময়ে নিয়মিত আদায় করা থেকে কোন কিছুই, তা জ্ঞান অন্বেষণই হোক না কেন, বিরত রাখতে পারে না। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই জ্ঞান চর্চার কারণে ফরজ কোন 'ইবাদাত থেকে বিরত থাকবেন, তা তিনি নিজে হোন, বা অন্য কেউ হোন, কল্পনাও করতে পারেন না।

এ কারণে ইবনুল কায়্যিম (রহ) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) এ হাদীছটি বর্ণনা করেন:

فضل العلم خير من نفل العمل "নফল 'আমলের চেয়ে 'ইলমের মর্যাদা উত্তম।" তারপর তিনি বলেন, এ হাদীছটি এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কথা। কারণ, 'ইলম ও 'আমল দু'টিই যদি ফরজ হয় তাহলে উভয়টি আপন আপন স্থানে অবশ্য করণীয়। আর যদি 'ইলম নফল হয় এবং 'ইবাদাতও নফল হয় তাহলে নফল 'ইলম শ্রেষ্ঠ। কারণ 'ইলমের উপকারিতা ব্যাপক। 'আলিম ব্যক্তি যেমন তা লাভ করেন, তেমনি অন্যরাও তা ভোগ করেন। আর 'ইবাদাতের সুবিধা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৫৪]

'ইলমের মর্যাদা জিহাদের উপরে

'ইবাদাতের উপরে 'ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা যেমন, তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব জিহাদের উপরেও। আর এই জিহাদ হলো ইসলামের শীর্ষ চূড়া, কুরআন ও হাদীছে যার

---

৫৩. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.২৫, বাবু তাফদীলিল 'ইলম; ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্, খ. ১, পৃ. ১১৯

৫৪. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্, খ.১, পৃ.১২০

ফজীলাত ও মর্যাদার প্রচুর কথা এসেছে। মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা), যিনি জ্ঞানের অন্যতম ধারক-বাহক এবং হিদায়াতের অন্যতম প্রদীপ, বলেন:

> والذي نفسي بيده، ليودن رجال قتلوا فى سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء، لما يرون من كرا متهم.
>
> সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! যে সকল মানুষ আল্লাহর পথে শহীদ হিসেবে নিহত হয়েছেন তাঁরা 'আলিমদের সম্মান-মর্যাদা দেখে ইচ্ছা পোষণ করবেন, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে 'আলিম হিসেবে পুনরায় জীবিত করেন।[৫৫]

তাবি'ঈকুল শিরোমণি আল হাসান আল-বাসরী (রহ) বলেন:

> يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء.
>
> 'আলিমদের কলমের কালি শহীদদের রক্তের সাথে ওজন দেওয়া হবে। তখন 'আলিমদের কালির পাল্লা ভারী হবে।

'আলিমদের এমন মর্যাদার পেছনে যুক্তি আছে। যেমন: জিহাদের যে ফজীলাত ও মর্যাদা তা কেবল 'ইলম দ্বারাই জানা যায়। জিহাদের শর্ত ও সীমাসমূহ 'ইলমের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। কোনটি শরী'আতসম্মত জিহাদ এবং কোনটি শরী'আত বিরোধী যুদ্ধ তা কেবল 'ইলম দ্বারাই জানা যায়। এমনিভাবে কোনটি ফরজ জিহাদ এবং কোনটি নফল; কোনটি ফরজে আইন এবং কোনটি ফরজে কিফায়া, তাও 'ইলম ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আর এসব না জানলে একজন মুসলিমের জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে জিহাদে যেতে ইচ্ছুক বহু মুসলিমকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তিনি দেখেছেন, তাঁরা জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ত্যাগ করে জিহাদে যেতে চাচ্ছে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেন: এক ব্যক্তি নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করবেন; তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সে বললো: হাঁ, আছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ففيهما فجهد –তাহলে তাদের সেবার মাধ্যমে জিহাদ কর।[৫৬]

---

৫৫. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২১
৫৬. আল বুখারী খ.৬, পৃ.১৪০, কিতাবুল জিহাদ: বাবুল জিহাদ বিইযনিল ওয়ালিদাইন; মুসলিম,

অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবাই হবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের সমমর্যাদার।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সংগে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। আমি যখন এসেছি, আমার মাতা-পিতা তখন কাঁদছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও, যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছো।[৫৭]

আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরাত করে নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসে। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেন: ইয়ামানে তোমার আর কেউ আছে? সে বলে: মাতা-পিতা আছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে চান: তারা কি তোমাকে (হিজরাতের) অনুমতি দিয়েছেন? সে বলে: না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তুমি তাঁদের কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের অনুমতি চাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাবে, অন্যথায় তাঁদের প্রতি সদাচারী হবে।[৫৮]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে পরামর্শ করতে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন: তোমার মা জীবিত আছেন কি? বললো: হাঁ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: الزمها فإن الجنة عند رجليها –তার সাথেই থাক। কারণ, জান্নাত তার দু'পায়ের কাছে।[৫৯]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীছে এসেছে: এক ব্যক্তি নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো: আমি আপনার নিকট জিহাদ ও হিজরাতের বাই'আত করবো, এবং আল্লাহর নিকট থেকে এর বিনিময় লাভ করতে চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার পিতা-মাতার দু'জনের কোন একজনও কি বেঁচে আছেন? সে বললো: হাঁ, দু'জনই বেঁচে আছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি আল্লাহর নিকট থেকে বিনিময় লাভ করতে চাও? সে বললো: হাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে সাহচর্য দাও।[৬০]

কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা: বাবু বিররিল ওয়ালিদাইন

৫৭. মুসনাদু আহমাদ, খ.২, পৃ. ২০৪; আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ-২৫২৮; নায়লুল আওতার, খ.৮, পৃ.৩৭, ৩৮

৫৮. আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ-২৫৩০

৫৯. নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ-৩১০৪

৬০. মুসলিম, বাবু বিররিল ওয়ালিদাইন

এখানে উল্লেখিত হাদীছসমূহের ভিত্তিতে 'আলিমগণ জিহাদে যাওয়ার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করছেন। অপর দিকে মাতা-পিতা উভয়ের অথবা একজনের অনুমতি ছাড়া অথবা তাঁদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাদের জিহাদে যাওয়া হারাম বলেছেন। কারণ, পিতামাতার সেবা করা, তাঁদের প্রতি সদয় হওয়া ফরজে 'আইন, আর জিহাদ করা ফরজে কিফায়া। জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় তখন তাঁদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ, জিহাদ ত্যাগ করা তখন আল্লাহর অবাধ্যতা হবে। আর আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন ক্ষেত্রে কোন মানুষের আনুগত্যের বৈধতা নেই। জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতামাতার অনুমতি নেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার জন্য শর্ত হলো, পিতামাতাকে মুসলিম হতে হবে। কারণ, অমুসলিম পিতামাতা কখনো ইসলামের বিজয়ের জন্য এবং তাদের ধর্মকে ব্যর্থ করার জন্য তার সন্তানকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেবে না।

এ সকল সীমা ও সূক্ষ্ম পার্থক্য সমূহ কেবল 'ইলম তথা জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। কেউ যদি জ্ঞান পরিহার করে জিহাদে লেগে থাকে তাহলে তার অজান্তে ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া অথবা বিপথগামী হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামের ইতিহাসে অতীতে এমনটি দেখা গেছে যে, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে জিহাদের নামে অনেক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে মানুষের, এমন কি মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ খারেজী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। আধুনিক যুগেও মুসলিম বিশ্বে কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে জিহাদের শ্লোগানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু তারা যদি সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করতো এবং বুঝতো যে, জিহাদ কিভাবে হয়, তাহলে তারা এমন কাজে লিপ্ত হতে পারতো না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-হাসান আল-বাসরীর (রহ) একটি উপদেশবাণী বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন: "জ্ঞান ছাড়া কর্ম সম্পাদনকারী হলো পথহারা পথিকের মত। এমন ব্যক্তি যতটুকু সুষ্ঠুভাবে করে তার চেয়ে বেশি বিনষ্ট করে। সুতরাং এমনভাবে জ্ঞানার্জন কর যাতে 'ইবাদাতের কোন ক্ষতি না হয় এবং এমনভাবে 'ইবাদাত কর যাতে জ্ঞানার্জনের পথে কোন বিপত্তি না ঘটে। একটি সম্প্রদায় 'ইবাদাতে নিমগ্ন হয়েছে এবং জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । তারা যদি জ্ঞানার্জন করতো তাহলে তারা যা করেছে তা করতো না।"[৬১]

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম যে জিহাদের কথা বলেছে, তার সবটুকুই কিন্তু

---

৬১. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্, খ.১,পৃ.৮২

তরবারির জিহাদ নয়, বরং সেই জিহাদ হতে পারে অন্তর, জিহ্বা, যুক্তি, বাগ্মিতা ইত্যাদির মাধ্যমেও । আর এই জিহাদ হলো 'ইলম তথা জ্ঞানের মাধ্যমে। একথাই আল- কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলছেন এভাবে:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

অত:পর তুমি কাফিরদের আনুগত্য করবে না এবং তাদের সংগে (কুরআন) দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ করে যাও।[৬২]

এ আয়াতে (بِه) দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন দ্বারা এই জিহাদকে جهادًا كبير –সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। এ হুকুম ছিল, মক্কায় সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও... ।[৬৩]

এ আয়াতে কাফিরদের সংগে যে জিহাদ তা হাত ও বাহুর সংগে সম্পৃক্ত, কিন্তু মুনাফিকদের সংগে যে জিহাদ তা হাতের সংগে নয়, বরং জিহ্বার সংগে সংম্পৃক্ত। একটি হাদীছে এসেছে :

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع.

যে ব্যক্তি জ্ঞান-অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয় সে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।[৬৪]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন: উল্লেখিত হাদীছে জ্ঞান- অন্বেষণকে আল্লাহর পথে অবস্থান বলা হয়েছে। এটা জিহাদের মত ইসলামের ভর ও অবলম্বন। দীনের ভর ও অবলম্বন সুদৃঢ় হয় 'ইলম ও জিহাদ উভয়ের দ্বারা। এ কারণে জিহাদের প্রকার দু'টি : হাত ও তরবারির জিহাদ । আর এ জিহাদের অংশীদার অনেকে হতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো যুক্তি প্রমাণ ও বাগ্মিতার জিহাদ। এটা হলো রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারী কিছু বিশেষ ব্যক্তির জিহাদ। এটাই হলো ইমামগণের জিহাদ।

---

৬২. সূরা আল-ফুরকান-৫২
৬৩. সূরা আত-তাওবা-৭৩, আত-তাহরীম-৯
৬৪. তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬২৯

দু'প্রকার জিহাদের মধ্যে এটাই হলো উত্তম জিহাদ। কারণ এর উপকারিতা বিশাল, দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর এবং শত্রুও অনেক বেশি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সূরা আল-ফুরকানে বলেন :

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا. فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করবে না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।[৬৫]

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ । সেখানে তরবারির জিহাদের নির্দেশ ছিল না। এ আয়াতে যে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হলো আল- কুরআন দ্বারা। আর এটাকেই বলা হয়েছে দুটি জিহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। মুনাফিকদের সাথেও এই আল- কুরআন দ্বারা জিহাদ করতে বলা হয়েছে। কারণ, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কখনো তরবারির যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের পক্ষ অবলম্বন করতো এবং অনেক সময় মুসলিমদের সাথে মিলে তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধও করতো। তা সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলমীন সূরা আত তাওবার ৭৩ নং আয়াতে বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও:...।

এ আয়াতে মুনাফিকদের সাথে যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে তা মূলত যুক্তি ও আল-কুরআন দ্বারা, নিশ্চিত তা তরবারি দ্বারা নয়।

আল-কুরআন ও আল-হাদীছে যে سَبِيْلِ الله (সাবীলিল্লাহ) বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হলো জিহাদ ও জ্ঞানার্জন এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা । এ কারণে মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন:

عليكم بطلب العلم، فأن تعلمه لله خشية و مدا رسته عبادة، و مذ اكرته تسبيح، و البحث عنه جهاد.

জ্ঞান অর্জন করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ, বিদ্যা শিক্ষা করা হলো মূলত: আল্লাহকে ভয় করা, তা পঠন-পাঠন হলো 'ইবাদাত, তা পরস্পর

---

৬৫. সূরা আল-ফুরকান-৫১-৫২

আলোচনা করা হলো তাসবীহ পাঠ এবং তা গবেষণা ও অনুসন্ধান করা হলো জিহাদ।

এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কিতাব, মীযান ও সাহায্যকারী "হাদীদ" (লোহা) –তিনটি জিনিসকে একই সাথে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ.

নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমি লোহাও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ । তা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৬৬]

এ আয়াতে 'কিতাব ও হাদীদ' উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এ দু'টির উপর রয়েছে দীনের ভর ও নির্ভরতা।

আরেকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, তরবারির জিহাদ ও যুক্তি-প্রমাণের জিহাদ দু'টিই হলো: سبيل الله (সাবীলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথ। আর তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিম্নোক্ত আয়াতের أُوْلِى الأَمْرِ এর ব্যাখ্যা করেছেন أمراء ও علماء (আমীরগণ ও 'আলিমগণ) দ্বারা। কারণ, তাদের উভয় শ্রেণীর লোক আল্লাহর পথের মুজাহিদ। এক শ্রেণী হাত দিয়ে এবং অন্য শ্রেণী জিহ্বা দিয়ে যুদ্ধ করেন। আল্লাহ বলেন:

أَطِيْعُواْ اللهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ...

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে নির্দেশ প্রদানের অধিকারী।[৬৭]

---

৬৬. সূরা আল-হাদীদ-২৫

৬৭. সূরা আন-নিসা-৫৯

অতএব, জ্ঞানার্জন করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আল্লাহর পথ (سبيل الله)। কা'ব আল আহবার (রহ) বলেন, জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদের মত। কোন কোন সাহাবী (রা) বলেছেন, একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষারত অবস্থায় মৃত্যু হলে সে শহীদ হবে। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন: যে জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, সে আল্লাহর নিকট বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করেছে। প্রখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা' (রা) বলেন:

من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص فى عقله و رأيه.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে সকাল-সন্ধ্যায় যাতায়াতকে জিহাদ নয় বলে মনে করে, তার বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তে ত্রুটি আছে।"[৬৮]

আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতে 'ইলম উপকারে আসে

'ইলমের অন্যতম গুণ ও মাহাত্ম্য এই যে, তা তার অধিকারী 'আলিম ব্যক্তিকে কেবল আখিরাতের 'ছাওয়াব ও পুরস্কারই এনে দেয় না, বরং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট যেমন তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তেমনি বৃদ্ধি করে মানুষের নিকটও। সুতরাং 'ইলমের চূড়ান্ত ফলাফল অতি নিকটে ও দ্রুত।

আল্লাহ বলেন:

...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

...হে আমাদের প্রতিপালক: আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতে কল্যাণ দিন।[৬৯]

ইমাম আল-হাসান আল-বাসরী (রহ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: فى الدنيا حسنة অর্থ: দুনিয়াতে 'ইলম ও 'ইবাদাত এবং و فى الآخرة حسنة অর্থ: আখিরাতে জান্নাত।

---

৬৮. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, খ. ১, পৃ. ৭১, ৭৭
৬৯. সূরা আল বাকারাহ : ২০১

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন: এটা উত্তম তাফসীর। কারণ, দুনিয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ হলো উপকারী সত্য সঠিক জ্ঞান।[৭০]

এ ক্ষেত্রে ইবন আবযা (রহ)-এর ঘটনা একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। সেটি হলো, নাফি' ইবন 'আবদিল ওয়ারিছকে (রা) খালীফা 'উমার (রা) মক্কার আমীর নিয়োগ করেন। খালীফা 'উসফান নামক স্থানে গেছেন ভ্রমনে। নাফি' সেখানে গিয়ে খালীফার সাথে সাক্ষাত করেন। খালীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : উপত্যকার অধিবাসীদের দেখাশুনার দায়িত্ব কাকে দিয়ে এসেছো? নাফি'বললেন: ইবন আবযাকে। খালীফা জানতে চাইলেন: ইবন আবযা কে? বললেন : আমাদের একজন আযাদকৃত দাস। খালীফা বললেন: একজন দাসকে স্থলাভিষিক্ত করে এসেছো? নাফি' বললেন: সে কিতাবুল্লাহর একজন ভালো কারী এবং ফারায়েজ শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ 'আলিম। খালীফা বললেন: শোন, তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গেছেন :

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و يضع آخرين.

নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের দ্বারা অনেক সম্প্রদায়কে উঁচুতে উঠাবেন এবং অন্যদেরকে নিচুতে নামাবেনা।[৭১]

ইবরাহীম আল-হারবী (রহ) বলেন: প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আতা' ইবন আবী রাবাহ (রহ) ছিলেন মক্কার এক মহিলার একজন কালো ক্রীতদাস। উমাইয়া খালীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক তাঁর দুই ছেলেকে সংগে করে 'আতা'র (রহ) নিকট গেলেন। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তাঁরা তাঁর পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সালাত শেষ হলে তিনি তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁরা তাঁর নিকট হজ্জের বিভিন্ন বিধিবিধান জানার জন্য প্রশ্ন করতে লাগলেন। 'আতা' তাঁদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে জবাব দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে সুলায়মান তাঁর দুই ছেলেকে বললেন: ওঠো। তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন: আমার ছেলেরা! তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ থেকে বিরত থেকনা। আমি এই কালো ক্রীতদাসের নিকট যেভাবে অপমানিত হলাম তা কখনো ভুলবো না।[৭২]

জ্ঞানের বিলুপ্তি পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বাভাস

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহু বাণীতে এ সত্যটি বার বার

---

৭০. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, খ. ১, পৃ. ৭৭
৭১. মুসলিম, বাবু সালাতিল মুসাফিরীন, মুসনাদু আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৩৫; আল ফাতহুর রাব্বানী, খ. ১, পৃ. ১৪৬
৭২. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, খ. ১, পৃ, ১৬৫

উচ্চারিত হয়েছে যে, জ্ঞান ছাড়া জীবন টিকে থাকা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে জ্ঞানের বিলুপ্তি পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বাভাস এবং কিয়ামাত দ্বারপ্রান্তে উপস্থিতির ইঙ্গিতবহ। ইমাম আল-বুখারী (রহ) আনাস ইবন মালিকের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إنَّ من أشراط السَّاعة أن يرفع العلم، و يثبت الجهل، و فى رواية: يقل العلم و يكثر الجهل و يشرب الخمر، ويظهر الزنى.

কিয়ামাতের অনেক 'আলামতের মধ্যে কয়েকটি হলো: জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং অজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হবে, (অপর একটি বর্ণনায় এসেছে: জ্ঞানের স্বল্পতা দেখা দেবে এবং অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে), মদপান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে।[৭৩]

'আল্লামা আল-কিরমানী (রহ) তাঁর সহীহ্ আল-বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: "এই জিনিসগুলোতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার ইঙ্গিত দান করে। কারণ, সৃষ্টিজগতকে অশ্রু বিসর্জনের জন্য অবকাশ দেওয়া হবে না। আর আমাদের নবীর পরে আর কোন নবীও নেই। তাই, এই পরিণতি নির্ধারিত হয়ে আছে।[৭৪]

এখানে 'ইলম তথা জ্ঞান বলতে নুবুওয়াত থেকে প্রাপ্ত 'ইলমে দীন বুঝানো হয়েছে। কারণ, এ জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহর দিকে পথ দেখায়, আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থামিয়ে রাখে এবং তার আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত করে। এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, মানুষ এই জ্ঞান থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং পার্থিব বিভিন্ন জ্ঞানের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারে। যেমন: আকাশ যুদ্ধ পরিচালনা করা, বিভিন্ন গ্রহে ও নক্ষত্রে অবতরণ ইত্যাদি। মানুষ এ সবকিছুই করবে, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে থাকবে অজ্ঞ ও অসতর্ক। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজকের পাশ্চাত্যবাসীদের অবস্থা এমনই। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিম্নের এ আয়াতে যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাদের অবস্থা তেমনই। তিনি বলেন:

...وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ. يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ.

---

৭৩. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ- ৮০
৭৪. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ, ১৮৯

...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা উদাসীন।[৭৫]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন প্রথমে لَا يَعْلَمُوْنَ –তারা জানেনা বলে তাদের জ্ঞানকে একেবারেই অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তারপরেই يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا –তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত– দ্বারা তাদের এক প্রকার জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহর এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক বক্তব্য বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কিন্তু আসলে কোন বিরোধ নেই। কারণ, পার্থিব জীবনের এই স্তরের বাহ্যিক জ্ঞানের সাথে মানুষের উৎপত্তি ও পরিণতির জ্ঞান বিষয়ে অসতর্কতা, মূলত তাদের সেই জ্ঞান অজ্ঞতারই নামান্তর। সুতরাং এমন জ্ঞানীদের সম্পর্কে যদি বলা হয়, তারা জানেনা, তাহলে বিস্ময়ের ও বিরোধের কিছু নেই।

প্রশ্ন হলো, 'ইলম (জ্ঞান) কিভাবে উঠে যাবে? আসলে বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিরোধানের সাথে জ্ঞানও চলে যাবে। বিভিন্ন সংকট সমাধানে মানুষ যাদের শরণাপন্ন হতো, বিবাদ-বিরোধ মীমাংসার জন্য যাদের নিকট যেত, যাদের নিকট ফাতওয়ার জন্য গেলে ফাতওয়া দিতেন, যাদের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য গেলে তাঁরা সত্য-সঠিক ও ন্যায় বিচার করতেন এবং যাঁরা মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, এমন জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিরোধানের সাথে তাঁদের জ্ঞানও দুনিয়া থেকে উঠে যাবে।

প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) থেকে সহীহ্ আল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساءَ جهَّالاً، فسُئلوا، فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا.

আল্লাহ বান্দাদের থেকে 'ইলম (জ্ঞান) ছিনিয়ে নেবেন না অর্থাৎ বান্দাদের অন্তর থেকে 'ইলম মুছে ফেলবেন না। বরং 'আলিমদের জান কবজের মাধ্যমে জ্ঞান কব্জা করবেন। অবশেষে যখন কোন 'আলিম

---

৭৫. সূরা আর রূম : ৬-৭

থাকবেনা তখন মানুষ জাহিলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অত:পর তাদের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞেস করলে জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৭৬]

বিদায় হজ্জে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

"خذوا العلم قبل أن يُقبض أويرفع. فقال أعرابى: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته" – ثلاث مرات.

ছিনিয়ে নেওয়া অথবা উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে তোমরা 'ইলম তথা জ্ঞানকে আঁকড়ে ধর। এক বেদুঈন প্রশ্ন করলো: 'ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: শোন, জ্ঞান চলে যাওয়া হলো জ্ঞানের ধারক-বাহকদের চলে যাওয়া।[৭৭] -একথাগুলো তিনি তিনবার বলেন।

এ কারণে আস্থাভাজন 'আলিমদের মৃত্যুকে একটি বড় মুসীবত বলে গণ্য করা হয়, মু'মিনগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন, আল্লাহর নিকট ধৈর্য ধারণ ক্ষমতার জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর বিকল্প আরেকজন 'আলিম দান করার প্রার্থনা করেন। এমন কি 'উমার (রা) থেকে একথাগুলো বর্ণিত হয়েছে:

لموت ألف عابد صائم النهار و قائم الليل أهون من موت عالم، بصير بحلال الله و حرامه

দিনে সাওম পালনকারী ও রাতে সালাতে দণ্ডায়মান একহাজার 'আবিদের মৃত্যু একজন 'আলিমের মৃত্যু থেকে আমার নিকট অবশ্যই সহজ ব্যাপার- যে 'আলিম আল্লাহর হালাল ও হারাম সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী।

ওহী লেখক (কাতিবুল ওহী), কুরআনের কারী ও আনসারদের 'আলিম প্রখ্যাত সাহাবী যায়দ ইবন ছাবিত (রা) মৃত্যুবরণ করলে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) মন্তব্য করেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ كَيْفَ ذَهَابُ الْعِلْمِ، فهكذا ذهابه.

'ইলম (জ্ঞান) কিভাবে চলে যায় কেউ যদি তা দেখে তৃপ্তি পেতে চায় (সে দেখুক) এভাবে তা চলে যায়।

---

৭৬. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ- ১০০; মুসলিম, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ- ২৬৭৩
৭৭. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ, ২০৫

আল-হাসান (রা) বলেন:

موت العالم ثلمة فى الاسلام، لايسدهاشئ ما أطرد الليل و النهار.

একজন 'আলিমের মৃত্যুতে ইসলামরূপী প্রাসাদে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়, যতদিন দিন-রাতের আবর্তন থাকবে কোন কিছুই তা বন্ধ করতে পারবে না।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: একজন করে 'আলিমের সবসময় মৃত্যু হবে এবং তার সাথে সত্যের চিহ্ন মুছে যাবে। এভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিদের চলে যাওয়াতে অজ্ঞ-মূর্খদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। অত:পর তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আমল করবে এবং অসত্যকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

প্রখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা' (রা) বলতেন:

مالى أرى علماءكم يذهبون، وجهُّالكُم لا يتعلمون؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء.

আমি কেন দেখতে পাই যে, তোমাদের 'আলিমগণ চলে যাচ্ছেন, আর তোমাদের জাহিলগণ শিখছে না? 'ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে তোমরা শিখে নাও। কারণ, 'ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো 'আলিমগণের চলে যাওয়া।[৭৮]

এমনিভাবে তাঁরা সবসময় জ্ঞান অর্জন করতে, অর্জিত জ্ঞান অপরকে শেখাতে এবং গ্রন্থাবদ্ধ করতে দারুণভাবে আগ্রহী ছিলেন। যাতে এমন কোন সময় না আসে যখন জ্ঞানের ধারক-বাহক এবং তাদের দায়িত্ব পালনের মত ব্যক্তিদের অভাব দেখা দেয়। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) তাঁর খিলাফাতকালে মাদীনার ওয়ালী আবু বাকর ইবন হাযমকে (রহ) লেখেন:[৭৯]

انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاكتبه، فأنى خفت دروس العلم وذهاب

---

৭৮. উল্লেখিত সকল বর্ণনা জামি'উ বায়ান আল 'ইলম গ্রন্থের- বাবু মা রূবিয়া ফী কাবজিল 'ইলমি ওয়া যিহাবিল 'উলামায়ি

৭৯. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ, ১৯৪, ১৯৫; ড. আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবন কথা, (বি.আই.সি, ঢাকা) খ. ২, পৃ. ১৭৮

العلماء، ولايقبل إلا حديث النبى صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لايعلم، فإن العلم لايهلك حتى يكون سرًا.

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমি ‘ইলমের বিলুপ্তি ও ‘আলিমদের তিরোধানের ভয় করছি। তবে কেবল নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। ‘আলিমগণ যেন ‘ইলমের প্রসার ঘটান এবং শিক্ষাদানের জন্য বসেন, যাতে যে জানে না, সে জানতে পারে। কারণ, ‘ইলম যতক্ষণ গোপন না হয়ে পড়ে, ধ্বংস হয় না।

আবূ নু‘আইম ‘তারীখু আসবাহান’ গ্রন্থে লেখেন:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه، فإنى أخاف دروس العلم وذهاب العلماء.

‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয খিলাফাতের দূরবর্তী অঞ্চলে লিখে পাঠান: আপনারা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ দেখুন, সংগ্রহ করুন ও সংরক্ষণ করুন। আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও ‘আলিমগণের তিরোধানের ভয় করি।[৮০]

দীনের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টির কারণ জ্ঞানের স্বল্পতা

অনেক নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান মানুষকে দেখা যায়, তারা দীনের মধ্যে এমন সব রীতি-নীতি ও কাজ-কর্ম চালু করেন যার অনুমতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেননি, এমন অনেক কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেননি, এমন অনেক কিছু করতে আদেশ করেন, যা করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেননি এবং এমনভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করেন যার বিধান শরী‘আত দেয়নি। এ সবকিছুই তাঁরা করেন নতুন ভাবে, একান্তই তাঁদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার উপর ভিত্তি করে। এ সবকিছু তারা করেন সৎ নিয়্যাত, পরিচ্ছন্ন অন্ত:করণ এবং

৮০. প্রাগুক্ত

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সৎ উদ্দেশ্যে । এটা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য আমলে সালিহ তথা সৎ কর্মের ভুল উপলব্ধি। 'আমল ভালো হওয়ার জন্য কেবল ভালো নিয়্যাত ও নিবেদিত প্রাণ হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে 'আমলটি শরী'আত অনুমোদিত এবং বিধানদাতার মোহরাঙ্কিত হওয়া অপরিহার্য। বিখ্যাত আল্লাহভীরু তাপস আল-ফাদল ইবন 'আয়্যাদ (রহ) একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে এই কথাটি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। একবার তাঁর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলোঃ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً...

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম...?[৮১]

তারপর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : أحسن العمل (সর্বোত্তম 'আমল) বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেনঃ أحسن العمل أخلصه و أصوبه –সর্বোত্তম 'আমল সেই 'আমলকে বলে যা সর্বাধিক নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সর্বাধিক সঠিক? লোকেরা বললোঃ হে আবূ 'আলী! সর্বাধিক নিষ্ঠাপূর্ণ অর্থ কী এবং সর্বাধিক সঠিক অর্থই বা কী? বললেন : 'আমল যদি নিষ্ঠাপূর্ণ হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। ঠিক তেমনি ভাবে সঠিক হলো, কিন্তু নিষ্ঠাপূর্ণ হলো না, তাও কবুল হয় না। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত ও সঠিক পদ্ধতিতে হতে হবে। নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিবেদিত হওয়ার অর্থ হলো 'আমল হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য, আর সঠিক হওয়ার অর্থ হলো তা হতে হবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত নিয়ম পদ্ধতিতে।[৮২]

জ্ঞানের মর্যাদা 'ইবাদাতের উপরে

ইসলাম পৃথিবীর প্রথম ধর্ম যা জ্ঞান চর্চা, অন্বেষণ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীরতা অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত যেমনঃ সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদির নফল 'আমলের উপর মর্যাদা দান করেছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, মানুষ ও জিনকে তিনি কেবল তাঁর 'ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।[৮৩]

---

৮১. সূরা আল-মুল্ক -২
৮২. ড. ইউসুফ আল-কারদাবী, আল 'ইবাদাতু ফিল ইসলাম, (বৈরূত), পৃ. ১৬৫-১৭৪
৮৩. সূরা আয-যারিয়াত-৫৬

কিন্তু সে 'ইবাদাত যদি জ্ঞান ছাড়া সম্পাদন করা হয় তাহলে তার দৃষ্টান্ত হলো ভিত্তি ছাড়া প্রাসাদ নির্মাণ করা। জ্ঞানই 'ইবাদাতের রুকন ও শর্তসমূহ, বাহ্যিক নিয়মাবলী, অভ্যন্তরীণ তাৎপর্যসমূহ ব্যাখ্যা করে, তেমনি বলে দেয় কিসে তা সঠিক ও পূর্ণ হয়, আর কিভাবে তা বাতিল ও অপূর্ণ হয়।

জ্ঞান তার অধিকারীকে বস্তুসমূহের কোনটির কী মর্যাদা, 'আমলসমূহের কোনটি কোন স্তরের তা শেখায়। ফলে সে নফল ও ফরজের মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীনের মধ্যে এবং মূল ও শাখা-প্রশাখা সমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাই সে কখনো গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয় না, শাখা-প্রশাখার কারণে মূলকে বিনষ্ট করে না। আর এ কারণে আমাদের অতীতের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলেছেন: "আল্লাহ নফল কবুল করেন না যতক্ষণ না সে ফরজ আদায় করে।" তাঁরা আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তিকে তার ফরজ 'আমল নফল 'আমল থেকে বিরত রেখেছে, তার এ অপারগতা ক্ষমাযোগ্য, আর যাকে তার নফল 'আমল ফরজ আদায় থেকে বিরত রেখেছে সে প্রতারিত হয়েছে।"

এ কারণে অনেক মানুষকে দেখা যায় সোম ও বৃহস্পতিবারে নফল সাওম পালন করে, কিন্তু পরদিন পারিশ্রমিকের বিনিময়ের কাজ অথবা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্বলতার কারণ দেখিয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, অথবা পরিবার বা সমাজের প্রতি তার যে দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করতে পারে না।

বহু মানুষকে দেখা যায় প্রতি বছর হজ্জ বা 'উমরা করে। অথচ ঋণ পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, অধিনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে ভালো আচরণ করে না অথবা সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে দীনের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে।

'ইবাদাতের উপর 'ইলমের একটি মর্যাদা এই যে, অধিকাংশ 'ইবাদাত তার পালনকারী ব্যতীত অন্য কারো উপকার করতে অক্ষম। যেমন: সালাত, সাওম, হজ্জ, 'উমরা, যিক্র, তাসবীহ ইত্যাদি কেবল পালনকারীর পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কিন্তু তাদের এই 'ইবাদাতসমূহ দ্বারা তারা ছাড়া তাদের সমাজ সরাসরি কোন উপকার লাভ করেনা। তাদের জন্য যেমন কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেনা, তেমনি তাদের থেকে কোন অকল্যাণও প্রতিহত করেনা। আর 'ইলম তথা জ্ঞানের উপকারিতা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকে না, বরং যে কেউ তা শোনে বা পড়ে উপকৃত হয়। অনেক সময় সেই শ্রোতা ও পাঠক এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, সাগর ইত্যাদির বিস্তর ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকও থাকে।

জ্ঞান কোন বিধি-নিষেধ, বন্ধন ও সীমাবদ্ধতা জানেনা এবং মানেনা। বিশেষ করে

আমাদের এ যুগে যখন শ্রুত জ্ঞান রেডিওতে প্রচার করা হয় এবং দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান টেলিভিশনে দেখানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে তথা সাথে সাথে দর্শক-শ্রোতার সামনে অথবা কানে পৌঁছে যায়। আর লিখিত জ্ঞান আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে কয়েকদিন, বরং কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

আবু উমামা (রা) বর্ণিত এ হাদীছটি শুনে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দু'ব্যক্তির প্রসঙ্গে কথা উঠলো। একজন 'আলিম এবং অপরজন 'আবিদ। অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:[৮৪]

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.

'আবিদের উপর 'আলিমের (জ্ঞানী) মর্যাদার দৃষ্টান্ত হলো তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার মত।

হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:[৮৫]

فضل العلم خير من فضل العبادة

'ইলমের ফজীলাত 'ইবাদাতের ফজীলাতের চেয়ে উত্তম।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবুদ দারদা' (রা) বর্ণনা করেছেন:

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.

'আবিদের উপর 'আলিমের মর্যাদা হলো নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমা রাতে চাঁদের মর্যাদার মত।

'ইবাদাতের উপর 'ইলমের মর্যাদার বড় প্রমাণ এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনের অবসানে তাঁর জ্ঞানের অবসান হয়না, তদ্রূপ তাঁর মৃত্যুতে জ্ঞানের মৃত্যু হয় না। কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করলো, সাওম পালন করলো, যাকাত আদায় করলো, হজ্জ, 'উমরা পালন করলো, তাসবীহ-তাকবীর পাঠ করলো- এ সমস্ত 'আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট থেকে প্রচুর সাওয়াব লাভ করবে। তবে এ সাওয়াব এই 'ইবাদাতসমূহ আদায় হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু 'ইলম তেমন নয়। এর ফলাফল যুগ থেকে যুগান্তরে যতদিন মানুষ তা চর্চা করবে, বিদ্যমান থাকবে।

---

৮৪. তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৮৬
৮৫. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (ঢাকা), খ.১, পৃ.৫৮, হাদীছ-৬৩

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:[৮৬]

إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو ولدصالح يدعوله.

যখন কোন আদম সন্তান মারা যায় তখন তিনটি জিনিস ছাড়া তার সকল কর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই জিনিসগুলো হলো: চলমান দান-সাদাকা, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন:[৮৭]

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، او مصحفا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أونهرًا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته.

মু'মিন ব্যক্তি তার যে সকল 'আমল ও সৎ কাজের প্রতিদান মৃত্যুর পরেও পেতে থাকবে তা হলো: এমন জ্ঞান যা সে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রসার ঘটিয়েছে, তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তান, অথবা কোন গ্রন্থ যা সে রেখে গেছে, অথবা কোন মাসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে, অথবা এমন কোন গৃহ যা সে কোন পথিকদের জন্য বানিয়েছে অথবা এমন কোন নদী যা সে প্রবাহিত করেছে, অথবা এমন দান-সাদাকা যা সে তার সুস্থ অবস্থায় ও জীবদ্দশায় নিজ সম্পদ থেকে করেছে। তার মৃত্যুর পর তার সাথে মিলিত হবে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার সীমিত জীবনকালের পরে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে দীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকেন। বিশেষ করে যাঁরা লেখেন, গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের এই লিখিত গ্রন্থের জীবন হয় আরো দীর্ঘ, তার ফলাফল হয় চিরকালীন। যেমন আমরা আজ আমাদের পূর্ববর্তী 'আলিমগণের রচিত গ্রন্থরাজি দ্বারা উপকৃত হচ্ছি, তাঁদের জন্য দয়া

৮৬. মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসীয়্যাত; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮৫, হাদীছ-১০৯
৮৭. ইবন মাজাহ্, মুকাদ্দিমাহ্

ও অনুগ্রহ কামনা করে দু'আ করে থাকি। অথচ আমাদের ও তাঁদের মধ্যে কত শত বছরের ব্যবধান। ইয়াহইয়া ইবন আকছামকে (রহ) একবার খালীফা হারূনুর রাশীদ বলেন: যে ব্যক্তি এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অমুক এবং তাঁর থেকে অমুক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।] তিনি আমার থেকে উত্তম। ইয়াহইয়া বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! তা কেমন করে হয়। আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচার ছেলের বংশধর এবং মু'মিনদের নেতা। বললেন: হাঁ, সেই ব্যক্তি আমার থেকে উত্তম। কারণ, তাঁর নামটি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামের সাথে সংযুক্ত; যে নামের কোন সমাপ্তি নেই। আমরা সবাই মরে ধ্বংস হয়ে যাব; কিন্তু 'আলিমগণ বেঁচে থাকবেন যতদিন কালচক্র বিদ্যমান থাকবে।[৮৮]

আল-ইমাম 'আলী (রা) কুমায়্যিল ইবন যিয়াদকে অতি মূল্যবান কথাই বলেছেন:

العلم خير من المال : العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

জ্ঞান সম্পদ থেকে উত্তম। জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়, আর তুমি সম্পদ পাহারা দাও। জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়, আর সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পায়। জ্ঞান হলো শাসক, আর সম্পদ হলো শাসিত।

তিনি আরো বলেছেন :

العلم يكسب العالم الطمأنينة فى حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون مابقى الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة.

জ্ঞান জ্ঞানী ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রশান্তি এবং মৃত্যুর পর সুনাম-সুখ্যাতি বয়ে আনে। সম্পদের বিলুপ্তির সাথে সম্পদের কাজও শেষ হয়ে যায়। সম্পদের সঞ্চয়কারীগণের তাদের জীবিত অবস্থায়ই মৃত্যু ঘটে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কালচক্র যতদিন বিদ্যমান থাকবে, বেঁচে থাকবেন।

---

৮৮. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্, খ.১, পৃ. ১৬৫

তাদের সম্পদ হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কথা মানুষের অন্তরে বিদ্যমান আছে।[৮৯]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান

ইসলাম যে 'ইলম তথা জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ যা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো, এমন প্রতিটি জ্ঞান যা দলিল-প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণে মুসলিম 'আলিমগণ তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণকে 'ইলম তথা জ্ঞান বলে গণ্য করেননি। এজন্য যে, তা হলো কোন রকম দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অন্যের কথায় আনুগত্য ও অনুসরণ। আর তাই ইসলামে যা 'ইলম (জ্ঞান) তা অনেকগুলো ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের 'ইলম তথা knowledge সেই অর্থ বা ভাব সন্নিবেশ করে না। সুতরাং ইসলামী 'ইলমে অতীন্দ্রিয় জগত, যার জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে লাভ করা যায় তাও শামিল করে। এই ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব রহস্য এবং আদিকাল থেকে মানুষ যে মৌলিক তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তার জবাবও লাভ করেছে। সেই তিনটি প্রশ্ন হলো:

১. আমার আগমন কোথা থেকে?

২. আমার চলার শেষ কোথায়?

৩. আমি কেন এলাম?

এ প্রশ্নত্রয়ের জবাবের মাধ্যমে মানুষ তার সূচনা, প্রত্যাবর্তনস্থল ও তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যেমন জেনেছে, তেমনি জেনেছে নিজেকে, তার রব বা প্রভুকে এবং সে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই 'ইলমকেই প্রকৃত 'ইলম বলা অধিকতর সঙ্গত। ইমাম ইবন 'আবদিল বার এই 'ইলমকেই "আল-'ইলম আল-'আলা" (সর্বোচ্চ 'ইলম) নামে অভিহিত করেছেন।

এই 'ইলমের অধিভুক্ত হলো মানুষ এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অধ্যয়ন। যেমন: মানবজীবনের বিভিন্ন দিক, স্থান, কাল, ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে তার সম্পর্ক যা মানব ও সমাজ বিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঠিত বিষয়। বস্তু ও জড় পদার্থ যা মহাশূন্যে ও এ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাও এই 'ইলমের একটি ক্ষেত্র। আর তা সন্নিবেশ করে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি, যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। এই ক্ষেত্রটি নিয়েই আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ মেতে আছে। তারা যখন 'ইলম নিয়ে কথা বলে তখন

---

৮৯. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২৩

এসব বিষয় ছাড়া আর কোন কিছু নিয়ে কথা বলে না। কারণ এ সকল বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস অনুমানের আওতাভুক্ত। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় এবং ল্যাবরেটরী ও পরীক্ষাগারেও তা ঢুকানো যায়।

বস্তুবাদ যাকে তার বিষয়-বস্তু গণ্য করে ইসলাম এ জাতীয় জ্ঞানকে কোন বাধা মনে করে না। ঈমানের পরিপন্থী অথবা বিরোধী বলে গণ্য করে না। যেমন গণ্য করেছিল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য ধর্ম।

একথা স্পষ্টভাবে ও জোরের সাথে বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাসমূহ এমন মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে এ জাতীয় 'ইলম অঙ্কুরিত হয়। তারপর তার শিকড় শক্তভাবে গেড়ে দেয়, শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয় এবং মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তা ফল দিতে থাকে। সেই শিক্ষাসমূহের কিছু নিম্নরূপ ঃ

জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করা

মানুষের মধ্যে সাধারণ অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তির মানুষও আছে, তাদেরকে যা কিছু বলা হয় সাধারণত: তাই তারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে যা কিছু অবহিত করা হয় তা গ্রহণ করে। বিশেষ করে তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন: মাতা-পিতা বা এ ধরণের অন্য কারো নিকট থেকে যদি সেই সব কথা শোনে তাহলে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নেয়। তদ্রূপ অধিকাংশ মানুষকে যে মত-পথের উপর দেখতে পায়, তা ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তা মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে তাদের শ্লোগান হলো: "আমাদের পূর্ব পুরুষদের যার উপর পেয়েছি, আমরা তার উপর আছি" অথবা তারা বলে: "আমরা মানুষের সংগে আছি- তারা ভালো বা মন্দ যাই করুক না কেন"। এরই বিপরীত হলো বাস্তবধর্মী জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা, প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু মানেনা। যেখানে দৃঢ় প্রত্যয় ও অকাট্য জ্ঞান দাবি করা হয় সেখানে আবেগ অনুভূতি এবং ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা। জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি যার উপর প্রতিষ্ঠিত তার মৌলিক রূপরেখা কুরআন ও সুন্নাহ্ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। আমরা তার থেকে কয়েকটি পয়েন্ট সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

১. দলিল ছাড়া কোন দাবি গ্রহণ করা যাবে না, তা সে দাবীদার যেই হোক না কেন। সেই দলীল হলো, বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়ে যৌক্তিক প্রমাণ। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

...قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ

...বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।[৯০]

---

৯০. সূরা আন-নামল-৬৪

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা। যেমন

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ...

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে, তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে...?[৯১]

আর বর্ণনা ভিত্তিক বিষয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা। যেমন:

...اِئْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

...পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৯২]

২. দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চিত জ্ঞান যেখানে দাবী করা হয় সেখানে অনুমান ও ধারণা প্রত্যাখ্যান করা। এ কারণে আল-কুরআন মুশরিকদের ইলাহ সম্পর্কের ধারণা ও অনুমান সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন:[৯৩]

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।

মাসীহ (আ) কে শুলে চড়ানোর ব্যাপারে ইয়াহূদ ও নাসারাদের ধারণাসমূহকে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে এভাবে:

...مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا.

...এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।[৯৪]

---

৯১. সূরা আয-যুখরুফ-১৯
৯২. সূরা আল-আহকাফ-৪
৯৩. সূরা আন-নাজম-২৮
৯৪. সূরা আন-নিসা'-১৫৭

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث.

তোমরা অনুমান থেকে সাবধান হও। কারণ, অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

৩. যেখানে নিরপেক্ষতা, বাস্তবধর্মিতা প্রয়োজন এবং যেখানে বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের নিয়ম-নীতির সাথে কাজ-কর্ম করতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ ও কামনা-বাসনা প্রত্যাখ্যান করা- তার পরিণতি ও ফলাফল যাই হোক না কেন। কুরআন মুশরিকদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে:[৯৫]

...إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ...

...তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে...।

দাউদ 'আলাইহিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন:[৯৬]

...فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ...

অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।

এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের রাসূলে কারীমকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লক্ষ্য করে বলছেন:[৯৭]

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ

অত:পর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে?

---

৯৫. সূরা আন-নাজ্‌ম-২৩
৯৬. সূরা সাদ-২৬
৯৭. সূরা আল-কাসাস-৫০

৪. জড়ত্ব, অন্ধভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ এবং চিন্তা ক্ষেত্রে অন্যের লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। তা তারা হোক পিতা, পিতামহ বা পূর্ব পুরুষের কেউ, অথবা হোক ক্ষমতাধর নেতৃস্থানীয় কেউ, অথবা হোক আম জনতা ও সাধারণ মানুষ। যারা একথা বলতো:

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.

"বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করবো।"

আল-কুরআন অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল-কুরআন বলছে:[৯৮]

...أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُوْنَ.

...এমন কি, তাদের পূর্ব পুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিলনা, তা সত্ত্বেও?

অতীতের যে সকল জাতি-গোষ্ঠী তাদের নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, কিয়ামাতের দিন তাদের পরিণতির চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে কঠোরভাবে ধিক্কার দিয়েছে। সেদিন তাদের এমন নিকৃষ্ট পরিণতির জন্য তারা যে একে অপরকে দোষারোপ করবে সে কথাও কুরআন বলে দিয়েছে। কুরআন বলছে:

...قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلٰكِن لاَّ تَعْلَمُوْنَ

...আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে, কিন্তু তোমরা জাননা।[৯৯]

সাধারণ মানুষ যদি কোন ভুলের উপর থাকে, যেহেতু অসংখ্য মানুষ তার উপর আছে, এই যুক্তিতে তা মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তেমনিভাবে যে মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বাধীন ও নেতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তার অন্যের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণের মনোবৃত্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন তিনি বলেন:[১০০]

---

৯৮. সূরা আল-বাকারাহ-১৭০
৯৯. সূরা আল-আ'রাফ-৩৮
১০০. তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাতি, হাদীছ-২০০৮

لايكن أحدُكم إمَّعةً، يقول : أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا ألا تظلموا.

তোমাদের কেউ সুবিধাবাদী হবেনা। যেমন, সে বলবে: আমি মানুষের সাথে আছি, তারা যদি ভালো করে, আমিও ভালো করবো, তারা খারাপ করলে, আমিও খারাপ করবো। বরং তোমরা নিজেদেরকে এ অবস্থানে সুদৃঢ় করবে যে, মানুষ ভালো করলে তোমরাও ভালো করবে, মানুষ খারাপ করলেও তোমরা যুলম করবে না।

এই নৈতিক ভূমিকা যা ব্যক্তির আচরণে দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে তা তার চিন্তার ক্ষেত্রেও একটা আদর্শের কথা ঘোষণা করে।

৫. গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ:

আর তা হবে আসমান ও যমীনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে। যেমন আল্লাহ বলেন:[১০১]

أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...

তারা কি লক্ষ্য করেনা, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে...?

তেমনিভাবে তা হবে মানুষের নিজের সম্পর্কে। আল্লাহ বলেন:[১০২]

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِينَ. وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ.

নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাস, তার উত্থান-পতন এবং মানব সমাজে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিয়ম-রীতি সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:[১০৩]

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

---

১০১. সূরা আল-আ'রাফ-১৮৫
১০২. সূরা আয-যারিয়াত-২০-২১
১০৩. সূরা আলে 'ইমরান-১৩৭

তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

৬. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

যে সকল ব্যবস্থা চিন্তার বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সমাজের মাটিকে প্রস্তুত করে তার একটি হলো, শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সময়ে সমগ্র আরবে বিস্তৃত নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই নিরক্ষরতার কারণে তৎকালীন আরববাসীকে 'উম্মী' বলা হতো। আল-কুরআনেও তাদেরকে উম্মী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ...

তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে...।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও তার এক বক্তব্যে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে:[১০৫]

نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب.

আমরা একটি নিরক্ষর জাতি, আমরা লিখিনা, গণনা করি না।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই উম্মী নবী তাঁর উম্মী জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম 'কলম'-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ঘোষণা করেন, লেখার বিস্তার ঘটান এবং তাঁর অনুসারীদের নিরক্ষরতা দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তাঁর নিকট সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলি নাযিল হয় তাতে পড়া, কলম ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে:[১০৬]

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক (জমাট রক্ত) হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক

১০৪. সূরা আল-জুমু'আহ-২
১০৫. বুখারী, কিতাবুস সাওম
১০৬. সূরা আল-'আলাক-১-৫

মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

আল-কালাম (القلم) নামে আল-কুরআনের একটি পূর্ণ সূরাই নাযিল হয়েছে, যার সূচনাকে আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষুদ্র জিনিসটির কসম করে বলছেন:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ.

নূন-শপথ কলমের এবং তারা যা লেখে তার।[১০৭]

এই কসম দ্বারা বুঝা যায় কলম বস্তুটি অবয়বে ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি ও প্রভাব বিশাল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু মুসলিমকে যখনই লেখা শেখানোর কোন সুযোগ পেয়েছেন, তা মোটেই হাতছাড়া করেননি। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো বদরের যুদ্ধবন্দী। এ যুদ্ধে কিছু কুরাইশ বন্দী লিখতে জানতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মুক্তিপণ ঘোষণা করেন যে, তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে লেখা শেখাবে।

ইবন সা'দ 'আমির আশ-শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:[১০৮]

أسرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سبعين أسيراً، وكان يفادى بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لايكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع، إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم، فإذا (حذقوا) فهو فداوه

বদরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিপক্ষের সত্তর (৭০) জন যোদ্ধাকে বন্দী করেন। তাদের সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা মুক্তিলাভ করে। মক্কাবাসীরা লিখতো কিন্তু মাদীনাবাসীরা লিখতো না। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ ছিল না, তাদের প্রত্যেকের নিকট মাদীনার দশজন করে তরুণকে সোপর্দ করা হলো। তারা তাদেরকে লেখা শেখালো। যখন তারা লেখায় দক্ষ হয়ে গেল, তখন তাই হলো তাদের মুক্তিপণ।

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যতম কাতিবে

---

১০৭. সূরা আল-কালাম-১-২

১০৮. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত (বৈরূত), খ.১, পৃ.২২

ওহী যায়দ ইবন ছাবিতকে (রা) লেখা শেখান এই কুরাইশ যুদ্ধবন্দীরা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই লেখা শেখানোর পরিকল্পনা নামমাত্র ছিল না, বরং দক্ষতার এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছিল যে তা ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে নিরক্ষর হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ধর্মের ভিন্নতা রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের নিকট থেকে তাদের একটি ভালো জিনিস গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই লেখা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহ দান কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, নারীদের ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত ছিল। তারই নির্দেশে শিফা বিনত আবদিল্লাহ উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনত 'উমারকে (রা) লেখা শেখান।[১০৯]

পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিসংখ্যান বিদ্যা নিজে প্রয়োগ করে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) তা শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বেই এ পদ্ধতির সুবিধা কাজে লাগান। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন:

> كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احصوا لى كم يلفظ الإسلام.
>
> আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংগে ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা আমাকে গণনা করে বল, কত মানুষ ইসলামের স্বীকৃতি দেয়।

সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১১০]

> اكتبوالى من يلفظ بالإسلم من الناس. قال حذيفة: فكتبنا له ألفا و خمسما ئة رجل. (متفق عليه)

---

১০৯. মুসনাদু আহমাদ, খ.১, পৃ.৩৭২; আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব; নায়লুল আওতার, খ.৯, পৃ.১০৩
১১০. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৪৭

জনগণের কতজন ইসলামের স্বীকৃতি দেয় তা আমাকে লিখে দাও। হুযাইফা (রা) বলেনঃ আমরা তাঁকে লিখে দেই, একহাজার পাঁচশো জন পুরুষ।

এটা ছিল লিখিত পরিসংখ্যান। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, এই জনবল নিয়ে শত্রুপক্ষের কতজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবেন। এ কারণে কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সেই সূচনা পর্বে যে পরিসংখ্যানবিদ্যা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশে প্রয়োগ করা হয় তা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলাম সকল প্রকার জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগানো কে স্বাগত জানায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা

আদম শুমারী, পরিসংখ্যান যেমন জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি তেমনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণও অধিকতর স্পষ্ট জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি। এই পরিকল্পনা নির্ভর করে হিসাব ও পরিসংখ্যানের উপর। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ধরে নিয়ে বর্তমানে সেই উপযোগী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করে কাজ করাই হলো পরিকল্পনা। অনেকে বিশ্বাস করেন এ ধরনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজ। প্রাচীন কালে যারা জ্ঞানকে ঈমানের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে বলেছে, এ দু'টি হলো পরস্পর বিরোধী বিষয়। এ দু'টির সম্মিলিন সম্ভব নয়। উপারোক্ত বিশ্বাস মূলতঃ এই চিন্তারই ফসল।

ধর্মীয় চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের উপর ভিত্তিশীল। একজন ধার্মিক মানুষ আজই আগামী কালের, অন্যকথায় জীবনকালে মৃত্যুর জন্য, ইহকালে পরকালের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এই পার্থিব জীবনে অবশ্যই তাকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আর সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে যে অতীতের ঘটনাবলী ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা মূলতঃ বুদ্ধিমান মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। সেই সকল কাহিনীর একটি হলো নবী ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার কাহিনী। এই কাহিনীতে আল-কুরআন পনেরো বছরের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। ইউসুফ (আ) স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আগামী কয়েক বছর দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন কম হবে, ফলে

দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তাই বর্তমানেই তা মুকাবিলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো মিশর ও তার আশে-পাশের এলাকা সেই দুর্ভিক্ষ থেকে বেঁচে যায়। আল-কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনীর কিছু এ রকম:[১১১]

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ .ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ .ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

ইউসুফ বললো, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অত:পর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমান তোমরা খাবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্যসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অত:পর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

কিছু লোক মনে করেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভাবনা অথবা তাঁর তাকদীর ও ফায়সালার উপর ঈমানের পরিপন্থী কাজ। এ কারণে তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তাকে ধর্মীয় দিক থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে। তবে সত্য এই যে, যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসুলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তারা জানেন যে, পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এলোমেলো ভাবে কোন কিছু করা ইসলাম প্রত্যাখান করে। যেখানে কোন নিয়ম-নীতি, সুব্যবস্থাপনা নেই তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

সত্যি কথা এই যে, যারা গভীরভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধ্যয়ন করে তাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, যে কোন রকমের তাড়াহুড়ো করা, বিক্ষিপ্ত ও এলামেলো ভাবে কিছু করা এবং কোন রকম নিয়ম-রীতি ছাড়া কোন কিছু করা, কুরআন-সুন্নাহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ (আল্লাহর উপর নির্ভর করা) দ্বারা একথা বোঝান নি যে, সব রকম উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা ত্যাগ করতে

---

১১১. সূরা ইউসুফ : ৪৭-৪৯

হবে এবং বিশ্বচরাচরের যে নিয়ম-রীতি আছে তা অস্বীকার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এক বেদুঈন এসে তার বাহন উটটি মাসজিদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার উটটি বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করবো, না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াককুল করবো? রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন; উটটিকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

ইমাম আল-কুরতুবী (রহ) সেই সব লোকের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা বলে পার্থিব জীবনে উপায় উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ। তিনি বলেন, প্রকৃত কথা হলো, যে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখে, আর এ বিশ্বাস করে যে, তার জীবনের সবকিছু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে, তাহলে পার্থিব জীবনে উপায়-উপকরণ প্রয়োগে তার এ বিশ্বাসে কোন ক্ষতি করবেনা। কারণ, তখন তার এ কাজ হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়ম-রীতির অনুসরণ। আমরা কি লক্ষ্য করিনা যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শত্রুর মুকাবিলায় শরীরে বর্ম পরেছেন, শত্রু বাহিনীকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য দু'পাহাড়ের মাঝখানের পথে তীরন্দায বাহিনী মোতায়েন করেছেন, মাদীনায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য খন্দক খুঁড়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হাবশায়, অত:পর মাদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিয়েছেন, নিজে হিজরাত করেছেন, পানাহারের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, নিয়ম-রীতি অবলম্বন করেছেন, পরিবারের জন্য খাদ্য-খাবার ঘরে মজুদ রেখেছেন। মোটকথা, পার্থিব জীবনের কোন ব্যাপারে আসমান থেকে আসবে এ ভরসায় বসে থাকেননি। অথচ আসমানী সাহায্য লাভের সর্বাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি তিনিই ছিলেন।[১১২]

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনী যে কেউ পাঠ করলে দেখতে পাবে, তিনি যে কোন ব্যাপারে সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সব ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন, সাথে সাথে বিপরীত মুখী সকল সম্ভাবনা মনে রেখে সতর্কতা গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কার কুরাইশদের যুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা বা চিন্তা কাজ করেনি একথা বলা যাবে না। বরং এর পশ্চাতে কাজ করে তৎকালীন হাবশার ভৌগলিক অবস্থান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। তিনি আরব উপ-দ্বীপের কোন দূরবর্তী অঞ্চলে

---

১১২. নায়লুল আওতার, খ.৯, পৃ.৯২

তাদেরকে যে যেতে বলেননি, তার পেছনে কোন কৌশল ও পরিকল্পনা কাজ করেনি তাও বলা যাবে না। কারণ, কুরাইশদের যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল তাতে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে রোম ও পারস্যের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলেও তাদেরকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হিকমত ও কৌশল হতে পারতো না। কারণ, তাদের পরিবেশ এই নতুন দীনের দাওয়াত মেনে নিত না। তিনি তাদেরকে চীন বা ভারতবর্ষের মত দূরবর্তী দেশেও যেতে বলেননি। কারণ, তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারতো।

প্রকৃত কারণ হলো, হাবশাই ছিল ভৌগলিক দিক দিয়ে হিজরাতের উপযুক্ত স্থান। দেশটি বহু দূরেও ছিল না, আবার অতি নিকটেও ছিল না। দেশটি ও কুরাইশদের মাঝখানে ছিল বিশাল সাগর। ধর্মীয় দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। কারণ, দেশটির অধিবাসীরা ছিল খ্রীস্টান। তুলণামূলকভাবে তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। দেশটির তৎকালীন শাসক ছিলেন একজন খ্যাতিমান ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

إن بها ملكا أرجو ألا تظلموا عنده.

> সেখানে একজন বাদশাহ আছে, আমি আশা করি তোমরা তার নিকট অত্যাচারিত হবে না।[১১৩]

আমাদের এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের চারপাশের বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞ ছিলেন না। তেমনিভাবে তাঁরা তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি, পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না। তাদের সেই দ্বন্দ্বে আরবের মুসলিম ও মুশরিকরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে সূরা আর্ রূম-এর সূচনাতে নাযিল হয়েছে এভাবে:[১১৪]

غُلِبَتِ الرُّوْمُ. فِيْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ.

> রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।

---

১১৩. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৫০
১১৪. সূরা আর-রূম : ২-৩

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাতের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি সে ক্ষেত্রে জ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও ঈমানী তাওয়াক্কুলের সমন্বয় সাধন করেছেন। দু'টিকেই পাশাপাশি রেখেছেন। এই ঐতিহাসিক সফরের জন্য একজন মানুষের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, প্রয়োজনীয় বস্তুগত সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তারপর 'মাহজার' অর্থাৎ যেখানে হিজরাত করবেন, সে স্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কিছু মানুষ 'আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাই'আতে অংশগ্রহণ করার পর। সেই দু'টি বাই'আতে তাদের নিকট থেকে নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তার অঙ্গীকারও গ্রহণ করেন। তারপর নিজের সহচরদের মধ্য থেকে সর্বাধিক আস্থাভাজন আবু বাকরকে (রা) সফরসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। তেমনিভাবে বেছে নেন নিজের প্রতি উৎসর্গ প্রাণ ও একান্ত বিশ্বাসভাজন 'আলীকে (রা) নিজের বিছানায় রাত্রিযাপন করে শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। তিনি মক্কা-মাদীনার তৎকালীন পথ বিশেষজ্ঞেরও সহায়তা নেন। তিনি হলেন একজন পৌত্তলিক 'আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কর্মের দ্বারা ফকীহ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আস্থাভাজন ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হলে যে কোন বিষয়ে অমুসলিম বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করা সঙ্গত হবে।

তারপর তাঁরা পরিকল্পনা করেন কোথা থেকে কখন কিভাবে যাত্রা শুরু করবেন, কোন পথে যাবেন, শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কোথায় কোন গোপন আশ্রয়ে থাকবেন, সেখানে কারা কিভাবে খাদ্য-খাবার পৌঁছাবেন। এই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদীনার বহুল ব্যবহৃত পথ ছেড়ে অখ্যাত-অজ্ঞাত পথে যাত্রা করে 'ছাওর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন। তেমনিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আসমা', 'আবদুল্লাহ ইবন আবীবাকর ও আবু বাকরের দাস 'আমির ইবন ফুহায়রা (রা) তাঁদেরকে ছাগল চরানোর উসিলায় দুধ পান করানোর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হিজরাতের পরিকল্পনায় কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর রাখেননি। যাঁকে যেখানে এবং যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

এত কিছু সত্ত্বেও পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। পৌত্তলিকরা 'ছাওর' পর্বতের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের কেউ নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকালেই গুহার মধ্যে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সঙ্গী আবু বাকরকে (রা) দেখতে পেত। আবু বাকর (রা) ভীত-সংকিত হয়ে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!

لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا.

তাদের একজনও যদি তার পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন:

...لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا...

...তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন...।[১১৫]

এখানেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওয়াক্কুলের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আর তা হলো একজন মানুষ তার শক্তি ও সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে তা ব্যয় করবে, যত রকম উপায়-উকরণ ও মাধ্যম আছে তা ব্যবহার করবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হবে এবং যা তার সাধ্যের বাইরে তা ত্যাগ করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। কেবল তখনই إِنَّ اللهَ مَعَنَا (নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন) বাণীটি ফলপ্রসূ হবে।

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা

জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দাবি করে, আল-কুরআনও আমাদেরকে সে কথা শেখায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

...فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْرًا.

...তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস কর।[১১৬]

...وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ.

...মহাবিজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।[১১৭]

...فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

...তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।[১১৮]

---

১১৫. সূরা আত-তাওবা-৪০
১১৬. সূরা আল-ফুরকান-৫৯
১১৭. সূরা ফাতির-১৪
১১৮. সূরা আন-নাহল-৪৩

সুতরাং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া উচিত। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থনীতিবিদ, শিল্প বিষয়ে প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে। বদরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমগণ কুরাইশদের মুখোমুখি হন। কুরাইশরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে শিবির স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের পানির কূপ থেকে দূরবর্তী মাদীনার দিকের প্রান্তে অবস্থান নেন। তাতে কুরাইশরা কূপের পানির ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। এ পর্যায়ে সাহাবী আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির আল-আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন:

يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل : أمنزل أنز لكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخّر عنه، أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ: এই স্থানে কি আল্লাহ আপনাকে অবতরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অতিক্রম করার এবং যেখান থেকে পেছনে থাকার অধিকার আমাদের নেই? নাকি এটা আপনার নিজের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া?

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

بَلْ هو الرأى والحرب والمكيدة.

না, এ আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং আমার নিজের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া।

হাব্বাব ইবন আল-মুনযির (রা) বললেন:[১১৯]

يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراء من القلب، ثم نبنى عليه حوضا، فنملأه ماء، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى.

---

১১৯. সীরাতু ইবন হিশাম, খ.২, পৃ.২৭২; আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহারা, খ.১, পৃ.৪২৭

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শিবির স্থাপনের উপযুক্ত কোন স্থান নয়। আপনি লোকদের নিয়ে সম্প্রদায়ের পানির কাছাকাছি চলুন, আমরা সেখানে অবতরণ করবো। তারপর কূপের পেছনে শিবির স্থাপন করবো। সেখানে একটি হাউজ বানিয়ে পানি দিয়ে ভরে ফেলবো। আমরা সেই পানি পান করবো, আর তারা পান করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি একটা চমৎকার কথা বলেছো!

বুদ্ধিদীপ্ত হাব্বাব (রা) প্রথমে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট জানতে চান, তিনি যেখানে অবস্থান নিয়েছেন তা কি আল্লাহর নির্দেশ? যদি তাই হয় তাহলে তো তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। আর যদি সেই স্থানটি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে একজন সেনাপতি ও সামরিক কৌশলবিদ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে হাব্বাব (রা) নিজের একটি ভিন্ন মত উপস্থাপন করবেন। কারণ, তিনি উক্ত অঞ্চলের একজন বাসিন্দা হিসেবে সেখানকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মতটি শোনেন এবং সানন্দে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তা গ্রহণ ও সেই মুতাবিক কাজ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাব্বাবের (রা) মতটিকে স্বাগত জানান যে ভাষায় তা একটু লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বলেন: لقد أشرت بالرأى "তুমি একটি কথার মত কথা বলেছো, অথবা তুমি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছো।"

বদর যুদ্ধে সা'দ ইবন মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য একটি মঞ্চ (عريش) তৈরির পরামর্শ দেন, সেখান থেকে তিনি সৈনিকদের সার্বিক কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে দিক নির্দেশনা দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শের জন্য সা'দকে ধন্যবাদ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন।

আহযাব যুদ্ধের সময় সাহাবী সালমান আল-ফারেসী (রা) রাসূলুল্লাহ্কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খন্দক খননের পরামর্শ দেন। তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেন। মক্কার পৌত্তলিক যোদ্ধারা ঘোড়া দাবড়িয়ে খন্দকের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে:[১২০]

والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এ এমন এক কৌশল যা আরবরা কখনো অবলম্বন করেনি।

---

১২০. সীরাতু ইবন হিশাম, খ.১, পৃ.২৩৫

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিমরা পারস্য, রোম অথবা অন্য যে কোন জাতির যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে পরাভূত করবে। শুধু যুদ্ধ নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিজাতীয় যে কোন উপায়-উপকরণ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বন করবে। মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিধি-বিধান নেই। বিধি-বিধান আছে তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

উপকারী ও কল্যাণকর সকল প্রকার বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি উৎসাহদান

ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর, এমন সকল বিদ্যা শিক্ষার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। সে বিদ্যা মুসলিম-অমুসলিম যাদের কাছেই থাকুক না কেন, অর্জনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বিখ্যাত বাণী উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:[১২১]

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها.

বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো বস্তু। যেখানেই সে তা কুড়িয়ে পাবে, সেই হবে অধিকতর হকদার।

একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। জ্ঞানকে তিনি মু'মিনের হারানো বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। হারানো বস্তুটি যেখানেই খুঁজে পাওয়া যাক না কেন, প্রকৃত মালিক তার অধিকতর হকদার হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মু'মিন ব্যক্তি মুসলিম-অমুসলিম যেখানেই জ্ঞানের সন্ধান পাক সেখান থেকে তা আহরণ করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক এর চেয়ে উত্তম বাণী আর হতে পারে না।

কল্যাণকর জ্ঞান যেখানেই পাওয়া যাক তা অর্জন করতে হবে, একথা তিনি কেবল মুখে বলেই শেষ করেননি, বরং বাস্তবে তা করে উম্মাতকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে কুরাইশ বন্দীদের যারা লেখাপড়া জানতো তাদের মুক্তিপণ ধার্য করেন, প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম শিশু-কিশোরকে লেখা শেখাবে। এভাবে তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলিম শিশু-কিশোরকে শিক্ষিত করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে 'আলীর (রা) একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:[১২২]

---

১২১. তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৮৮; ইবন মাজাহ্, বাবুয যুহ্দ, হাদীছ-৪১৬৯

১২২. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, খ.১, পৃ. ১২১

العلم ضالة المؤمن، فخذوه ولو من أيدى المشركين.

জ্ঞান হলো মু'মিনের হারানো বস্তু। সুতরাং মুশরিকদের নিকট থেকেই হোক না কেন, তোমরা তা গ্রহণ কর।

নিরেট বস্তুগত জ্ঞানও অমুসলিমদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই, যদি তা যাদের বা যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের বা তার চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটায়। কারণ, বিশ্বচরাচরের সকল প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির বাধ্যতা মু'মিন-কাফির এবং সত্যনিষ্ঠ ও পাপী সকলে সমানভাবে মেনে নেয়। এ কারণে অতীতে মুসলিমগণ জাগতিক সকল জ্ঞান, যেমন চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রীক, পারসিক, রোমান, ভারতীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী জাতিসমূহের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে দীন, মূল্যবোধ ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান যা আল্লাহ, প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক, সে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয়নি। কারণ, তাতে মানুষের জন্য কোন কল্যাণ নেই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) হাতে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের কপি দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কারণ, তাওরাত মানুষের হাতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, আল্লাহর কালামের সাথে মানুষের কথা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তা আর সন্দেহ সংশয়ের উর্দ্ধে ছিল না। আর দীনের উৎস তো কেবল সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত আসমানী কিতাব। আর তা কেবল আল-কুরআন।

ইমাম আহমাদ জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:[১২৩]

أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله عليه أتى النبى صلى الله عليه وسلم، بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فرأه النبى صلى الله عليه وسلم فغضب فقال : أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لاتسألوهم عن شئ فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذى نفسى بيده لوكان موسى حيًّا ما وسعه إلاَّ أن يتبعنى.

---

১২৩. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল বান্না, তারতীবুল মুসনাদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-৬২

> আহলি কিতাবের এক ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া একখানা কিতাব হাতে নিয়ে 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে রেগে যান এবং বলেন: খাত্তাবের ছেলে! তোমরা কি তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত? (যে জন্য তোমাদের নবী ও কিতাবের বাইরে অন্যদের নবী ও কিতাব থেকে জ্ঞান নিতে চাও।) যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, আমি তা তোমাদেরকে নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্নভাবে দান করেছি। তোমরা তাদের নিকট কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। (জিজ্ঞেস করলে) তারা হয়তো তোমাদেরকে সত্য তথ্য দেবে, আর তোমরা তা মিথ্যা বলে অস্বীকার করবে, অথবা মিথ্যা তথ্য দেবে, আর তোমরা তা সত্য বলে মেনে নেবে। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! এখন যদি মূসাও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত তাঁরও কোন উপায় থাকতো না।

'উমারের (রা) হাতে তাওরাত দেখে রাগে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। অত্যন্ত শক্তভাবে তিনি তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তা ছিল একটি দীনের বিষয়। আর দীনের কোন কিছু একমাত্র সত্য-সঠিক উৎস ছাড়া অন্য কোথাও থেকে গ্রহণ করা যায় না। তবে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যা মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল তা মানবজাতির যৌথ সম্পদ। তা যে কোন স্থান, যে কোন পাত্র থেকে গ্রহণ করা যাবে। হোক না জ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের, হোক না তা মুসলিমের বা মুশরিকের। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন থেকে এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বদরের পৌত্তলিক বন্দীদের জ্ঞানের সাহায্য নেন, তিনি পারস্যের যুদ্ধ কৌশল কাজে লাগিয়ে মাদীনার চারপাশে খন্দক খনন করেন, তায়িফ অবরোধে 'মানজিনীক' (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ, যা দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা হতো) ব্যবহার করেন, মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দান করেন, যার নির্মাতা ছিলেন একজন রোমান কাঠমিস্ত্রী। খুলাফায়ে রাশিদীনকেও আমরা উম্মাতের কল্যাণে এমনসব উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখি যার সাথে আরববাসীর পূর্বে পরিচয় ছিলনা। তারা তা অনারবদের নিকট থেকে মানুষের কল্যাণ চিন্তায় গ্রহণ করেন। যেমন 'উমার (রা) তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীর প্রস্তাব ও পরামর্শক্রমে ইতিহাস লেখার চিন্তা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক গবেষক তো মত প্রকাশ করেছেন যে, লেখা ও দিওয়ানের সূচনা হয় খোদ রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়ে। যেমন হিজরাতের পরে

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেন লিখিতভাবে আদম শুমারী করার জন্য।[১২৪]

ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের মূলোৎপটন

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে স্বচ্ছ-সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। তৎকালীন জাহিলী সমাজে এবং অতীতের বহু বিকৃত ধর্মে যা শক্তভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছিল ধর্মের লেবাসধারী বহু মানুষ সেই সকল কুসংস্কারকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করেছে। আর সাধারণ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করেছে। যেমন গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর এবং জ্যোতির্বিদ্যার দাবীদার লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তারা বিশ্বাস করতো, তারা সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করতে, অদৃশ্যের প্রাচীর ভেঙ্গে তা অবগত হতে এবং মানুষের মনের কথা জানতে সক্ষম। এ ভাবে তারা মানব সমাজে প্রতারণাপূর্ণ বাজার বসিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকে।

ইসলামের অভ্যূদয় হলো এবং মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক বাজারের মূলে শক্তভাবে আঘাত করে বন্ধ ঘোষণা করলো। এর ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীদের প্রতারণার সকল জারিজুরি ফাঁস করে দিল, তাদের সকল পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। সাথে সাথে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করলো যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিয়ম কেউ ভঙ্গ করতে পারে না, অদৃশ্যের জ্ঞান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই এবং সকল কল্যাণ কেবল আল্লাহর নিয়ম-রীতিসমূহ শ্রদ্ধাভরে মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

ইমাম আল বুখারী (রহ) মুগীরা ইবন শু'বার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা (রা) বলেন: ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলো। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছেলে এবং মারিয়া আল-কিবতিয়্যার (রা) গর্ভজাত। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করলেন:

إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.

---

১২৪. আল-কাত্তানী, নিজামুল হুকূমাহ্, খ.১, পৃ.২২৭-২২৮

সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দুটি নিদর্শন। না কারো মৃত্যুর জন্য তাদের গ্রহণ হয়, আর না জীবনের জন্য।

জাহিলী যুগে মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু অথবা এজাতীয় কোন কিছুর কারণে সূর্য অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘোষণা তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে সমূলে উৎপাটিত করে এবং সাথে সাথে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয় যে, চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মত দু'টি সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-রীতি অনুযায়ী আবর্তিত হয়। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এরূপ ভাব ও অর্থের বহু হাদীছ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি হাদীছ বা এর অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো:

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

اجتنبوا السبع المو بقات، قالوا: وماهن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله و السحر... الحديث.

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কী কী? বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা, এবং যাদু...। –আল হাদীছ।

ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن علق شيئا وكل إليه.

যে ব্যক্তি একটি গিরা দিল, তারপর তাতে ফুঁক দিল, মূলত: সে যাদু করলো। আর যে যাদু করে, সে শিরক করে। যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝোলালো, মূলত: সে তার উপর নির্ভর করলো।[১২৫]

অর্থাৎ কেউ যদি নিজ দেহে তাবিজ-কবচ-মাদুলী বা এজাতীয় কোন কিছু এই বিশ্বাসে ঝোলায় যে, তা তাকে কুদৃষ্টি অথবা রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে, তাহলে তার উপরই সে নির্ভর করেছে বলে গণ্য হবে।

ليس منا من تطير أو تطيرله أو تكهن أو تُكهن له، أوسحر أو سحرله ومن أتى كاهنا فصد قه بما يقول، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

---

১২৫. নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, হাদীছ-৪০৭৯

যে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের জন্য পাখি উড়ায় অথবা যার জন্য উড়ানো হয়, অথবা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, অথবা যে যাদু করে অথবা যার জন্য যাদু করা হয়, তাদের কেউই আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কাহিন তথা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তাহলে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[১২৬]

من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

যে গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে তাহলে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[১২৭]

ومن أتى عَرّافافسأله عن شئ فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا.

যে গণকের নিকট যায়, তার নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।[১২৮]

এ ধরনের আরো বহু সহীহ্ হাদীছ, হাদীছের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'কাহিন' (الكاهن) হলো সেই ভবিষ্যদ্বক্তা যে কিছু গোপন বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলতো, যার কিছু সত্য হতো, আর কিছু হতো মিথ্যা। সে একথা দাবি করতো যে, তার অনুগত জিন আছে, তাকে সে গোপন কথা বলে যায়। العراف ও الكاهن এর মতই। অনেকে বলেছেন, العراف অর্থ যাদুকর। ইমাম আল-বাগবী (রহ) বলেন: العراف হলো সেই ব্যক্তি যে বিভিন্ন যুক্তি ও কার্যকারণের উপর ভিত্তি করে নানা বিষয় জানার দাবি করে। যেমন চুরি হওয়া জিনিস কোথায় আছে? কে চুরি করেছে? তেমনিভাবে হারানো বস্তুটি কোথায় আছে এবং কোথায় হারিয়েছে, তা সে বলতে পারে। এই العراف ও الكاهن -এর মত আরেক শ্রেণীর লোক আছে যাদেরকে المنجم বলে। যারা দাবি করে যে, নক্ষত্রের উদয়-অস্ত এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তার রহস্যাবলী এবং পৃথিবীতে তার

---

১২৬. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৫৯
১২৭. ইবন মাজাহ্, কিতাবুত তাহারাহ্, হাদীছ-৬৩৯; আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৯০৪; তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাহ্, হাদীছ-১৩৫
১২৮. মুসলিম, বাবুস সালাম, হাদীছ-২২৩০

প্রভাবসমূহ ইত্যাদির কথা তারা বলতে পারে। অনেকে المنجم -কে কাহিন (যাদুকর) বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে:[১২৯]

من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد.

যে ব্যক্তি তারকারাজি থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করলো, সে মূলত: যাদুর একটি শাখা অর্জন করলো। তারপর যা বৃদ্ধি করার তা করলো।

তবে জ্যোতির্বিদ্যা ও এই জ্ঞান ভিন্ন। শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা দোষের কিছু নয়। কারণ এ বিদ্যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস-অনুমান এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার। অতীতে মুসলিম মনীষীরা এ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে এ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে। যার ফলে মানুষ চাঁদে পৌঁছতে পেরেছে। এই বিদ্যার মধ্যে দীনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাবের পরিপন্থী কোন কিছু নেই।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞান অর্জনের প্রতি মানুষকে যেমন উৎসাহিত করেছেন, ঠিক তার পাশাপাশি-জ্ঞানের নামে কু-সংস্কার, প্রতারণা, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিরও মূলোৎপাটন করেছেন।

চিকিৎসা বিদ্যা

চিকিৎসা বিদ্যার মত পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিদ্যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। সঠিকভাবে এ জ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগের জন্য তিনি কয়েকটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। যেমন:

১. ব্যক্তির নিকট তার দেহের একটা মূল্য ও অধিকারের কথা তিনি বলেছেন:

إن لبد نك عليك حقا

নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার দেহের একটা অধিকার আছে।

ক্ষুধা লাগলে খাবার, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম দিতে হবে এবং ময়লা হলে পরিষ্কার করতে হবে- এসব যদি ব্যক্তির উপর তার দেহের অধিকার হয়, তাহলে তার এটাও অধিকার যে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করতে হবে। এই হক বা অধিকার অপরিহার্য, কোন প্রকার

---

১২৯. আবূ দাঊদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৯০৫; ইবন মাজাহ্, কিতাবুল আদাব, হাদীছ-৩৭২৬; মুসনাদু আহমাদ, খ.১, পৃ.৩১১

অবহেলার সুযোগ নেই। অন্য কারো অধিকার, যথা আল্লাহর অধিকারের কথা বলে দেহের অধিকার ভুলে যাওয়া চলবে না। এটাই ইসলামের পদ্ধতি এবং এটাই রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্‌। আর রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্‌ উপেক্ষা করার কোন সুযোগ কোন মুসলিমের নেই। তিনি বলেছেন:

فمن رغب عن سنتى فليس منى.

যে আমার সুন্নাহ্‌ বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।

এ কারণে ইসলাম বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে দর্শনের মূল কথা হলো, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য দেহকে কষ্ট দিতে হবে। কিন্তু ইসলামী বিশ্বাস মতে দেহ ও আত্মার (রূহ ও বদন) সম্মিলিত নামই হলো ইনসান বা মানুষ। সুতরাং দুটির গুরুত্বই সমান।

২. বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে, চিকিৎসকের নিকট যাওয়া, চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং ঔষধ সেবন করা- এসবই তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন বিশ্বাসকে সঠিক নয় বলে ঘোষণা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করা হলো যে, চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ ও প্রতিষেধক গ্রহণ করা হয় তা কি আল্লাহর তাকদীরে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে? জবাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন:[১৩০] هى من قدر الله "এটাই আল্লাহর তাকদীর"।

মূলত: তিনি এই সংক্ষিপ্ত জবাবের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করেন যে, কারণ এবং পরিণতি ও ফলাফল সবই আল্লাহর তাকদীর। তিনি যেমন নির্ধারণ করেন, অমুক অমুক কারণে রোগ হয়, তেমনি এটাও নির্ধারণ করেন যে, তার ঔষধ এটা এবং প্রতিষেধক এই এই জিনিস। একজন বুদ্ধিমান মু'মিন আল্লাহর এক তাকদীরকে আল্লাহর আরেক তাকদীর দ্বারা প্রতিহত করে, যেমন সে এক তাকদীর থেকে আরেক তাকদীরের দিকে পালায়।

৩. রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের সামনে আশার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে হতাশার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে দুরারোগ্য বলে কোন ব্যাধি আছে এমন বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক হাদীছ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো:

---

১৩০. ইবন মাজাহ্‌, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৪৩৭; তিরমিযী, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-২০৬৬

আল বুখারী (রহ) আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.

আল্লাহ যে রোগই পাঠান না কেন, তার চিকিৎসাও পাঠিয়েছেন।

لكل داءٍ دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله.

প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে। যখন রোগের ঔষধ পৌঁছে তখন আল্লাহর নির্দেশে ভালো হয়ে যায়।

মুসলিম ও আহমাদ (রহ) জাবির (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন।
একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো:

يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا إنزل له شفاء، علمه من علمه و جهله من جهله.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ঔষধ গ্রহণ করবো? বললেন: হাঁ, কারণ, আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার চিকিৎসা দেননি। যাকে তিনি শেখান সে তা জানে, আর যাকে অজ্ঞ রাখেন সে অজ্ঞ থাকে।

ইমাম আহমাদ উসামা ইবন শুরাইক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে ঔষধ বিদ্যমান আছে। চিকিৎসা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো হতাশ না হয়ে তা জানার জন্য গবেষণা অব্যাহত রাখা। হয়তো একদিন তারা তা জানতে পারবেন।

৪. সংক্রমণ ব্যাধির ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরন্তন রীতি আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন:

فرمن المجذوم فرارك من الأسد

সিংহ থেকে তোমার পালানোর মত কুষ্ঠরোগী থেকে তুমি পালাও।

তিনি কুষ্ঠরোগীর সাথে হাত মেলাতে নিষেধ করেছেন। এমন কি তিনি অন্য প্রাণী জগতেও সংক্রমণ ব্যাধির স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন:

لا يوردن ممرض على مصح.

সুস্থ উটের সাথে অসুস্থ উটকে পানি পান করাবে না।

অর্থাৎ পানি পান করানোর সময় সুস্থ উটের সাথে চর্মরোগগ্রস্ত উট এক সাথে মিশবে না। আর যে হাদীছে لاعدوى অর্থাৎ সংক্রমণ নেই বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো বস্তু

তার সত্তা ও প্রকৃতিগতভাবে সংক্রামক নয়, বরং তা হয় আল্লাহ রাব্বুল'আলামীনের তাকদীর এবং সৃষ্টি জগতে তাঁর নিয়ম-রীতি অনুযায়ী। যেমন তিনি মহামারী প্লেগ সম্পর্কে বলেন:

إذا سمعتم بأرض، فلا تد خلوا عليه، و أذا وقع و أنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارً امنه. –متفق عليه.

যখন তোমরা কোন অঞ্চলে প্লেগের কথা শুনবে, সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি কোন অঞ্চলে তোমাদের অবস্থানকালে প্লেগ দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হবে না। –মুত্তাফাক 'আলাইহি।

৫. গণক, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা ও তাদের মত যারা তাবিজ-কবচ ঝুলিয়ে জাহিলী যুগে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ জাতীয় কাজকে তিনি শিরক বলে ঘোষণা করেন। কেবল এমন কথা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দান করেন যার মধ্যে আল্লাহর যাতি ও সিফাতী নাম আছে। কারণ, তখন তা হবে শুধুমাত্র দু'আ। আর দু'আ বৈধ ও প্রশংসিত।

৬. নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের দ্বারা সঠিক চিকিৎসার দিকে পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন উত্তম আদর্শ। তাঁর কাজ ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ছিল না কোন মুখরোচক দাবি, অথবা কোনরূপ বাগাড়ম্বর।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে ঔষধ সেবন করেছেন এবং অন্যকে সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ রোগ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। তিনি উবাই ইবন কা'বের (রা) নিকট একজন চিকিৎসক পাঠান। তিনি তাঁর জন্য কিছু শিকড় ও মূলের ঔষধ নির্ধারণ করেন এবং তাকে শেঁক দেন।[১৩১]

আরেকজনকে তিনি তৎকালীন আরবের ছাকীফ গোত্রের খ্যাতিমান চিকিৎসক আল-হারিছ ইবন কালদার নিকট যাওয়ার নির্দেশ দেন। যাঁকে তিনি এ নির্দেশ দেন তিনি হলেন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)।[১৩২]

আল-হারিছ যে, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা প্রমাণিত নয়। এ কারণে এই হাদীছের ভিত্তিতে 'আলিমগণ চিকিৎসার ব্যাপারে অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ বৈধ বলেছেন।

---

১৩১. মুসলিম, বাবুস সাম, হাদীছ-২২০৭

১৩২. আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৮৭৫; আল-কাত্তানী, আত-তারাতীব আল-ইদারিয়া, খ.১, পৃ.৪৫৭

তবে একজন মুসলিম একজন মুসলিম চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করাবে সেটাই উত্তম।

একজন সাহাবী আহত হলে রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানূ আনমারের দু'ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান। তারা আহত সাহাবীকে দেখলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের দু'জনের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক কে? তারা বললো! ইয়া রাসূলাল্লাহ! চিকিৎসার মধ্যে কি কোন কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: যিনি রোগ দিয়েছেন তিনি ঔষধও দিয়েছেন।[১৩৩]

ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন: জ্ঞান ও শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া যে উচিত তা এই হাদীছ দ্বারা জানা যায়।[১৩৪]

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৩৫]

من تطبب ولم يعلم عنه الطب وهوضا من.

যে চিকিৎসক সাজে অথচ চিকিৎসা বিষয়ে তার থেকে কিছু জানা যায় না, সে-ই তার জন্য দায়ী।

এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যদি কেউ চিকিৎসক হওয়ার দাবি করে, অথচ সে তা নয়, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় ভুল করলে তার দায়-দায়িত্ব তারই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞদের সম্মান ও মর্যাদার কথাও এ হাদীছ থেকে জানা যায়।

তিব্ব তথা চিকিৎসা বিদ্যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিকার উপর এতটুকু আলোকপাত যথেষ্ট নয়। কারণ, তাঁর সে ভূমিকা ছিল পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ যুগের বহু শত বছর পূর্বে। আর তার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী বিশ্বে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থসমূহ কয়েকশত বছর পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে মৌলিক সূত্র হিসেবে পঠিত হতো। এক্ষেত্রে ইবন সীনার "আল-কানূন", আর-রাযীর "আল-হাবী" এবং ইবন রুশদের "আল-কুল্লিয়াত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ইলম বা জ্ঞানের নীতি-নৈতিকতা

ইসলামের দৃষ্টিতে অসংখ্য তথ্য দ্বারা কেবল মাথা ভরে রাখার নাম 'ইলম তথা জ্ঞান

১৩৩. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত
১৩৪. যাদুল মা'আদ, খ.৩, পৃ.২৫
১৩৫. আবূ দাউদ কিতাবুদ দিয়্যাত, হাদীছ-৪৫৮৬; নাসাঈ, হাদীছ-৪৮৩০; ইবন মাজাহ্‌, তিব্ব, ৩৪৬৬

নয়। যথাস্থানে সেই তথ্যাবলীর মূল্য ও গুরুত্ব যত বেশিই হোক না কেন। এমন কি নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, আর মূলত: তাই হলো শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শুধু তা অর্জন করলেই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই জ্ঞানের ধারক-বাহককে কিছু নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ করতে হবে। সে মূল্যবোধ তার অর্জিত জ্ঞানই তার উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আর এই নৈতিক মূল্যবোধই তাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) ওয়ারিছ ও খালীফার সুউচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। যে গুণ-বৈশিষ্ট্য সমূহ একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয় সে সম্পর্কে সংক্ষেপ কিছু কথা এখানে আলোচনা করা হলো।

১. দায়িত্বানুভূতি

সেই মূল্যবোধগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো: আল্লাহর সামনে দায়িত্বানুভূতি। 'আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। নুবুওয়াতের পদ ও মর্যাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কোন পদ ও মর্যাদা নেই। সেই নবীদের ওয়ারিছ যাঁরা তাঁদের সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আর কেউ হতে পারেন না। আর আমরা জানি পদ ও মর্যাদা যত বড়, দায়িত্ব ও কর্তব্যও তত বড়।

প্রখ্যাত সাহাবী মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৩৬]

لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه: ماذا عمل به؟

কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা কখনো সরবে না যতক্ষণ না তাকে চারটি স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ১. তার বয়স বা জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে সে তা ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে, কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে? ৩. তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে সে তা আয় করেছে এবং কিসে ব্যয় করেছে? ৪. তার জ্ঞান সম্পর্কে, তা দ্বারা সে কী করেছে?

---

১৩৬. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯১, হাদীছ-১১৮; মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.১০, পৃ.৩৪৬

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাবে তার দায়িত্বও বেড়ে যাবে। যে মাত্র একটি মাসয়ালা জানে সে কখনো যে দশটি বা একশো'টি জানে তার মত হবে না। যেমন: যার অর্থ-সম্পদ বেশি হবে তার হিসাবও বেশি হবে, তার জিজ্ঞাসাবাদও দীর্ঘ হবে এবং উত্তরদানও কঠিন হবে। তেমনিভাবে যার জ্ঞান বেশি হবে, জানার পরিধি যত বিস্তৃত হবে, তার দায়িত্বটাও বড় হবে, তার দায়ভারও বেশি ভারী হবে।

জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার অর্জিত জ্ঞানের পক্ষে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে কয়েকটি দিক থেকে। যেমন: জ্ঞান যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করে আরো উন্নতির দিকে নিতে হবে। জ্ঞান যাতে ফলদায়ক হয় সেজন্য সে অনুযায়ী 'আমল করতে হবে, যে তা শিখতে চায় তাকে শেখাতে হবে, জ্ঞানের সুফল ব্যাপক করার জন্য তার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে এবং সে জ্ঞান-বহনযোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরি করতে হবে। আর সবকিছুর পূর্বে জ্ঞান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়ার ব্যাপারে তাকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

মালিক ইবন দীনার হাসান (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مامن عبد يحطب خطبة إلاالله عزوجل سائلها عنها- أظنه قال- ما أرادبها؟

"কোন বান্দা কোন ভাষণ দিলে মহান আল্লাহ সেই ভাষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেন: (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) এই ভাষণ দ্বারা সে কী বুঝাতে চায়?"

মালিক ইবন দীনার যখন এই হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন এবং তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে যেত। তারপর তিনি বলতেন:

تحسبون أن عينى تقر، وأنا أعلم أن الله عزو جل سائلى عنه يوم القيامة: ما أردت به؟

তোমরা ধারণা করেছো, আমার দু'চোখ স্থির থাকবে। অথচ আমি জানি, মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন: এই জ্ঞান দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কী ছিল?

দুনিয়া বিরাগী ও দীনের তত্ত্বজ্ঞানী মহান সাহাবী আবুদ দারদা' (রা) বলতেন:

إنما أخشى من ربى يوم القيامة أن يدعونى على

رؤس الخلائق، فيقول لى: يا عويمر، فاقول: لبيك رب: فيقول: ما عملت فيما علمت؟

আমি কিয়ামাতের দিন আমার রব বা প্রতিপালককে ভয় পাচ্ছি যে, তিনি সৃষ্টিজগতের সামনে আমাকে 'হে 'উয়াইমির' বলে ডাক দেবেন। আমি বলবো: প্রভু হে, আমি হাজির! অত:পর তিনি বলবেন: তুমি যা জেনেছো সে ব্যাপারে কী করেছো?

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতের 'আলিমগণকে তাদের অর্জিত 'ইলমের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতি ও জবাবদিহিতার কথা শিক্ষা দিয়েছেন।

২. জ্ঞানগত সততা ও আমানতদারী

'ইলম তথা জ্ঞানের অন্যতম নৈতিকতা হলো আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা। আর সর্বক্ষেত্রে আমানতদারীর গুণ থাকাটা হলো ঈমানের অনুসঙ্গ।

لا إيمان لمن لا أمانة له

যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মু'মিনদের পরিচয় দান করেছেন এভাবে:[১৩৭]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

তেমনিভাবে খিয়ানাত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হলো মুনাফিকীর অন্যতম অনুসঙ্গ দোষ। একজন মুনাফিকের বহু দোষ থাকে, তারমধ্যে সবচেয়ে বড় দোষ হলো: أنه أذا اؤتمن خان –"যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানাত তথা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করে।"

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৩৮]

تناصحوا فى العلم، فإن خيانة أحدكم فى علمه أشدُّ من خيانته فى ماله، وإنَّ الله سا ئلكم يوم القيامة.

---

১৩৭. সূরা আল-মু'মিনূন-৮
১৩৮. মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ.১৪১

তোমরা 'ইলমের (জ্ঞান) ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেবে। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির তার 'ইলমের ব্যাপারে খিয়ানাত করার কাজটি হবে তার ধন-সম্পদের খিয়ানাত করার চেয়েও মারাত্মক। নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

অর্থ-সম্পদের খিয়ানাত, তা যত বড়ই হোক, তার ক্ষতিটা সীমিত পর্যায়ের; কিন্তু 'ইলমের খিয়ানাত একটি সমাজ ও জাতিকেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

'ইলমের একটি আমানত হলো, কথা, ভাব ও চিন্তাটি প্রকৃতপক্ষে যার তার প্রতি আরোপ করা। অন্যথায় অন্যেরটা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া এক ধরণের চৌর্যবৃত্তি এবং ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলেছেন: কথার কল্যাণ ও সমৃদ্ধি হলো কথাটি যার তার প্রতি আরোপ করা। এ কারণে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের রচিত গ্রন্থসমূহে, তা সে যে কোন শাস্ত্রেরই হোক না কেন, দেখতে পাই সকল মতামত ও কথা বিশ্বস্ত সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র হাদীছ ও দীনী 'ইলমের ক্ষেত্রে তাঁরা সনদ প্রয়োগ করেননি, বরং ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

'ইলমের আরেকটি আমানত হলো, মানুষ তার জানার প্রান্ত সীমায় গিয়ে থেমে যাবে এবং যা জানেনা তা বলবে না। বলতে হবে, আমি জানিনা। জ্ঞানের জগতে লজ্জা ও আত্মম্ভরিতার কোন স্থান নেই। প্রকৃত সত্য, প্রকৃত জ্ঞান যেখানে পাওয়া যাবে গ্রহণ করতে হবে- তা সে জ্ঞান, বয়স ও স্থান-মর্যাদার দিক দিয়ে নিচু স্তরের লোকের নিকট থেকেই হোক না কেন। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন একবার সাহাবায়ে কিরামের (রা) মাজলিসের মধ্যে তাঁকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ না করে স্পষ্টভাবে বললেন:

ما المسؤ ول عنها بأ علم من السا ئل.

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞসিত ব্যক্তি অধিক অবগত নয়।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সহজ-সরল জবাবটি বিখ্যাত হাদীছে জিবরীলের (আ) মধ্যে এসেছে।

একজন আমানতদার 'আলিমের ভূমিকা এমনই হওয়া উচিত। প্রশ্নকারীকে তিনি নিন্দামন্দ করবেন না, সঠিক ভাবে না জেনে, নিশ্চিত না হয়ে প্রশ্নকারীর জবাব দেবেন না। আর যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও উত্তর দেয়, অথবা সে নিজে যা বিশ্বাস করে কিন্তু প্রশ্নকারীকে তার বিপরীত কথা বলে, আসলে সে 'ইলমের আমানতের খিয়ানত করে এবং আল্লাহর নিকট শাস্তির অধিকারী হয়। রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে গেছেন:[১৩৯]

من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشارعلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.

জ্ঞান ছাড়াই যাকে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে তার পাপ যে ফাতওয়া দিয়েছে তার উপর বর্তাবে। আর যে তার ভাইকে এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে সম্পর্কে সে জানে যে সত্যতার বিপরীতে, তাহলে সে খিয়ানাত করে।

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এভাবে শিখেছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকে শিখেছিলেন তাবি'ঈন কিরাম (রহ)। এভাবে উম্মাতের আ'লিমগণের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে এ শিক্ষা চলে এসেছে। তাই তাঁরা যে বিষয়ে তাদের জানা থাকতো না সে বিষয়ে আমি জানিনা বলতে অথবা যে জানে তার নিকট পাঠাতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেননি। তাঁরা অকপট চিত্তে নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন এবং কোন রকম অহমিকা ছাড়াই পূর্বের মতামত ও সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোন লজ্জা বা অপমান বোধ করেননি।

প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) বলতেন:[১৪০]

لم يكن أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلَّمَ أهيب لمالا يعلم من أبى بكر، ولم يكن أحد بعد أبى بكر أهيب لما لا يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها من كتاب الله تعالى أصلاً، ولا فى السنة أثرًا، فقال : أجتهد رأبى، فإن يكن صوابًا فمن الله، وأن يكن خطأ فمنى، وأستغفر الله.

নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে যে বিষয়ে জানা না থাকতো সে ব্যাপারে আবূ বাকরের (রা) চেয়ে বেশি ভীত আর কেউ

---

১৩৯. আবূ দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৫৭।
১৪০. কান্‌য আল 'উম্মাল, খ.১, হাদীছ-১৪১৫

ছিলেন না, তেমনিভাবে আবূ বাকরের পরে উমারের (রা) চেয়ে বেশি ভীত কেউ ছিলেন না। আবূ বাকরের (রা) সামনে একটি সঙ্কট দেখা দিলে তার সমাধান আল্লাহর কিতাব, অত:পর রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্তে যখন পেলেন না, তখন তিনি বললেন: আমি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেব। যদি সঠিক হয়, তাহলে ধরে নেব তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয়, তাহলে তার দায়িত্ব আমার এবং আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করবো।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে মাহর বিষয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। একজন অতি সাধারণ মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে 'উমারের (রা) কথার প্রতিবাদ জানালো। উপস্থিত জনতার সামনে প্রকাশ্যে 'উমার (রা) নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন:

كل الناس أفقه من عمر

সব মানুষ 'উমারের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।[১৪১]

আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা), রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাঁকে সবচেয়ে বড় ও বিচক্ষণ কাজী বলে ঘোষণা করেছেন এবং যিনি বহু জটিল সমস্যার সমাধানকারী, তিনি বলেন :

لا يستجى أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم.

তোমাদের কেউ যদি কোন কিছু না জানে তাহলে তা জানতে লজ্জাবোধ করবে না, কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে যা সে জানে না, তাহলে সে যেন, 'আমি জানিনা' - এ কথা বলতেও লজ্জা না পায়।

একদিন তাঁকে একটি মাসায়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "এ বিষয়ে আমার কোন 'ইলম তথা জ্ঞান নেই।[১৪২] আরেকদিন এক ব্যক্তি তাঁকে একটি মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দেন। অত:পর লোকটি বললো : ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! উত্তরটি এমন হবে না, বরং এমন হবে। 'আলী (রা) বললেন: তুমি ঠিক বলেছো, আমি ভুল করেছি।

و فوق كل ذى علم عليم

১৪১. তাফসীরু ইবনি কাছীর, খ.১, পৃ.৪৬৭ (তাব'আ আল হালাবী)
১৪২. কান্য আল 'উম্মাল, খ.১, হাদীছ-১৪৩৭

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপর অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন।[১৪৩]

৩. বিনয় ও নম্রতা

'আলিমদের নৈতিকতার একটি হলো বিনয় ও নম্রতা। একজন প্রকৃত 'আলিমের উপর গর্ব-অহংকার ভর করতে পারে না। তেমনি আত্মতুষ্টিও তার মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে না। কারণ, তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন, 'ইলম হলো সাগরতুল্য যার কোন কূল-কিনারা নেই। কেউ তার শান্ত ও স্থিরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সত্যই বলেছেন:[১৪৪]

...وَمَا أُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

...এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই।

একজন 'আলিমকে মনে রাখতে হবে, জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এ কাফিলা চলমান ও অতি দীর্ঘ। কেবল বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অতীত পেরিয়ে, বর্তমান ছাড়িয়ে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর তিনি সেই কাফিলার একজন সদস্য মাত্র। তাঁর উচিত হবে না পূর্ববর্তীদের মান-মর্যাদা ও অবদানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, অথবা পরবর্তীদের চেষ্টা-সাধনাকে অস্বীকার করা।

একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ছাড়া সৃষ্টিজগতে সবকিছু জানেন এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। আর মানুষ সামান্য কিছু জানে, কিন্তু বহু কিছু তার অজানা। অতীতে যা জানতো না আজ তা জানে, আর আজ যা জানে আগামীকাল তা ভুলে যায়। বস্তুর বাইরের অবস্থা জানলেও ভেতরের অবস্থা অজানা থেকে যায়, যেমন বর্তমান জানলেও অজানা থেকে যায় ভবিষ্যৎ। অধিকাংশ মানুষ যাদেরকে আমরা জ্ঞানী বলে জানি, তারা মূলতঃ শিক্ষার্থী, তাদের জ্ঞান ভাসভাসা, গভীরে নয়। তবে যাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক ও গভীর, তারাও কিন্তু যতটুকু জানে তার চেয়ে বেশি জানেনা। আর জ্ঞানের পরিধি এত বিশাল ও ব্যাপক যে, তা বেষ্টন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী উবাই ইবন কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৪৫]

---

১৪৩. প্রাগুক্ত, হাদীছ-১৪৩৬

১৪৪. সূরা আল ইসরা'-৮৫

১৪৫. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯৫, হাদীছ-১২৫।

قَامَ مُوْسى عليه السَّلام خَطِيْبًا فِى بَنِى إِسْرَائِلَ فَسُئِل أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فقال : أنا أعلم، فعتَبَ اللهُ عليه، إِذْ لَم يَرُدَّ العِلْمَ إِليهِ، فأوحىَ اللهُ إِليه أنَّ عبدًا مِنْ عِبَادِى بمجمع البحرين هو أَعْلَمُ منكَ، قَالَ : يارَبِّ كيف به؟ فقيل له: اِحْمل حوتًا فِى مِكْتَلٍ، فإذا فَقَدْتَه فَهُو ثَمَّ... فَانْطَلَقَا يَمْشَيَانِ عَلَى ساحل الْبَحْرِ ليس لهما سَفِيْنَةٌ، فَمَرَّتْ بهما سَفِيْنَةٌ، فَكَلَّمُوهم أن يحملوهُمَا، فَعُرِفَ الْخِضْرُ، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفورفوقع على حَرْفِ السفينة، فَنَقَرَ نَقْرَةً أو نَقْرَتَين فى البحر، فقال الخضْرُ يا موسى، ما نقَصَ عِلْمى وَعِلْمُكَ من علم الله إلاَّ كَنَقْرَةِ هذا العصفور فى هذا البحر.

একবার মূসা (আ) জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে উঠলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী কে? তিনি বললেনঃ আমিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা তিনি (তখনো) তাঁকে পুরো জ্ঞান দান করেননি। অত:পর আল্লাহ তাঁকে বললেনঃ দুই সাগরের মিলনস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন! হে আমার প্রভু! আমি কিভাবে তাঁকে পাবো? আল্লাহ বললেন। একটি থলেতে করে একটি মাছ নিয়ে চলতে থাকো। যেখানে মাছ হারিয়ে যাবে, সেখানে সেই বান্দাকে পাবে...। অত:পর তারা সমুদ্রতীর ধরে কিছুদূর একত্রে পায়ে চলার পর একখানা নৌকায় আরোহন করেন। খিযিরকে চিনতে পেরে নৌকার চালক তাঁদের দু'জনের ভাড়া নিলনা। এই সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক পাশে বসলো এবং সমুদ্র থেকে এক-দুই ঠোকর পানি নিল। খিযির বললেনঃ হে মূসা, এই পাখিটি ঠোঁট দিয়ে যতটুকু পানি সমুদ্র থেকে নিয়েছে,

আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তোমার ও আমার জ্ঞানের পরিমাণ ঠিক ততটুকু। (সংক্ষিপ্ত)

খিযির (আ) মূসা কালীমুল্লাহকে (আ) শুধু একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান কোন হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত দার্শনিক, 'ইলমে কালামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযীর (রহ) একটি কবিতার দু'টি লাইন এখানে উল্লেখ করছি:[১৪৬]

العلم للرحمنِ جل جلاله وسواه فى جهلاته يتغمغم

ماللتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم.

জ্ঞান পরম করুণাময়ের জন্য, যার সম্মান-মর্যাদা সুমহান। তিনি ছাড়া প্রত্যেকে তার অজ্ঞতার মধ্যে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে। মাটি ও জ্ঞানের কী হয়েছে? (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া) প্রত্যেকে চেষ্টা করছে একথা জানার জন্য যে, সে জানে না।

আর এ রকম কথাই বলে গেছেন আল-বাকিল্লানী, ইমামুল হারামাইন, আশ-শাহরিস্তানী (রহ) প্রমুখের মত অসংখ্য মুসলিম মনীষী।

নিজেদের পঠিত ও অর্জিত জ্ঞান নিয়ে যারা দম্ভ ও অহংকার করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোর ভাষায় তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করেছেন। তারা যদি সত্যিকার জ্ঞানী হতো তাহলে নিজেদের অবস্থান তারা জানতে পারতো। তারা উপলব্ধি করতো, তাদের জ্ঞান অতি সামান্য। এখানে জ্ঞান নিয়ে দম্ভের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি সতর্কবাণী উপস্থাপন করা হলো:[১৪৭]

عن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يظهر الاسلامُ حتّى تختلف التّجارُ فى البحر، وحتى تخوض الخيل فى سبيل الله، ثمَّ يطهرُ قومٌ يقرَءُوْنَ القرانَ يقولُونَ : مَنْ أقْرأُ مِناًّ؟

---

১৪৬. আর রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৭০

১৪৭. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯৬, হাদীছ-১১৬

مَنْ أُعلمُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ ثُمَّ قال لأصحابه : هل فى أولئك من خيرٍ؟ قالوا اللهُ ورسوله أعلمُ، قال : أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقودُ النار، (رواه الطبرانىُّ)

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইসলাম বিজয়ী হবে, অত:পর ব্যবসায়ীরা সমুদ্রের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং অশ্বারোহীরা আল্লাহর পথে দূর-দূরান্তে পৌঁছে যাবে। অত:পর এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে, আর বলবে: আমাদের চেয়ে উত্তম পাঠক, বড় জ্ঞানী ও বড় বোদ্ধা আর কে আছে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন: এদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ আছে? তাঁরা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালো জানেন। তিনি বললেন: তারা তোমাদের তথা এই উম্মাতেরই লোক। তারা হবে জাহান্নামের জ্বালানি। (আত-তাবারানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বিনয় ও নম্রতার গুণে গুণান্বিত হন তখন তিনি তাঁর সীমার মধ্যে অবস্থান করেন, অন্যের অধিকারের প্রতি সচেতন থেকে তার প্রতি ন্যায়বিচার করেন এবং সবকিছু জানার মিথ্যা দাবীদার হয়ে বাড়াবাড়ি করেন না। এর যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনীতে আমরা পেয়ে থাকি।

দারুল হিজরাহ্ মাদীনার ইমাম আনাস ইবন মালিক (রহ) বলেন, আব্বাসীয় খালীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর হজ্জ উপলক্ষে মাদীনায় এসে আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে হাদীছ শুনাই। তিনি অনেক প্রশ্ন করেন, আমি তার জবাবও দিই। এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

إنى قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التى وضعتها – يعنى المؤطأ فتنسخ نسخًا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخةً، وامرهم أن يعملوا بما فيها، لايتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ماسوى ذلك من

هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনি 'আল-মুওয়াত্তা' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার অনেকগুলো কপি করার নির্দেশ দেব। তারপর তার একটি করে কপি প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত শহরে পাঠাবো। তারপর তাদেরকে নির্দেশ দেব, তারা যেন সেই গ্রন্থের মধ্যে যা আছে সেই অনুযায়ী 'আমল করে, তা ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে না যায় এবং তাদের নিকট বর্ণিত অন্য সকল 'ইলম তথা জ্ঞান পরিহার করে। কারণ আমি মনে করি, এই জ্ঞানের মূল ও উৎস হলো মাদীনাবাসীদের বর্ণনা ও তাদের 'ইলম।

ইমাম মালিক ইবন আনাসের (রহ) মত মনীষী না হয়ে, অন্য কোন আত্মপ্রচারে উৎসাহী 'আলিম হলে এই প্রস্তাবে দারুণ খুশী হতো। কিন্তু ইমাম মালিক খালীফার প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বলেন:

يا أمير المؤمنين لاتفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف الناس : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن ردهم عما إعتقدو اشديد، فدع الناس وماهم عليه، وما اختار كل بلد لأنفسهم.

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমন করবেন না। কারণ, মানুষের নিকট বহু কথা পৌঁছে গিয়েছে, তারা বহু হাদীছ ও বর্ণনা শুনেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিকট আগে থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, তার উপর 'আমলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই পৌঁছানো জিনিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ এবং অন্যদের মতপার্থক্যও আছে। তারা যা বিশ্বাস করেছে তা থেকে তাদেরকে ফেরানো খুব কঠিন হবে। মানুষকে তাদের আপন অবস্থায় এবং প্রত্যেক শহর নিজেদের জন্য যা গ্রহণ করেছে, তার উপর ছেড়ে দিন।

অত:পর আবূ জা'ফর আল-মানসূর বলেন: "আমার জীবনের শপথ! তিনি যদি আমাকে

সম্মতি দিতেন তাহলে আমি সে ফরমান জারি করতাম।" আবূ 'উমার ইবন 'আবদিল বার (রহ) এ কাহিনী বর্ণনার পর মন্তব্য করেন:[১৪৮]

وهذا غاية فى الإنصاف لمن فهم.

যারা বোঝে তাদের জন্য এটা হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের ইনসাফ বা ন্যায়বিচার।

'আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম (রহ) ইমাম মালিককে (রহ) বলেন:

ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر.

আমি বেচাকেনা বিষয়ে মিসরবাসীদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে এমন কাউকে জানিনা।

ইমাম মালিক (রহ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন: তুমি এটা কিভাবে জানলে? বললেন: আপনার দ্বারা। ইমাম মালিক (রহ) তখন বললেন:[১৪৯]

فأنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بى.

আমি তো বেচাকেনা বুঝিই না। তাহলে তারা আমার দ্বারা কিভাবে বেচাকেনা বুঝবে?

আল্লাহর প্রতি বিনয়, নিজের প্রতি ন্যায়বিচার ও অন্যের নীতি-অবস্থান মূল্যায়নের ব্যাপারে একজন সত্যিকার 'আলিমের নীতি-অবস্থান এমনই হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৫০]

إذا سَمِعْتَ الرجل يقول هلك الناس، فهو أهلكهم.

যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন সে-ই ধ্বংসের অধিকতর উপযুক্ত হয়ে গেছে।

সাধারণ মানুষের দোষ-ত্রুটি ও পদস্খলন দেখে যখন কোন 'আলিম বলেন, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন মূলত: তারই ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে। কারণ, তিনি অন্যের ত্রুটি দেখলেও নিজের ত্রুটি দেখতে পাননা। নিজের জ্ঞান, নিজের 'ইবাদাত ইতাদি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে থাকেন, আর অন্যের কাজকে ছোট করে দেখেন, তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

---

১৪৮. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.১৫৯
১৪৯. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১০৯
১৫০. মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাতি, হাদীছ-২৬২৩

সুতরাং এমন ব্যক্তিই ধ্বংসের অধিকতর উপযুক্ত হয়ে যায়। আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখতে পাই, ফলবান বৃক্ষের ডালপালা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে, পক্ষান্তরে ফলবিহীন বৃক্ষের ডাল থাকে উর্দ্ধমুখী। জ্ঞানের জগতেও একই নিয়ম। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি হন বিনয়ী, পক্ষান্তরে অল্প বিদ্যার অধিকারী হয় দাম্ভিক ও অহংকারী।

৪. সম্মান ও মর্যাদাবোধ

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নৈতিকতার আরেকটি অপরিহার্য বিষয় হলো আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ। সম্মান-মর্যাদা হলো মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[১৫১]

...وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

> ...সম্মান-মর্যাদা তো আল্লাহরই, আর রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানেনা।

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ, আর দম্ভ, অহংকার ও আত্মতুষ্টি কিন্তু এক জিনিস নয়। এ কারণে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনয় ও নম্রতা গুণের পরিপন্থীও নয়। এ হলো 'ইলম ও ঈমানের সম্মান, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের সম্মান নয়। এমন সম্মান যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট চাওয়া হয়, কোন মানুষের নিকট নয়, কোন ক্ষমতাগর্বী শাসকের নিকটও নয়।

مَن كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا...

> কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই...।[১৫২]

'আলিমদের এই সম্মান ও মর্যাদাবোধের নিকট শাসকদের ক্ষমতার দাপট, ধনাঢ্যদের দাম্ভিকতা, শক্তিমানদের অহমিকা, বংশীয় আভিজাত্য, সংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি সবই নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস।

উমাইয়া শাসকদের একজন ক্ষমতাদর্পী আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ ইবন

---

১৫১. সূরা আল-মুনাফিকুন-৮
১৫২. সূরা আল ফাতির-১০

ইউসুফ। তিনি একদিন তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত 'আলিম খালিদ ইবন সাফওয়ানকে (রহ) জিজ্ঞেস করলেন: বসরার নেতা কে? খালিদ বললেন: হাসান আল-বাসরী (রহ)। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: কিভাবে, তিনি তো একজন আযাদকৃত দাস? অর্থাৎ কোন অভিজাত আরববংশীয় নন। খালিদ বললেন: মানুষ তাদের দীনের ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তিনি মানুষের দুনিয়া থেকে একেবারেই অমুখাপেক্ষী। আমি বসরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এমন কাউকে দেখিনি যে তাঁর মাজলিসে হাঁটু গেড়ে বসে না। তারা তাঁর কথা শোনে এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা লিখে নেয়। একথা শুনে হাজ্জাজ মন্তব্য করলেন: আল্লাহর কসম! এটাই হলো নেতৃত্ব।[১৫৩]

কোন কিছুর মালিক হওয়ার পূর্বে সে ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হওয়া এক উন্নত পর্যায়ের অনুভূতি। অনেক মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক দিয়ে নিতান্ত দরিদ্র। সে অন্যের কাছে হাত পাতে। আর অনেকে একেবারে শূন্য হাত হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক দিয়ে কারূনের চেয়েও নিজেকে ধনী মনে করে। হাদীছে এসেছে:

ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى عن النفس.

"ধন-সম্পদের আধিক্যে অভাবমুক্তি নয়। প্রকৃত অভাবমুক্তি হলো মনের ঐশ্বর্যে।"

উমাইয়া খালীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আবূ হাযিম গেলেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। খালীফা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, তিনি একজন মু'মিনের শক্তি ও 'আলিমের আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে জবাব দিলেন। সত্যের ব্যাপারে কোন রকম সৌজন্য দেখালেন না এবং দীনের ব্যাপারে মোটেও চাটুকারিতা করলেন না। তাঁর এমন সাহসিকতায় খালীফা মুগ্ধ হলেন। অত:পর তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়:

খালীফা : আবূ হাযিম, আপনি আমাদের সাথে থাকুন। আপনি আমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করবেন, আমরাও আপনার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবো।

আবূ হাযিম : আ'উযুবিল্লাহ!- আল্লাহর আশ্রয় চাই!

খালীফা : কেন?

আবূ হাযিম : আমার ভয় হলো, আমি আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত সামান্য কিছুর উপর নির্ভর করবো, অত:পর আল্লাহ আমাকে জীবন ও মৃত্যুর দুর্বলতার স্বাদ আস্বাদন করাবেন।

খালিফা : আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমাকে বলুন।

---

১৫৩. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.৭৪, ৭৫

আবূ হাযিম : আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিন।

খালীফা : এ কাজ আমার ক্ষমতার বাইরে।

আবূ হাযিম : তাহলে আপনার নিকট আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।[১৫৪]

এই হলো 'আলিমদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ। এমন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাঁদের হতে হবে। কারণ, তাঁরা তাঁদের অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কালাম সংরক্ষণ করেন, তাঁদের হাত দিয়ে ধারণ করেন হিদায়াতের প্রদীপ, তাঁদের অন্তর ভাণ্ডারে পুঞ্জিভূত করেন সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ এবং সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন উত্তরাধিকার। আর তা হলো নুবুওয়াতের উত্তরাধিকার। যা না হলে মানবজাতি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতো, পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়তো। তাই হাদীছে এসেছে:

مَنْ قَرَأَ الْقرآن ثمَّ رأى أنَّ أحدًا أُوْتِيَ أفضل مِمَّا أُوتى فقد استصغر ما عظم الله تعالى.

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার পর মনে করলো তাকে যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস অন্যকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ তা''আলা যা মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন, তা হেয় জ্ঞান করলো।

নুবুওয়াত যদি হয় সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সম্পদ তাহলে তার উত্তরাধিকারী 'আলিমগণের সম্মান ও মর্যাদা হবে নবীর পরেই। তাই 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলতেন:

من قرأ القرآن، فقد ادرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه.

যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো সে তার দেহের পার্শ্বদ্বয়ে নুবুওয়াত ঢুকিয়ে নিয়েছে। তবে তার প্রতি ওহী নাযিল হয়না।

'আমর ইবনুল 'আস (রা) "قرأ القرآن" (কুরআন পড়লো) বলেছেন। তার অর্থ কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কেবলমাত্র ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ বুঝতেন না, বরং তাঁরা পাঠ করা বলতে অর্থ বুঝা, বিধি-বিধান অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা বুঝতেন। এ কারণে তাঁরা 'আলিমদেরকে "কুররা" (পাঠক) বলতেন। আবুল আসওয়াদ বলতেন:

---

১৫৪. সুনান আদ দারিমী, খ.১, পৃ.১৩৯।

ليس شئ أعز من العلم، الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك.

জ্ঞানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কিছু নেই। রাজা-বাদশারা মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে, আর 'আলিমগণ কর্তৃত্ব করেন রাজা-বাদশাদের উপর।

'আলিমদের সঠিক অবস্থান এই যে, তাঁদের কথাই হবে সব কথার উপরে। কারণ, তা আল্লাহ্‌র কথা থেকে সংগৃহীত। তাঁরা জীবন ও মানুষ অভিমুখী। তবে অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে এবং 'আলিমগণ আমীর-'উমারাদের চলার পথের সহযাত্রী হয় তাহলে ভিন্ন কথা। তখন আর তাদের সেই মর্যাদা ও অবস্থান বিদ্যমান থাকবে না। আর এ কথাটি ফুটে উঠেছে কাজী 'আবদুল কাহির আল-জুরজানীর (রহ) নিম্নের চরণ দু'টিতে:

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم + ولو عظموه فى النفوس لعظما

ولكن أهانوه فهان، ودنسوا + محياه بالأطماع حتى تجهما.

জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি জ্ঞানকে রক্ষা করে জ্ঞানও তাদেরকে রক্ষা করবে। আর যদি তারা জ্ঞানকে বড় করে দেখে তাহলে জ্ঞানও তাদেরকে বড় করে দেখবে। কিন্তু যারা জ্ঞানকে হেয় করেছে জ্ঞানও তাদেরকে তুচ্ছ ও হেয় করেছে। তারা লোভ-লালসা দ্বারা জ্ঞানকে কলুষিত করেছে। ফলে জ্ঞান মুখ মলিন করে রেখেছে।[১৫৫]

৫. 'ইলম অনুযায়ী 'আমল করা

'ইলম অনুযায়ী 'আমল করা হলো ইসলামী জীবন দর্শনে 'ইলমের মৌলিক নৈতিকতার একটি। তা এই অর্থে যে, 'ইলম ও ইরাদা তথা জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। বহু মানুষের বিপদ হলো, তারা জানে কিন্তু সে অনুযায়ী 'আমল করেনা, অথবা তার জানার বিপরীত কাজ করে। যেমন একজন ডাক্তার জানে এই খাদ্য ও পানীয়ের অপকারিতা কি, তা সত্ত্বেও অভ্যাস অথবা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী তা খায়

১৫৫. আর রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৭৪, ৭৫, ৭৯

অথবা পান করে। বহু ডাক্তারকে ধুমপানের অপকারিতার উপর বক্তৃতা দিতে দেখা যায়, আবার তাদেরকেই ধুমপান করতেও দেখা যায়। কোন কোন নীতি বিজ্ঞানীকে দেখা যায়, তিনি যে আচরণটিকে নিকৃষ্ট মনে করেন, নিজে সেই আচরণ করেন। অনুরূপভাবে বহু দীনী 'আলিমকে দেখা যায়, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন একটি কাজকে খারাপ মনে করে মানুষকে তা থেকে বিরত থাকতে বলেন, আবার তিনি নিজেই তা করেন। এমন তাত্ত্বিক 'ইলম ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না, বরং এমন অবস্থায় অজ্ঞতাকে ভালো মনে করে।

সত্যিকার 'ইলম তথা জ্ঞান তাই যা তার অধিকারীর দৃষ্টিকে আলোকিত করে, তার দু'চোখের সামনে প্রতিদানকে মূর্ত করে তোলে। ফলে দূরকে নিকট করে দেয়। তখন অনুপস্থিতকে উপস্থিত এবং বিলম্বকে তাৎক্ষণিক বলে মনে হয়। ফলে সৎ কাজ ও আল্লাহ ভীতির উপর অটল থাকার তার সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করে এবং পাপাচারের প্রতি তার আগ্রহকে দুর্বল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবূ কাবশা আল-আনসারী (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন:[১৫৬]

إنَّما الدنيا لأرْبَعَةَ نفرٍ :

١- عبدٌ رزقه اللهُ مالاً وعلمًا، فهو يَتَّقِي رَبَّه، ويَصِلِ فيه رَحِمَه، ويعلم لله فيه حقًا فهذا بأفضل المنازل.

٢- وعبدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا ولم يَرْزُقْهُ مَالاً، فهو صادقُ النيَّةِ، يقول : لو أنَّ لى مالاً لعملتُ بعمل فلان، فهو بنيَّتِه، فأجرهُما سَوَاءُ.

٣- وعبدٌ رَزَقَهُ اللهُ مالا ولم يَرْزُقْهُ علمًا، يخبطُ فى ماله بغير علم، ولا يتقي فيه رَبَّهُ، ولا يَصِلُ فيه رَحمه، ولا يعلم الله فيه حقًا، فهذا بأ خبث المنازل.

٤- و عبدٌ لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا، فهو يقول : لوأنَّ

১৫৬. মুসনাদু আহমাদ, খ.৪, পৃ. ২৩১; তিরামযী, বাবুয যুহ্দ, হাদীছ-২৩২৬; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.১৫, হাদীছ-১৬

لى مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيَّته، فوزرُهما سواء.

দুনিয়া চার ব্যক্তির জন্য :

১. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদও দিয়েছেন এবং জ্ঞানও দান করেছেন। ফলে সে তার সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় ব্যয় করে এবং সেই সম্পদে আল্লাহর কী হক আছে, সে সম্পর্কেও সচেতন থাকে। এই ব্যক্তি সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

২. অপরজন যাকে আল্লাহ জ্ঞান তো দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি, ফলে সে নিয়্যাতের ব্যাপারে সৎ ও সত্যবাদী। সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকতো, তাহলে অমুকের (যে সৎ পথে সম্পদ ব্যয় করে) ন্যায় কাজ করতাম। এই ব্যক্তি তার নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব পাবে এবং উভয় ব্যক্তি একই রকম প্রতিফল পাবে।

৩. অপরজন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞান দেননি। অজ্ঞতার কারণে সে নিজের সম্পদের অপচয় করে। সে তার সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না, তা ব্যয় করে আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্কও রক্ষা করে না এবং তাতে আল্লাহর কী হক আছে তাও জানেনা। এইরূপ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে রয়েছে।

৪. আরেকজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদও দেননি, জ্ঞানও দেননি। ফলে সে বলেঃ আমার যদি সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুকের মত কাজ করে উড়াতাম। এইরূপ ব্যক্তি স্বীয় অসৎ নিয়্যাতের কারণে তৃতীয় ব্যক্তির সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

উল্লেখিত হাদীছে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একজন 'আলিমের সম্পদে তার 'ইলমের প্রভাব পড়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। তিনি তাঁর সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেন এবং তা ব্যয়ের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখেন। তিনিই হলেন একজন কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তি। হাদীছের বর্ণনা মতে, তিনিই হবেন সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী, আর যে ব্যক্তিকে সম্পদ দেওয়া হয়নি, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সম্পদ নেই, তাই সে সম্পদ দ্বারা কোন ভালো কাজ করতে পারেনি। তবে তার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্য ও ভালো নিয়্যাত ছিল। শুধু এই ভালো নিয়্যাতের কারণে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত তাকেও প্রতিফল দেওয়া হবে।

আরেক ব্যক্তিকে না সম্পদ দেওয়া হয়েছে, না জ্ঞান। তা সত্ত্বেও শুধু নিয়্যাতের কারণে সেই ব্যক্তির মত নিকৃষ্টতম অবস্থান লাভ করবে যার সম্পদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান দেওয়া হয়নি এবং সে তার সম্পদ কোন ভালো কাজে ব্যয় করেনি। সবকিছুতেই কল্যাণ ও ভালো প্রতিফল লাভের জন্য সৎ উদ্দেশ্য ও সৎ নিয়্যাত থাকা অপরিহার্য।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখান সেখান থেকে কিছু ভাসা ভাসা তথ্য অর্জনের নাম কিন্তু 'ইলম তথা জ্ঞান নয়। প্রকৃত জ্ঞান হলো একটা 'নূর' তথা জ্যোতি যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে নিক্ষেপ করেন, তারপর তাকে দান করেন দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস, এবং তার থেকে দূর করেন সব রকমের উদ্বেগ ও অস্থিরতা। এই হলো প্রকৃত পক্ষে কল্যাণধর্মী 'ইলম বা জ্ঞান।

সত্যিকার কল্যাণধর্মী 'ইলম হলো তাই যা তার অধিকারী 'আলিমের উপর মানুষ এই প্রভাবগুলো প্রত্যক্ষ করে : ১. চেহারায় নূরের আভা, ২. অন্তরে আল্লাহ-ভীতি, ৩. আচার-আচরণে দৃঢ়তার ছাপ ৪. আল্লাহর সাথে, মানুষের সাথে, সর্বোপরি নিজের নফসের সাথে সততা। শুধু মিষ্টি-মধুর কথা বলা, কথার সাথে কাজের মিল না থাকা সত্যিকার 'আলিমের চরিত্র নয়, তা হলো মুনাফিকের চরিত্র। যারা মানুষকে এমন কথা বলে যা নিজেরা করেনা, মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করে, আর নিজেদেরকে ভুলে থাকে, অথচ তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ অধ্যয়ন করে, অতীতের বনী ইসরাঈলের এ জাতীয় লোকদের আল-কুরআন ধিক্কার দিয়েছে এভাবে :[১৫৭]

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?

আল-কুরআন যেন ইঙ্গিত করছে, জ্ঞান ও কর্ম এবং কথা ও কাজের বৈপরীত্য এক ধরনের পাগলামি অথবা এক প্রকার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যা বুদ্ধিমানদের জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[১৫৮]

---

১৫৭. সূরা আল-বাকারা-৪৪
১৫৮. সূরা আস-সাফ-২-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।

যে সকল 'আলিম তথা জ্ঞানী ব্যক্তির এমন দ্বিমুখী চরিত্র, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা পাঠ করলে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষের অন্তরও ভয়ে কেঁপে ওঠে।

উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শোনেন:[১৫৯]

يُجَاءُ بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار، فتندلق أقتابه، فيدوربها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون : يافلان، ماشأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن الشرو أتيه،

কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অত:পর তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে, তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যাবে। অত:পর গাধা যেমন ঘানির চারদিকে ঘোরে, তেমনিভাবে সেও তার নাড়িভুড়ির চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চারদিকে সমবেত হবে। তারা বলবে: ওহে অমুক! তোমার এমন অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, অথচ নিজে সেই সব অসৎ কাজ করতাম।

আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি:

---

১৫৯. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯০, হাদীছ-১১৫

مررت ليلة أسرى بى بأ قوام تقرض شفا ههم بمقا ريض من نار، قلت: من هؤ لاء ياجبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون.

মিরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে গিয়েছিলাম যাদের ঠোঁট জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: আপনার উম্মাতের সেই সব বক্তা যারা নিজেরা যা করতো না অন্যদেরকে তা করতে বলতো।[১৬০]

মূলত: তারা মানুষকে সুন্দর সুন্দর কথা বলতো, কিন্তু নিজেদের 'আমল সুন্দর করতো না। নিজেদেরকে 'আলিম বলে পরিচয় দিত, কিন্তু 'ইলমের হক আদায় করতো না। যেহেতু তারা নেতৃত্বের আসনে ছিল, এ কারণে উম্মাতের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পৃথিবীতে দু'শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা ভালো হয়ে গেলে সব মানুষ ভালো হয়ে যায়। আর তারা বিকৃত হয়ে গেলে, সব মানুষও বিকৃত হয়ে যায়। তারা হলো আমীর-'উমরা ও 'আলিমগণ। একজন আরব কবি যথার্থই বলেছেন:

يا أيها العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟

ওহে 'আলিমগণ, ওহে শহরের লবণতুল্য ব্যক্তিবর্গ! লবণ যখন বিকৃত হয়ে যায় তখন আর পরিশুদ্ধ করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে এমন আশংকাই করেছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে প্রত্যেক বাকপটু 'আলিম মুনাফিক থেকে সতর্ক করেছেন।"[১৬১]

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৬২]

إنى لا أتخوَّف على أمتى مؤمنًا ولا مشركًا. فأما المؤمن فيحجره إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره،

---

১৬০. মুসনাদু আহমাদ, খ.৩, পৃ.১২০; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯০, হাদীছ-১১৫
১৬১. মাজমা' আয যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ.১৮৩
১৬২. আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৯৪, হাদীছ-১২৩

ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكون.

আমি মুশরিক ও মু'মিন - দু'জনের কারো দ্বারা আমার উম্মাতের কোন ক্ষতির আশংকা করিনে। কারণ, মু'মিনকে তার ঈমানই (ক্ষতিকর কর্ম থেকে) ঠেকিয়ে রাখবে। আর মুশরিককে তো তার কুফরীই দমন করে রাখবে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা এই যে, বাকপটু 'আলিম মুনাফিক তোমাদের প্রভূত ক্ষতি করবে। তোমাদের পছন্দ মত কথা বলবে এবং তোমরা যা পছন্দ করবে না, তেমন কাজ করবে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

العلم علمان : علم فى القلب، فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان، فذلك حجة الله على ابن آدم.

জ্ঞান দু'প্রকার: অন্তরস্থ জ্ঞান, আর সেটাই হলো কল্যাণধর্মী জ্ঞান। দ্বিতীয়টি জিহ্বা সর্বস্ব জ্ঞান। আর সেটাই হলো আদম সন্তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণ।

একজন মানুষের জ্ঞান, যদি সে তদনুযায়ী 'আমল করে তাহলে সে জ্ঞান তার নিজের পক্ষের দলিল ও প্রমাণ হবে, অন্যথায় সে যদি কেবল তার বাহক হয়, তাহলে তা বিপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ হবে। তখন তার চরিত্র হবে সেই ইহুদীদের মত যারা তাওরাত বহন করতো, তবে তার উপর 'আমল করতো না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:[১৬৩]

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسفارًا.

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গাধা...।

অর্থাৎ তারা তাওরাত অনুসরণ করেনি। অথবা তারা সেই লোকদের মত যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আয়াত দান করেছেন, কিন্তু তারা তা ত্যাগ করেছে এবং চিন্তা ক্ষেত্রে বস্তুবাদের তলদেশ এবং আচরণে পশুত্ব থেকে উর্দ্ধে উঠে দাঁড়াতে

১৬৩. সূরা আল-জুমুআ-৫

পারেনি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:[১৬৪]

...وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ...

...কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়...।

আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন জ্ঞান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন যা উপকার করেনা। আর তা সেই জ্ঞান যা আখলাক তথা নীতি-নৈতিকতা থেকে মুক্ত। সে জ্ঞান তার অধিকারীর জন্য যেমন বিপদ হয়ে দেখা দেয়, তেমনি কখনো কখনো তার আশেপাশে যারা থাকে তাদের জন্যেও। যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আটি করতেন:[১৬৫]

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ ينفع، وَمِنْ قَلْبٍ لا يخشع، وَمِنْ نفس لا تشبع، وَمِنْ دعوة لا يستجاب لها

হে আল্লাহ! যে 'ইলম তথা জ্ঞান দ্বারা উপকার হয় না, যে হৃদয়ে নম্রতা নেই, যে অন্তরে পরিতৃপ্তি নেই এবং যে দু'আ কবুল হয় না, তা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এই শ্রেণীর 'আলিমগণ, যাদের কর্ম তাদের কথাকে এবং গোপন অভ্যাসকে প্রকাশ্য স্বভাব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সাধারণ মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মানুষ কথার চেয়ে বাস্তব অবস্থার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, যেমন আরবীতে বলা হয়:

حال رجل فى ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل فى رجل.

একজন মানুষের উপর হাজার মানুষের কথার চেয়ে হাজার মানুষের উপর একজন মানুষের বাস্তব অবস্থা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী হয়।

---

১৬৪. সূরা আল-আ'রাফ-১৭৬

১৬৫. মুসলিম, কিতাবুয যুহ্দ, ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবাহ্, হাদীছ-২৭২২; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮৯, হাদীছ-১১৪

মানুষকে যতই একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হোক না কেন যে, তোমরা অমুক 'আলিমের 'আমলের দিকে না তাকিয়ে তার থেকে কেবল 'ইলম গ্রহণ কর, মানুষ তা মোটেই শুনবে না। মানুষ তাকে অনুসরণ করবে।

আর এ কারণে 'আলী (রা) বলতেন:

> فصم ظهری رجلان: جاهل متنسك، وعالم متهتك ذاك يغرهم بتنسكه، وهذا يضلهم بتهتكه!
>
> মূর্খ দরবেশ ও নির্লজ্জ-নীতিভ্রষ্ট 'আলিম-এ দু'প্রকারের মানুষ আমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে। একজন তার বৈরাগ্য স্বভাব দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয়, আর অন্যজন তার নীতিভ্রষ্টতা দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

এজাতীয় লোকদের বিপদ আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়, যদি তারা হয় অসৎ ও স্বৈরাচারী শাসকদের লেজুড় বা মুখপাত্র। তখন তারা শাসকদের সকল অন্যায় কাজকে অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করে এবং তাদের সকল বাড়াবাড়িকে তথাকথিত ফাতওয়ার মাধ্যমে বৈধ বলে ঘোষণা করে। এ ধরনের লোকেরাই অতীতে বিভিন্ন ধর্মকে ধ্বংস করেছে। একটি মারফূ' হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৬৬]

> أنزل الله فی بعض الكتب، أوأوحی إلی بعض الأنياء : قل للذين يتفقهون لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس، مسوك الكباش (جلود الضأن) وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلی من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر- إيای يخادعون، وبی يستهزؤن : بی حلفت لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران.
>
> আল্লাহ কিছু গ্রন্থে নাযিল করেছেন, অথবা কোন কোন নবীর নিকট তিনি প্রত্যাদেশ করেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন, যারা দীন (ধর্ম) ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করে, 'আমল ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে 'ইলম অর্জন করে, আখিরাতের 'আমল দ্বারা দুনিয়া তালাশ করে,

---

১৬৬. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.২৩১-২৩২

মানুষকে দেখানোর জন্য ভেড়ার চামড়া পরে, তাদের অন্তর নেকড়ের অন্তরের মত, তাদের ভাষা মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, তাদের অন্তর ধৈর্যের চেয়েও অধিকতর তিতা, তারা আমাকে ধোঁকা দেয় এবং আমার সাথে ঠাট্টা-রসিকতা করে: আমি আমার সত্তার নামে শপথ করেছি, তাদেরকে আমি এমন ফিত্না তথা পরীক্ষায় ফেলবো যে অতি ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাও বিস্ময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

৬. 'ইলম তথা জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের প্রতি আগ্রহ

অর্জিত জ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও তার দ্বারা মানুষের উপকার সাধনের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা একজন সত্যিকার 'আলিমের অন্যতম নৈতিকতা। যে 'ইলম গোপন করা হয় তাতে কোন কল্যাণ নেই, যেমন কল্যাণ নেই পুঞ্জিভূত করে রাখা সম্পদে। জ্ঞানের অস্তিত্ব হয়েছে প্রচারের জন্য, যেমন সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে খরচের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখ থেকে শোনা সকল কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে ভীষণ ভাবে উৎসাহিত করেছেন। যাতে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যুগের পর যুগ মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি ইসলামের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনের পর উপসংহারে যে কথাগুলি বলেন তার একটি ছিল এই:

ليبلغ الشا هد منكم الغائب

তোমাদের উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দেবে।

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৬৭]

بَلِّغُوْ اعَنِّیْ وَلَوْ آيَةً "তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, তা মাত্র একটি আয়াতই হোক না কেন।"

ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৬৮]

نضر الله امرءا سمع مِنّا شَيْئًا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.

১৬৭. আল বুখারী, বাবু মা যুকিরা 'আন বাণী ইসরাঈল

১৬৮. আত্ তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬২৯; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৭৬, হাদীছ-৯১

ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত রাখুন, যে আমার নিকট থেকে কোন কিছু শোনে, অত:পর অবিকৃতভাবে যা শোনে তাই প্রচার করে। যার নিকট প্রচার করা হয় সে অনেক সময় শ্রোতার চেয়ে অধিক সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখে।

যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ বলেন:[১৬৯]

نضر الله امرأً سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.

ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত রাখুন, যে আমার কোন বাণী শোনার পর তা অন্যের নিকট পৌঁছায়। যে ইসলামের কোন তত্ত্বকথা অন্যের নিকট পৌঁছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী হয়ে যেতে পারে। যে ইসলামের বাণী ধারণ করে ও পৌঁছায়, সে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে দক্ষ হয় না।

উল্লেখিত ও অনুরূপ ভাবার্থের হাদীছসমূহ সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট নুবুওয়াতী 'ইলমের যা কিছু সংরক্ষিত ছিল তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে তাঁদেরকে উৎসাহিত করে। এমন কি তৃতীয় খালীফা 'উছমান (রা) আবূ যারকে (রা) ফাতওয়া দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব একথা জানা থাকা সত্ত্বেও সে নিষেধ মানেননি। তিনি মনে করেন, বিশেষ করে এক্ষেত্রে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। কারণ, তাবলীগ তথা প্রচারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নির্দেশ তা ফাতওয়ার ব্যাপারে ইমামের নিষেধাজ্ঞার চেয়েও শক্তিশালী। হজ্জ মওসুমে মানুষ যখন তাঁর চারপাশে জড় হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিকট ফাতওয়া চাইতে থাকে তখন একজন কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে বলেন: আপনাকে কি ফাতওয়া দিতে নিষেধ করা হয়নি?

আবূযার (রা) মাথা উঁচু করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন: আপনি কি আমার উপর নজরদারির দায়িত্বে আছেন? তারপর তিনি নিজের ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমরা যদি আমার এখানে ধারালো তরবারি ধরে রাখ এবং তা দিয়ে আঘাত করার পূর্বেই আমি যদি বুঝি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে শোনা

---

১৬৯. আবূ দাঊদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৬০; তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৫৮; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ. ৭৬, হাদীছ-৯২

একটি কথা আমি বলে যেতে পারবো, আমি অবশ্যই বলবো।[১৭০]

কুরআনের যে সকল আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল হাদীছে 'ইলম গোপন রাখার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলো আবূ যারের (রা) উল্লেখিত অবস্থানকে শক্তভাবে সমর্থন করে। বিশেষত: মানুষ যখন সে জ্ঞান অর্জন করতে চায়। আবূ হুরাইরা (রা) বলতেন: মানুষ বলে: আবূ হুরাইরা বেশি হাদীছ বর্ণনা করে। যদি আল্লাহর কিতাবে দু'টি আয়াত না থাকতো তাহলে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন এ আয়াত:[১৭১]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ. إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, কিভাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও তারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে, আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

অনুরূপ আরেকটি আয়াত:[১৭২]

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَ...

স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না...।

---

১৭০. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম; আল-ফাতহুর রাব্বানী, খ.১, পৃ.১৭০
১৭১. সূরা আল-বাকারা-১৫৯-১৬০
১৭২. সূরা আলে 'ইমরান-১৮৭

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৭৩]

من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.

যাকে কোন জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

من كتم علما ألجمه الله.

যে ব্যক্তি কোন জ্ঞান গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে লাগাম পরাবেন।

আসলে কথা বলা থেকে বিরত থাকে যে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের মুখে নিজে লাগাম লাগিয়ে নেয়। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো, সত্য কথন ও জ্ঞান বিতরণে যে বিরত থাকে সে মুখে লাগাম পরিহিত ব্যক্তির মত, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। মনে রাখতে হবে, এ শাস্তি সেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো ফরজ।

যেমন কোন কাফির যদি বলে, ইসলাম কী, দীন কী, তা আমাকে শিখিয়ে দিন, অথবা কেউ যদি হালাল-হারাম বিষয়ে জানতে চায়, তখন তাকে বা তাদেরকে এ সব বিষয়ে জ্ঞান দান করা তার অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি এসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুখ বন্ধ করে রাখে তাহলে সে উল্লেখিত শাস্তির অধিকারী হবে। তবে ঐচ্ছিক জ্ঞান, যা অন্যকে শেখানো অপরিহার্য নয়, সে ক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়।

অবশ্য এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন 'আলিমের পক্ষে সব সময় মানুষের সব জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, তার জন্য যে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় তা হয়তো তিনি দিতে পারেন না। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, 'আলিমের যোগ্যতা, ক্ষমতা, বিষয়ের গুরুত্ব, সেই 'আলিম ছাড়া অন্য কোন 'আলিম বিদ্যমান থাকা বা না থাকা- এসব কিছুর উপর নির্ভর করে কখন জবাব দান অবশ্য কর্তব্য এবং কর্তব্য নয়। তবে কোন 'আলিম কোন লোভ-লালসা, অথবা মানুষের ভয়ে যদি তার 'ইলম গোপন করে তাহলে হাদীছে বর্ণিত ভয়ংকর শাস্তি

---

১৭৩. আবূ দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-৩৬৫৮; তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৫১; ইবন মাজাহ্, মুকাদ্দিমা, হাদীছ-২৬১

অবশ্যই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তখন সে হবে সাক্ষ্য গোপনকারী বড় যালিম। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[১৭৪]

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ

আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে, তা যে গোপন করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পূর্ববর্তী আহলি কিতাবের 'আলিমদের এরূপ চরিত্রকে ধিক্কার দিয়েছেন এভাবে:[১৭৫]

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ.

স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না'। এর পরও তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট।

একজন 'আলিমের নিকট ফরজের অতিরিক্ত নফল তথা ঐচ্ছিক জ্ঞানও যা থাকে, তাও প্রকাশ করা তার কর্তব্য। যাতে তা প্রচার পায় এবং হারিয়ে না যায়। কারণ, তিনিও তো সেই জ্ঞান অন্য কারও কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। বিশেষত: সে জ্ঞান যদি কেউ তার কাছ থেকে পেতে চায়, তখন তার কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। এভাবে 'ইলম জীবিত থাকবে, অন্যথায় তা হারিয়ে যাবে। তবে একাজ ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে কিছু বিশেষ হাদীছ শোনেন, কিন্তু মানুষ তার সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হতে পারে, এই আশংকায় তাঁরা তাঁদের সে জ্ঞান সারা জীবন গোপন করেছেন। তবে জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের মৃত্যুর পর এ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তাঁরা অপরাধী হবেন, তাই মৃত্যুর পুর্বমুহূর্তে তা প্রকাশ করে যান। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ আইউব আল-আনসারী (রা) জীবনের অন্তিম সময়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে একটি হাদীছ শুনেছিলাম,

---

১৭৪. সূরা আল-বাকারাহ-১৪০
১৭৫. সূরা আলে 'ইমরান-১৮৭

এতদিন তা প্রকাশ না করে গোপন রেখেছি। এখন আমি তোমাদেরকে তা বলে যাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি:[১৭৬]

لو لا أنكم تذ نبون لذهب الله بكم وخلق خلقا يذ نبون فيغفر الله لهم.

তোমরা যদি পাপ না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উঠিয়ে নেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কিছু সৃষ্টি করবেন যারা পাপ করবে, অত:পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

এরূপ আরেকটি হাদীছ আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে মু'আয ইবন জাবাল (রা)ও সওয়ার ছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ইয়া মু'আয ইবন জাবাল' বলে ডাক দেন এবং মু'আযও (রা) 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাজির, বলে সাড়া দেন। এভাবে তিনবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাক দেন এবং মু'আয সাড়া দেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

ما من أحد يشهد أن لاإله إلا الله و أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.

তোমাদের মধ্যে যে কেউ সঠিক অন্ত:করণে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের জন্য তাকে স্পর্শ করা হারাম করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী শুনে মু'আয (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এ কথা মানুষের নিকট প্রচার করে দেব না, যাতে তারা শুনে খুশী হয়? বললেন: তাহলে তারা (সব 'আমল ছেড়ে) শুধু এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে। 'ইলম গোপন করা হবে, এই অপরাধ বোধ থেকে মু'আয (রা) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মানুষের নিকট তা প্রকাশ করে যান।

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মত তাঁদের শিষ্য-শাগরিদগণ এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও ছিলেন 'ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদানে অতি উৎসাহী। তাঁদের প্রচেষ্টায়ই 'ইলম তৎকালীন বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

---

১৭৬. মুসলিম, কিতাবুয যুহ্দ ওয়াত তাওবা, হাদীছ-২৭৪৮; তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, হাদীছ-৩৫৩৩

'ইলম হাসিলের জন্য কেউ যদি তাদের নিকট না আসতো তখন তারা ভীষণ কষ্ট পেতেন, পৃথিবী যেন তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে যেত। তাঁরা তখন তাঁদের অবস্থান স্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আতা' (রহ) বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম: আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন: কেউ আমাকে কোন কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে না। সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 'আস্কালান গেলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করলেন: কিন্তু কেউ তাঁর কাছে কিছু জানার জন্য আসলো না। তখন তিনি বললেন:

أكروا لى (أى راحلة) لأخرج من هذا البلد. هذا بلد يموت فيه العلم.

তোমরা আমার জন্য বাহন ভাড়া কর। আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাব। এ এমন শহর যেখানে 'ইলমের মৃত্যু ঘটবে।

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন, শিক্ষাদানের মর্যাদা লাভ ও দুনিয়াতে 'ইলম রেখে যাওয়ার প্রচন্ড আগ্রহের কারণে সুফইয়ান আছ-আছরী (রহ) এমন কথা বলেন।

আমাদের আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, কোন অবস্থাতেই কি একজন 'আলিম তাঁর 'ইলম গোপন রাখতে পারবেন না? হাদীছের আলোকে এ প্রশ্নের জবাব হলো, 'আলিম ব্যক্তি কিছু মানুষের নিকট তার 'ইলম গোপন রাখতে পারবেন, যখন তিনি বুঝবেন তাদেরকে সে জ্ঞান দান করলে উপকারের চেয়ে অপকার হবে বেশি। শিক্ষার্থীরা সে জ্ঞান লাভের জন্য অনুরোধ করলেও 'আলিম ব্যক্তি তা গোপন করবেন। যেমন সাহাবী-আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:[১৭৭]

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته، و أما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দু'পাত্র (জ্ঞান) মুখস্থ করি। তার একটি আমি ছড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি যদি ছড়িয়ে দিই তাহলে এই কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে।

অর্থাৎ হত্যা করা হবে। ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ) বলেন, 'আলিমগণের

---

১৭৭. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম; বাবু হিফজিল 'ইলম, হাদীছ-১২০

মতে আবূ হুরাইরা (রা) যে পাত্রটি ছড়িয়ে দেননি, সেটি পূর্ণ ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সব হাদীছ দ্বারা যাতে পরবর্তী কালের অসৎ শাসকদের নাম, তাঁদের অবস্থা এবং তাঁদের যুগ ও সময়ের বিবরণ ছিল। আবূ হুরাইরা (রা) অনেক সময় ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের কথা বলতেন। তবে প্রাণের আশংকা থাকায় বিস্তারিত পরিচয় দিতেন না। যেমন তিনি বলতেন:

أعوذ بالله من رأس الستين، و إمارة الصبيان.

আমি ষাটের সূচনা এবং শিশুদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

মূলত: তিনি ইয়াযীদের খিলাফাতের দিকে ইঙ্গিত করতেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন। তিনি তার খিলাফাতের এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।

জ্ঞানাজর্ন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নৈতিকতা

১. জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা

মানব সন্তান কোন রকম জ্ঞান ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করে। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার মধ্যে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা এবং অজানাকে জানার আগ্রহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর মধ্যে দান করেছেন জানার জন্য যে সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োজন, তা সবই। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[১৭৮]

وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এর মাধ্যমেই মানুষ মূলত: জানতে শিখেছে। তারা শ্রবণশক্তি ও বর্ণনার মাধ্যমে, দৃষ্টিশক্তি ও অবলোকনের মাধ্যমে এবং অন্ত:করণ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সৃষ্টিজগত ও বিশ্বচরাচরের নিয়ম-রীতি জানতে ও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। জ্ঞানার্জনের এই উপায়-উপকরণগুলো আল্লাহ মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এগুলো সম্পর্কেও

১৭৮. সূরা আন-নাহল-৭৮

আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন:[১৭৯]

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـــئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً.

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কান, চোখ, অন্ত:করণ -এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

এই উপকরণগুলোর মাধ্যমে মানুষ যেমন অর্জন করতে পারে পার্থিব জ্ঞান, তেমনিভাবে পারে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে। তবে সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য তার মধ্যে প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে এবং সাথে সাথে পার্থিব নানা রকম ব্যস্ততা থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিয়ম এটাই যে, তিনি বৃষ্টির মত জ্ঞানকে মানুষের উপর বর্ষণ করবেন না; বরং জ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ আমাদেরকে এমন কথাই বলে:[১৮০]

يا أيها الناس تعلموا، إنَّما العلم با لتعلم، و الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

ওহে জনমন্ডলী: তোমরা জ্ঞানার্জন কর। শেখার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়, আর গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় চিন্তা-অনুধ্যানের মাধ্যমে। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।

'ইলম তথা জ্ঞানের সাথে একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করা একজন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কেউ 'আলিম না হলে তাকে শিক্ষার্থী হতে হবে, শিক্ষার্থী হতে না পারলে শ্রোতা হতে হবে। আর তাও হতে না পারলে উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের ভালোবাসতে হবে। এটাই হলো দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক। আবূ বাকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি:

اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك

তুমি 'আলিম হও, অথবা হও শিক্ষার্থী, অথবা শ্রোতা অথবা এদের প্রেমিক। পঞ্চমজন হয়ো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

---

১৭৯. সূরা আল-ইসরা'-৩৬।
১৮০. ফাতহুল বারী, খ.১, পৃ.১৭০।

'আতা' (রহ) বলেন: আমাকে মিস'আর (রহ) বললেন: আমাদেরকে পঞ্চম ব্যক্তির কথা বাড়িয়ে বলেছিলেন যা আমাদের কাছে নেই। আর পঞ্চমজন হলো, জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।[১৮১]

২. একজন মুসলিমের যতটুকু শেখা ওয়াজিব

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞানার্জনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। এমন কি জ্ঞানার্জনকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত হাদীছ আছে যা ছোট-বড়, বিশেষ-সাধারণ নির্বিশেষে সকলের মুখে সব সময় উচ্চারিত হতে শোনা যায়। সেটি হলো:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ.

> প্রত্যেক মুসলিম (নর ও নারী)-এর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য।[১৮২]

হাদীছে উল্লেখিত "مسلم বলতে মুসলিম নর ও নারী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের উপর কী ধরনের জ্ঞানার্জনকে ফরজ করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মনীষীদের পরস্পর বিরোধী অনেক মত দেখতে পাওয়া যায়। আল্লামা আল-মানাবী সেই মতগুলির সংখ্যা বিশটি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকে তার নিজের মতের স্বপক্ষে যেমন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তেমনি অন্যদের মতকে খণ্ডনও করেছেন।

ধর্মতত্ত্ববিদগণ হাদীছে উল্লেখিত 'ইলম' দ্বারা ধর্মতত্ত্বকেই বুঝেছেন। কারণ, ধর্মতত্ত্বই হলো 'ইলমুত তাওহীদ' যা ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি। সুতরাং এ জ্ঞানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ফকীহ্গণ বলেন 'ইলমুল ফিক্হ-এর কথা। কারণ, এর দ্বারা হালাল-হারাম সম্বন্ধে জানা যায়। একজন মুসলিম এই জ্ঞান দ্বারা জানতে পারে কিভাবে সে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, কিভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার ও আদান-প্রদান করবে। তাদের মতে হাদীছে এই 'ইলমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তেমনিভাবে মুফাস্সিরগণ 'ইলমুত তাফসীর, মুহাদ্দিছগণ 'ইলমুল হাদীছ, ব্যাকরণবিদগণ 'ইলমুল 'আরাবিয়্যা (আরবী ভাষাবিজ্ঞান) এবং সূফীগণ 'ইলমুত তাসাউফের কথা বলেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

আমরা মনে করি একজন মুসলিমের দীন ও দুনিয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞান না থাকলে চলে

---

১৮১. মাজমা' আয যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ.১৩২

১৮২. প্রাগুক্ত

না ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। দীনের জন্য তার নিম্নে উল্লেখিত বিষয় ও পরিমাণ শরী'আতের জ্ঞান থাকতে হবে:

১. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শিরক-কুসংস্কার মুক্ত সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাস ধারণ করা যায়।
২. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শরী'আতের বিধি-বিধান মেনে বাহ্যত নির্ভুলভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের 'ইবাদাত করা যায়।
৩. যতটুকু জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা যায়। তা এভাবে যে ভালো গুণগুলো জানবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করবে, আর খারাপ দোষগুলো জানবে, আর তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।
৪. যতটুকু জ্ঞান থাকলে একজন মানুষ পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি নিজের সাথে সঠিক আচরণ করতে পারে, পাশাপাশি সে জানতে পারে কোনটি হারাম, কোনটি হালাল, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি ওয়াজিব নয় এবং কোনটি উচিত ও কোনটি উচিত নয়। এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই একজন মুসলিমের থাকতে হবে। তা সে জ্ঞান তাওহীদ, ফিক্‌হ, তাসাউফ, শরী'আতের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি নামে হোক বা যে নামেই হোক না কেন। কারণ এসব নাম ও পরিভাষা পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত। এগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো বিষয়বস্তু। সেই বিষয়বস্তু যে নামে ও যেভাবেই অবহিত হওয়া যায়, সেটাই কাম্য।

উল্লেখিত পরিমাণ দীনী জ্ঞান একজন মুসলিম নর ও নারীর অবশ্যই থাকতে হবে। বিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়মিত ক্লাসে বসে হোক বা মাসজিদের শিক্ষার আসরে বসে হোক, অথবা হোক বিভিন্ন প্রচার মিডিয়ার সামনে বসে, তাকে এ জ্ঞানটুকু অর্জন করতে হবে। প্রতিটি মুসলিম দেশের সরকারের দায়িত্ব হবে তার দেশের প্রতিটি নাগরিককে সম্ভাব্য সকল পন্থায় এতটুকু জ্ঞান দান করা। এমন কি সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও একাজ করা যায়। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তা গৃহে নিজেদের তত্ত্বাবধানে হতে পারে, অথবা হতে পারে স্কুলে, মাসজিদে ও মকতব-মাদ্রাসায় পাঠিয়ে। সন্তানদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেওয়া কোন অভিভাবকের জন্যই বৈধ কাজ হতে পারে না। বিশেষত: সন্তান যখন নিজেই শিখতে চায় তখন তাকে সবরকম সুযোগ করে দিতে হবে, কোন ভাবেই তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে:[১৮৩]

---

১৮৩. মুসনাদু আহমাদ, খ.২, পৃ.১৮৭; আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীছ-৪৯৫; আল হাকিম, আল মুসতাদরিক, খ.১, পৃ.১৯৭

مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر.

সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ করবে, আর দশ বছর হলে সালাতের জন্য তাদেরকে পিটুনি দেবে।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাত বছর বয়স থেকেই সালাত আদায় করা শিখতে হবে, তেমনিভাবে যে সাওম পালন করতে সক্ষম, তাকে সাওম পালনও শিখতে হবে। আর সালাতের শর্ত, রুকন ও আদায়ের পদ্ধতি না জানলে সঠিক ভাবে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যা অজানা থাকলে একটি ওয়াজিব কাজ সঠিকভাবে আদায় করা যায় না, তা জানাও ওয়াজিব। পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক যদি সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নাও দেন, তাহলেও যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য তা তার উপর থেকে রহিত হবে না। কারণ, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুরা সকল প্রকার জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকলেও বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবন হায্‌ম (রহ) একজন মুসলিম নর ও নারীর জন্য তাহারাত, সালাত, সাওম, খাদ্য-খাবার, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ে-শাদী, কথা ও কাজ ইত্যাদি বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক তা বর্ণনার পরে নিম্নের কথাগুলো বলেছেন:[১৮৪]

فهذا كله لايسع جهله أحدًا من الناس ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإمائهم، وفرض عليهم أن يأخذوا فى تعلم ذلك من حين بيلغون الحلم، وهم مسلمون او من يسلمون بعد بلوغهم الحلم.

এ সব কিছু থেকে কাউকে অজ্ঞ থাকার অবকাশ দেয় না। তা সে পুরুষ-নারী, স্বাধীন ও দাস-দাসী যেই হোক না কেন। তারা যখন মুসলিম অবস্থায় বয়োপ্রাপ্ত হবে, অথবা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর যখন ইসলাম গ্রহণ করবে, শিক্ষার মাধ্যমে তা জেনে নেওয়া তাদের জন্য ফরজ।

ইবন হায্‌ম আরো বলেন:

ويجير الإمام (رئيس الدولة) أزواج النساء، وسادات

১৮৪. আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম, ৩১ ৩ম পরিচ্ছেদ, আন-নাফকাতু ফিদ দীন

الأرقاء، على تعليمهم ما ذكرنا، إما بأنفسهم، وإما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك، وأن يرتب أقوامًا بتعليم الجهال.

আমরা যে জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি, ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধান মহিলাদের স্বামী ও দাসীদের মনিবদেরকে বাধ্য করবেন তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য। হয় তারা নিজেরা শিক্ষা দেবে, না হয় অন্যদের দ্বারা দেবে। এ ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহির মুখোমুখি করা ইমামের কর্তব্য, তেমনিভাবে তার কর্তব্য অজ্ঞ-মূর্খদের শিক্ষাদানের জন্য নিবেদিত একদল লোক তৈরি করা।

উল্লেখিত পরিমাণ জ্ঞান একজন মুসলিম অর্জন করবে যে ভাষা সে ভালো জানে সেই ভাষায়। তবে সালাতে যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়, ন্যূনতম ততটুকু এবং সালাতের মধ্যে যে তাকবীর, তাসবীহ্, সালাম, আযান, ইকামাত ইত্যাদি পাঠ করতে হয় তা সবই অবশ্যই আরবীতে শিখতে হবে। কারো যদি আবাসস্থলে বা নিজ দেশে শেখার সুযোগ না থাকে, তাহলে তাকে দূর-দূরান্তে অথবা বিদেশে গিয়ে হলেও শিখতে হবে।

যে কোন পরিবেশে ও যে কোন অবস্থায় একজন মুসলিমের জন্য ন্যূনতম এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। তবে অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে। একজন দরিদ্র ব্যক্তির জন্য যাকাতের বিস্তারিত বিধান জানার প্রয়োজন নেই। তবে যাকাতের সম্পদ থেকে তার জন্য কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, অথবা কি পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত দিতে হবে, সে জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। সকল প্রকার সম্পদের যাকাতের বিধান সকলের জানা অপরিহার্য নয়, বরং যে ধরনের সম্পদের নিসাব পরিমাণ মালিক হবে তা জানলেই তার কর্তব্য শেষ হবে। একজন ব্যবসায়ীকে জানতে হবে ব্যবসার জিনিসপত্র, নগদ অর্থ, বকেয়া, ঋণ ইত্যাদির যাকাতের হুকুম-আহকাম। যেমনঃ কিসে, কখন, কত পরিমাণ এবং কার জন্য ওয়াজিব ইত্যাদি। তার জন্য গবাদি পশু, যেমনঃ উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদির যাকাতের বিধান জানা অপরিহার্য নয়।

যার অর্থ-সম্পদ নেই, দৈহিক সক্ষমতাও নেই, হজ্জের বিধিবিধান জানা তার জন্য ফরজ নয়। হজ্জের বিধিবিধান সেই ব্যক্তির জন্য জানা ফরজ যার দৈহিক সুস্থতা আছে এবং আর্থিক সক্ষমতাও আছে। তখন তার জন্য ফরজ হলো হজ্জ ও 'উমরার মৌলিক বিষয়গুলো জানা। বিশেষ করে যখন সে হজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাত করবে এবং যিলহাজ্জ

মাসে প্রবেশ করবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থাকলে তাকে সেই বিষয়ে শরী'আতের হুকুম-আহকাম জানা ফরজ। যেমন একজন ব্যবসায়ীকে জানতে হবে, কোন ব্যবসা হালাল ও কোন ব্যবসা হারাম, ব্যবসায়িক লেনদেন ও আদান-প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি। যাতে সে তার অজান্তে হারাম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে অজ্ঞতা কোন কৈফিয়াত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। একজন ডাক্তারকে তার পেশার সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন মাদকদ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম, গর্ভপাত করা হারাম ইত্যাদি। আর যাদের সবসময় সফরে থাকতে হয়, যেমন: নাবিক, বৈমানিক, বিমানবালা, তাদেরকে সফরের শর'ঈ বিধান জানতে হবে।

আসল কথা হলো, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে যে বিষয়ে ও জিনিসের প্রয়োজন বোধ করবে তাকে তা শিখে নিতে হবে। আর প্রয়োজন না হলে তা শেখাও জরুরী নয়। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষ তার বিভিন্ন রকম 'ইবাদাত ও লেনদেনে প্রতি নিয়ত নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়, আর তার সব কিছুর শরঈ বিধান তার জানা থাকেনা, সেক্ষেত্রে সাথে সাথে যে জানে তার নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। এমন কি যে বিষয়টি এখনো ঘটেনি, কিন্তু খুব শীঘ্র ঘটার সম্ভবনা আছে তার হুকুমও জেনে নিতে হবে।[১৮৫] যেমন:

আল্লাহর রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[১৮৬]

...فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

> ...অতপর তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।

যে জ্ঞান অপরিহার্য তা অর্জন করা এ আয়াতে ফরজ করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের তার দীনী বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজে আইন, এতক্ষণ তা আলোচনা করা হলো। আর তার পার্থিব জ্ঞানের যতটুকু অর্জন করা অপরিহার্য তা যুগ ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হবে। যাতে একজন মুসলিম তার সমাজের জন্য একজন উপযুক্ত ও কল্যাণকর সদস্য পরিগণিত হতে পারে।

৩. যে জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফাইয়া

অনেক জ্ঞান এমন আছে যা অর্জন করা একটি দল বা গোষ্ঠীর জন্য ফরজে কিফাইয়া অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন অথবা কিছু সংখ্যক মানুষ যদি তা অর্জন করে

---

১৮৫. প্রাগুক্ত।

১৮৬. সূরা আন্ নাহল-৪৩।

তাহলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আর কেউ তা অর্জন না করলে সকলে, বিশেষতঃ দায়িত্বশীলরা অপরাধী হবে।

ইমাম ইবন হাযম বলেনঃ দীনের বিধি-বিধান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জানা, সমগ্র কুরআন শিক্ষা করা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আহকাম বিষয়ক সকল বিশুদ্ধ হাদীছ লিপিবদ্ধ ও আত্মস্থ করা, যে সকল বিষয়ে অতীতে মুসলিমদের ইজমা' হয়েছে, যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে, কে তাদেরকে শিক্ষা দিত, কে তাদেরকে কুরআন, হাদীছ ও ইজমা'র গভীর জ্ঞান দিত- এ সবকিছু জানা প্রতিটি গ্রাম, শহর, মরুভূমি অথবা দুর্গে বসবাসকারী মানুষের পক্ষ থেকে একদল লোকের উপর ফরজ। সেই সকল মানুষের সংখ্যা অনুপাতে এসব শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে।" অর্থাৎ ইবন হায্ম যে সকল জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন তা সবই অর্জন করা ওয়াজিব। যদিও তা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

ইবন হায্ম (রহ) তাঁর মতের সমর্থনে আল-কুরআনের এ আয়াত উপস্থাপন করেন:[১৮৭]

...فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা গোটা দল বা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের উপর ফরজ, তবে তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক যদি সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট বলে গৃহীত হবে এবং সকলে দায়মুক্তি লাভ করবে। তারপর ইবন হায্ম (রহ) আরো বলেছেন:[১৮৮]

و فرض على جميع المسلمين أن يكون فى كل قرية أو مدينة أوحصن من يحفظ القرآن كله، و يعلمه الناس و يقرئه إ ياهم، لأمر رسول الله صلى عليه وسلم لقراءته.

---

১৮৭. সূরা আত-তাওবা-১২২

১৮৮. আল-আহকাম ফী উসূলিল আহকাম, পৃ.৬৯০-৬৯১

সকল মুসলিমের উপর এটা ফরজ যে, প্রতিটি গ্রাম, শহর ও দুর্গে এমন কেউ থাকবে যে পূর্ণ কুরআন হিফ্য করবে, মানুষকে তা শেখাবে ও তাদেরকে তা পাঠ করে শোনাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

আসল কথা, মুসলিম উম্মাহর তাদের দীন ও দুনিয়ার জন্য বুৎপত্তিগত শর'ঈ জ্ঞানসমূহ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সবরকম জাগতিক জ্ঞান, ফরজে কিফাইয়া। জাগতিক জ্ঞান, যেমন: চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান বা এজাতীয় অন্যান্য জ্ঞান যা বর্তমান যুগে মানব সমাজের সামরিক-বেসামরিক সব শ্রেণীর প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজন পড়ে। এমন কি যে সকল জ্ঞান অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রয়োজন হয়, তাও অর্জন করা ফরজে কিফাইয়া। এতে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সমগ্র উম্মাত অপরাধী হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ কোন জ্ঞান থাকে এবং মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় সে জ্ঞান নিয়োজিত করার আহ্বান জানান, আর তার যদি বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকে, তখন ফরজে কিফাইয়া তার জন্য ফরজে আইন হয়ে যায়।

মুসলিম উম্মাহ্কে যা দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেয়, দুর্বল করার পূর্বেই তা প্রতিহত করা এবং দুর্বল করে ফেললে তা থেকে শক্ত করে তোলা যেমন অপরিহার্য কর্তব্য, তেমনিভাবে যা উম্মাহ্কে শক্তিশালী করে, স্থিতিশীল করে এবং ভেতর ও বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করে তাও অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য। যা ব্যতীত অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করা যায় না তাও অর্জন করা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইমাম আল-গাযালী ফরজে কিফাইয়া 'ইলম তথা জ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: জ্ঞানের প্রকার সমূহের উল্লেখ ব্যতীত ফরজ 'ইলম ও অন্যান্য 'ইলমের মধ্যে পার্থক্য বুঝানো যাবে না। তিনি বলেন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে 'ইলম তথা জ্ঞান দু'প্রকার: শর'ঈ 'ইলম ও জাগতিক 'ইলম। যে 'ইলম কেবল আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) মাধ্যমে লাভ করা যায় তাই শর'ঈ 'ইলম। এ জ্ঞান কোনভাবেই সেই জ্ঞানের মত নয় যা বুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায়, যেমন: অংকশাস্ত্র, অথবা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে লাভ করা যায়, যেমন: চিকিৎসা বিদ্যা; অথবা লাভ করা যায় শ্রুতির মাধ্যমে, যেমন: ভাষা। এ সকল জ্ঞান মানুষ তার বুদ্ধি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শোনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এই জাগতিক 'ইলম বা জ্ঞান আবার কয়েক প্রকারের। যেমন: কিছু প্রশংসিত, কিছু নিন্দিত ও কিছু মুবাহ। যে জ্ঞান পার্থিব বিষয়ে কল্যাণকর তা প্রশংসিত। যেমন: চিকিৎসা বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র। এই প্রশংসিত জ্ঞান আবার দু'প্রকার। এক প্রকার যা ফরজে কিফাইয়া, অন্য আরেক প্রকার যা ফরজে কিফাইয়া নয়, বরং অতিরিক্ত।

ফরজে কিফাইয়া হলো সেই 'ইলম বা জ্ঞান যা ব্যতীত পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম চলমান রাখা যায় না। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা। দৈহিক সুস্থতার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন। তেমনিভাবে অংক বিদ্যা ও পারস্পরিক লেনদেন, অসিয়াত ও উত্তরাধিকার বণ্টনের জন্য জরুরী। কোন দেশ, শহর বা জনপদ যদি এই সকল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি থেকে শূণ্য থাকে তাহলে সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষ গোনাহ্গার হবে। আর ঐ সকল জনপদের একজনও যদি এই জ্ঞান অর্জন করে তাহলে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে এবং সকলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের এ কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, চিকিৎসা ও অংকবিদ্যা অর্জন করা ফরজে কিফাইয়ার অন্তর্গত। এমন কি মৌলিক শিল্পসমূহ, যেমনঃ কৃষি, তাঁতশিল্প, রাজনীতি, এমন কি শিঙ্গা লাগানো, সূচিকর্ম শেখাও ফরজে কিফাইয়া। কোন শহর বা জনপদে যদি এ জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষ না থাকে তাহলে তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর এ জন্য তারা সকলে অপরাধী হবে। অন্যদিকে যে জ্ঞান ফরজ নয়, বরং অতিরিক্ত, যেমন অংকশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় যা না জানলেও চলে, তবে জানলে প্রয়োজনে উপকার লাভ করা যায়।

আর নিন্দিত হলো, যাদুবিদ্যা, হেঁয়ালি, ভেলকিবাজি ইত্যাদি জাতীয় তথাকথিত জ্ঞান। আর কবিতা, ইতিহাস বা এ জাতীয় জ্ঞান হলো মুবাহ্ জ্ঞান। অর্থাৎ কেউ চর্চা করলে যেমন ক্ষতি নেই, না করলেও পাপ নেই। তবে সেই কবিতা যদি হয় শালীন ও পরিচ্ছন্ন।[১৮৯]

ইমাম আল-গাযালীর (রহ) বক্তব্য অবশ্য তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে সঠিক ছিল। কারণ, আধুনিক যুগে বিভিন্ন জ্ঞান বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা ও উন্নতি হয়েছে যা মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন অংক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় যা বর্তমান যুগে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইমাম আল-গাযালী (রহ) তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে এ জ্ঞানকে নফল বা অতিরিক্ত বলেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তিনি অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান বললেও এ যুগে তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শালীন ও পরিচ্ছন্ন কবিতা চর্চা ও ইতিহাসের জ্ঞান, বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস এবং সাধারণভাবে মানবজাতির ইতিহাসের জ্ঞানকে ইমাম আল-গাযালী (রহ) নফল জ্ঞান বললেও অনেকে এ জ্ঞানকে ফরজে কিফাইয়া বলেছেন। কোন মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে পারদর্শী কেউ বা কিছু লোক না থাকলে গোটা সমাজই অপরাধী বিবেচিত হবে। কবিতাকে তো বিভিন্ন যুগের মানুষ নিজ নিজ মত-পথের প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি

---

১৮৯. ইয়াহইয়াউ 'উলূম আদ-দীন, খ.১, পৃ.১৬

ওয়া সাল্লাম) নিজেও ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে কবিতাকে ব্যবহারের কথা বলেছেন। আধুনিক যুগে ডান ও বামপন্থীদের অন্যতম হাতিয়ার হলো কবিতা। একজন মুসলিম দা'ঈকেও (আহ্বানকারী) এটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং এ জ্ঞান মুবাহ নয়, বরং ফরজে কিফাইয়া পর্যায়ের।

আমরা মনে করি, প্রতিটি মুসলিম দল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, মানববিদ্যা ইত্যাদি জাতীয় সব ধরনের জ্ঞানে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোক থাকা ওয়াজিব। যাতে তারা এ সকল জ্ঞান নিজেরা যেমন চর্চা করবেন, তেমনি ইসলামী সমাজে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের নিকট তা উপস্থাপন করতে পারবেন। বিশেষত: মানবিক ও সামাজিকবিদ্যা একটি জাতি বা গোষ্ঠীর চিন্তা ও রুচিকে সংগঠিত করে, সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে, তাই এ জ্ঞানকে মুবাহ বলে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবেনা। এ জ্ঞানকেও ফরজে কিফাইয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইমাম আল-গাযালী (রহ) যদি আমাদের এ সময়ে জীবিত থাকতেন এবং দেখতেন, কিভাবে এ সব জ্ঞানে পারদর্শী ইসলাম বিরোধী লোকেরা পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করে মুসলিম যুবকদের বোধ ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, তাহলে তিনি তাঁর মত ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। তিনিও আমাদের মতের সাথে একমত হতেন। কারণ, প্রত্যেক যুগেরই যেমন বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তেমনি থাকে সেই উপযোগী বিধি-বিধান।

৪. নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা

একজন শিক্ষার্থী বিশেষ করে শর'ঈ জ্ঞানের শিক্ষার্থীর নিকট সর্বপ্রথম যা আশা করা হয়, তা হলো তার নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা। আর তা এই যে, সে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে চেষ্টা-সাধনা করবে এবং তার জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের নাজাত ও মুক্তি। কোন ভাবেই তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য 'আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করা, নির্বোধ-মূর্খদের উপর গর্ব-অহংকার করা, নিজেকে বিত্তশালীদের সমপর্যায় করা, আমীর 'উমারার তোষামোদ ও চাটুকারিতা করা, সম্পদ অর্জন, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া বা এজাতীয় অন্য কোন কিছু যা এ পার্থিব জীবনে মানুষ একান্তভাবে পাওয়ার আশা করে, এমন কোন কিছু হবে না। এটা জাগতিক জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে বৈধ হলেও কোনভাবেই পরকালীন জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে বৈধ নয়। আখিরাতের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর হৃদয়-মন পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং একান্তভাবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

সহীহ্ হাদীছে এসেছে, তিন প্রকারের মানুষের রিয়া বা প্রদর্শনীমূলক মনোভাব তাদের সৎ 'আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেবে এবং নিষ্ঠাবান সত্যবাদীদের দিওয়ান থেকে তাদের নাম মুছে ফেলে মিথ্যাবাদী রিয়াকারদের দিওয়ানে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করাবে। কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন সর্বপ্রথম তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত করবে। তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করলো, সে জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিল। কুরআন পড়লো, তার ভাব-সম্পদ অবগত হলো এবং তা মানুষকে অবহিত করলো। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন: দুনিয়াতে তুমি কী করেছো? সে বলবে: আমি বিদ্যা শিক্ষা করেছি এবং তা মানুষকে শিখিয়েছি। তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এজন্য বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যে, মানুষ তোমাকে একজন 'আলিম (জ্ঞানী) বলবে, আর কুরআন এজন্য পড়েছিলে যে, মানুষ তোমাকে একজন কারী (পাঠক) বলবে। তোমাকে তো তা বলা হয়েছে। অত:পর আল্লাহ নির্দেশ দেবেন এবং উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৯০]

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك، فالنار النار.

তোমরা এজন্য জ্ঞান অর্জন করবে না যে, তা দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, নির্বোধ লোকদের সাথে তর্ক করবে এবং বৈঠকে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যে এমন করবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারীমূলক আরো কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো:[১৯১]

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن ناسًا من أمتى سيتفقّهونَ فى الدين

---

১৯০. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.২১, হাদীছ-২১
১৯১. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৮৩, হাদীছ-১০৬

يقرءون القران يقولون نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزٌ لهم بديننا ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلاَّ الشوكُ، كذلك يجتنى من قربهم إلاَّ الخطايا.

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক সময় আমার উম্মাতের কিছু লোক ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হবে। তারা আল-কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং বলবে: আমরা শাসকদের সাথে মেলামেশা করবো। তারা যে পার্থিব সম্পদ অর্জন করেছে তার অংশও পাবো, আবার আমরা যে দীনদারী অর্জন করেছি, তার বলে তাদের কাছ থেকে বাড়তি সম্মানও পাবো। অথচ আসলে তারা সেটা পাবে না। কাঁটাযুক্ত গাছের কাছে যেতে যেমন কাঁটার খোঁচা খেতে হয়, তেমনি তারা শাসকদের কাছ থেকে পাপ ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৯২]

بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة و الدين و التمكين فى الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآخرة من نصيب.

আমার উম্মাতকে জানিয়ে দাও যে, তাদেরকে প্রভূত ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, বিজয়, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৃথিবীতে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি দান করা হবে। যারা এগুলির সাহায্যে পার্থিব স্বার্থের লোভে আখিরাতের কাজ করবে, সে আখিরাতের প্রতিদান থেকে কোনই অংশ পাবে না।

ইবন মাস'উদ (রা) বলেন: তোমাদের তখন কেমন অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং তার মধ্যেই ছোটরা বড় হবে, বড়রা বৃদ্ধ হবে। বছর ব্যাপী চলতে থাকবে। একদিন একটু পরিবর্তন হলে বলা হবে, এ দিনটি গতকালের চেয়েও খারাপ। প্রশ্ন করা হলো: এমন সময় কখন আসবে? বললেন:[১৯৩]

---

১৯২. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২২, হাদীছ-২২
১৯৩. আর রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.১০১

إذا قلت أمناؤكم، وكثرت أمر اؤكم، و قلت فقهاؤكم، و كثرت قراؤكم.. و تفقه لغير الدين، و التمست الدنيا بعمل الآخرة.

যখন তোমাদের বিশ্বস্ত লোকের সংখ্যা কমে যাবে, আমীর-উমারার সংখ্যা বেড়ে যাবে, তোমাদের ফকীহ্দের সংখ্যা কমে যাবে এবং কারীদের (কুরআন-পাঠক) সংখ্যা বেড়ে যাবে... দীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং আখিরাতের 'আমল দ্বারা পার্থিব স্বার্থ চাওয়া হবে।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৯৪]

من تعلم علما مِما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أى ريحها

যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করেছে, যা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অবকাশ রয়েছে, অথচ সেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবল পার্থিব কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে সেই জ্ঞান অর্জন করেছে, সে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

যে কোন মানুষের জন্য এ এক মহা ক্ষতি যে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, শুধু তাই নয়, বরং জান্নাতের সুগন্ধি থেকেও বঞ্চিত হবে। যে সুগন্ধি বহু বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। তবে হাদীছের ভাষা দ্বারা বুঝা যায়, সেই চরম হতভাগা তারাই হবে যাদের জ্ঞানার্জনের পেছনে পরকালীন প্রাপ্তির কোন উদ্দেশ্যই থাকবে না। যেমন হাদীছে এসেছে:

لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا.

কেবল পার্থিব কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া সে জ্ঞানার্জন করে না।

এর অর্থ হলো, কেউ যদি আখিরাতে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে এবং সেই সাথে দুনিয়াতেও কিছু পাওয়ার আশা করে সে এই শাস্তির আওতায় পড়বে না। তার ব্যাপারটি হবে সেই হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির মত যে হজ্জ আদায়ের পাশাপাশি কিছু

---

১৯৪. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮২, হাদীছ-১০৪

ব্যবসাও করে থাকে। এ ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) দ্বিধা-সংকোচ করতে থাকেন তখন নাযিল হয়:[১৯৫]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ...

তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই...।

জ্ঞানার্জনকারীর আসল উদ্দেশ্য যা ছিল তার উপর ভিত্তি করেই তার বিচার হবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য কি আখিরাত ছিল, না দুনিয়া? তাছাড়া 'আলিমগণ একথাও বলেছেন যে, একাগ্র চিত্তে আখিরাতের কাজ করার জন্য যে দুনিয়ার কিছু গ্রহণ করে এবং দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে আখিরাতের কাজ করে, এ দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

যে ব্যক্তি তার 'ইলম দ্বারা দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্য করেছে, হাদীছে তার নিন্দা করা হয়েছে। তবে এই উদ্দেশ্য ছাড়াই দুনিয়া যার হাতে এসে গেছে, হাদীছে তাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। যেমন আল্লাহ নিন্দা করছেন তাদেরকে যারা:[১৯৬]

...طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

তিনি আরো নিন্দা করেছেন সেই সব লোকদের:[১৯৭]

...مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

...যে আমার স্মরণে বিমুখ হয় এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

তেমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই সব লোকদের বিপরীতে:[১৯৮]

مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ...

যারা মু'মিন অবস্থায় আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

-এদের নিন্দা করেছেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ

যারা আশু সুখ-সম্ভোগ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করে।

---

১৯৫. সূরা আল-বাকারা-১৯৮
১৯৬. সূরা আন-নাযি'আত-৩৭-৩৮
১৯৭. সূরা আন-নাজম-২৯
১৯৮. সূরা আল-ইসরা-১৮-১৯

এ দুনিয়া ও তার অর্থ-বিত্ত সত্তাগতভাবে নিন্দিত নয়। আর যদি নিন্দিতই হতো তা হলে মুসলিম উম্মাহ্র বহু বড় বড় ইমাম ও 'আলিম তাঁদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিত্তশালী হলেন কিভাবে? যেমন লাইছ ইবন সা'দ, আবূ হানীফা (রহ) ও আরো অনেকে। শুধু তাই নয়, উঁচু পর্যায়ের বহু সাহাবী বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলেন। যেমন 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ, 'উছমান ইবন 'আফ্ফান, তালহা, যুবায়র (রা) প্রমুখ। উল্লেখিত সাহাবীদের সকলেই ছিলেন 'আশারা মুবাশ্শারা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্তর্ভুক্ত। এমন কি অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) অনেকেই ছিলেন বিশাল সম্পদ ও রাজত্বের মালিক। যেমন ইউসুফ (আ), দাউদ (আ) ও সুলায়মানকে (আ) আল্লাহ তা'আলা নুবুওয়াত ও রাজত্ব দান করেন।

হাদীছে দুনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, আখিরাতের 'আমল দ্বারা ও আখিরাতের 'ইলম দ্বারা তা প্রাপ্তির চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শর্তযুক্ত করেছেন এভাবে:

علم يبتغى به وجه الله تعالى

যে 'ইলম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা যায়।

আর সেই 'ইলম তথা জ্ঞান হলো দীনী 'ইলম। আর সত্তাগতভাবে দুনিয়া কিভাবে নিন্দিত হতে পারে? কারণ, সহীহ্ হাদীছে এসেছে:[১৯৯]

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের সম্পদই হলো সবচেয়ে ভালো সম্পদ।

দুনিয়া নিন্দিত হয় কিভাবে? দুনিয়া তো আখিরাতের ক্ষেত্র। এখানে যে যেমন ফসল ফলাবে, আখিরাতে সে তা ভোগ করবে। তাই হাদীছটির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হাদীছ বিশেষজ্ঞ মুল্লা 'আলী আল-কারী (রহ) বলেন:[২০০]

أفهم الحديث أن من أخلص قصده فتعلم لله، لايضره حصول الدنيا من غير قصدها بتعلمه، بل من شأن الإخلاص بالعلم، لأن تأتى الدنيا لصاحبه راغمة، كما ورد : من كان همه الآخرة، جمع الله شمله، وجعل غناه فى قلبه، وتأتيه الدنيا وهى راغمة.

---

১৯৯. মুসনাদু আহমাদ, খ.১, পৃ.১৯৭
২০০. আল-মিরকাত শারহু মিশকাত, খ.১, পৃ.২৩৮

হাদীছ একথা বলছে যে, যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর জন্য শিখবে, তার শিক্ষা দ্বারা দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া পেয়ে গেলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। বরং 'ইলমের সাথে সততার পরিণতিই হলো, সেই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট দুনিয়া এমনিই চলে আসবে। যেমন বলা হয়ে থাকে: আখিরাত যার একান্ত কাম্য হয়, দুনিয়ার পোশাকও আল্লাহ তার জন্য সংগ্রহ করে দেন। আল্লাহ তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি উপেক্ষার ভাব সৃষ্টি করে দেন, আর দুনিয়া আনুগত্যের সাথে তার নিকট চলে আসে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী পূর্ব থেকেই কোন রকম নিয়্যাত ও উদ্দেশ্য ছাড়াই জ্ঞানার্জনে লিপ্ত হয়। সেখানে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছারও কোন অধিকার থাকে না। বরং তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তাদেরকে স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠায়, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পড়তে বাধ্য করে। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থী পছন্দ করুক বা না করুক তার আবাস স্থলের নিকটে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে পড়তে বাধ্য হয়। এক সময় সে যখন বড় হয়, বুঝতে শেখে তখন সে নিজেকে কোন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে দেখতে পায়। এ ধরনের শিক্ষা মূলত: নিয়্যাত ছাড়াই হয়ে থাকে। কারণ, শিক্ষার্থীকে এ শিক্ষা নিতে বাধ্য করা হয়েছে, তার বিষয় নির্বাচনের কোন এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। আর এখতিয়ার ছাড়া নিয়্যাত হয় না।

এমন অবস্থায় যার ভাগ্যে দীন ও শরী'আতের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ঘটেছে, তাদের উচিত হবে নতুন করে নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করা এবং আগ্রহ-উৎসাহকে সঠিক ধারায় চালিত করা। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানের ছায়াতলে সত্যপন্থী জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য তার নিয়্যাত পরিশুদ্ধি করণে এবং ইচ্ছা-উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অতীতের অনেক মুসলিম মনীষীর ক্ষেত্রে এমন হয়েছে। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ মুজাহিদ (রহ) বলেন:[২০১]

طلبنا هذا العلم و ما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية.

আমরা এই 'ইলম অর্জন করেছি, অথচ এ ব্যাপারে আমাদের বড় কোন ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছিল না। অত:পর আল্লাহ আমাদেরকে নিয়্যাত তথা ইচ্ছা-অভিপ্রায় দান করেন।

---

২০১. সুনান আদ্ দারিমী, খ.১, পৃ.৮৫

তাবি'ঈকুল শিরোমনি হাসান আল বাসরী (রহ) বলেন :[২০২]

لقد طلب أقوام العلم ما أرادوابه الله ولا ما عنده، قال: فما زال بهم العلم حتى أراد وابه الله وما عنده.

বহু মানুষ জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, কিন্তু তারা সেই জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ ও তার কাছে যে প্রতিদান আছে তা প্রাপ্তির আশা করেনি। অত:পর তারা জ্ঞান চর্চার মধ্যে থাকার কারণে, সেই জ্ঞান দ্বারা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার নিকট যে প্রতিদান আছে তা প্রাপ্তির আশা করেছে।

ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন:[২০৩]

طلبنا العلم للدنيا، فجر نا إلى الآخرة.

আমরা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করেছি। অত:পর আমরা আখিরাত প্রাপ্তির দিকে চালিত হয়েছি।

মা'মার (রহ) বলেন:

إن الرجل ليطلب العلم لغير الله، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله.

একজন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে। অত:পর সেই জ্ঞান তার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। অবশেষে সে জ্ঞান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে যায়।

৫. অবিরামভাবে জ্ঞানার্জন

জ্ঞান এমন এক সাগর যার কোন স্থিরতা নেই, নেই কোন কুল-কিনারা। এর অন্বেষণকারী যত গভীরে যাবে, তার সামনে এর নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং যে সকল নিদর্শন গোপন ছিল তা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন দেখা দেবে অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন। এ কারণে জ্ঞানের ধারক-বাহকদের জন্য অপরিহার্য যে, ক্রমাগতভাবে তারা তাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাবেন। আমরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করবেন। কারণ, জ্ঞান সব সময় নতুনত্ব ও উন্নতির প্রত্যাশী। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২০২. প্রাগুক্ত
২০৩. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.২, পৃ.২৮

যে নির্দেশ দিয়েছেন তার পরে এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বলেন:[২০৪]

...وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

...এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।

আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট নবী মূসা ('আলাইহিস সালাম)-এর জ্ঞান অন্বেষণের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মূসার (আ) যে জ্ঞান ছিল না তা অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা খিজিরের (আ) নিকট যান দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে। এ কারণে, কাতাদাহ (রহ) বলেন :

لو كان أحد يكتفى من العلم بشئ لاكتفى موسى عليه السلام.

জ্ঞানের কিছু অংশ লাভ করে কারো যদি তুষ্ট থাকা উচিত হয়, তা হলে মূসা (আ) অবশ্যই তুষ্ট থাকতেন।

কিন্তু আল-কুরআন আমাদেরকে খিজিরের (আ) নিকট মূসার (আ) আবেদনটি শোনাচ্ছে এভাবে:[২০৫]

...هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

...সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এই শর্তে আমি কি আপনার অনুসরণ করবো?

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিমদের মাঝে নিম্নের এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ বাণীর ব্যাপক প্রচার ঘটেছিল:

أطلب العلم من المهد إلى اللحد.

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।[২০৬]

এমনি ধরনের আরেকটি বাণী:

لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل.

---

২০৪. সূরা তাহা-১১৪

২০৫. সূরা আল-কাহ্ফ-৬৬

২০৬. এ কথাটি প্রখ্যাত তাবি'ঈ সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনার (রহ)। এটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন হাদীছ নয়, যেমন অনেকে মনে করেছে। (আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.১০৪)

যতক্ষণ মানুষ জ্ঞান অন্বেষণ করবে ততক্ষণ জ্ঞানী থাকবে। আর যখন সে ধারণা করবে, সে জ্ঞানী হয়েছে তখন সে মূর্খ হয়ে যাবে।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন:

منهومان لا تنقضى نهمتهما: طالب علم، و طالب دنيا.

দু'ধরনের লোভী আছে যাদের লোভের কোন শেষ নেই: জ্ঞান অন্বেষণকারী, দুনিয়ার প্রত্যাশী।

'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে (রহ) একবার বলা হলো: আপনি আর কতদিন পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করবেন? বললেন: حتى الممات إن شاء الله "ইন্‌শাআল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত।"

আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা'কে (রহ) জিজ্ঞেস করা হলো: একজন মানুষের কতদিন পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করা ভালো? বললেন: জীবন যতদিন তার সাথে ভালো আচরণ করে। সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাকে (রহ) জিজ্ঞেস করা হলো: জ্ঞান অন্বেষণ করার সর্বাধিক প্রয়োজন কার? বললেন: সবচেয়ে বড় জ্ঞানী যিনি, তার। কারণ, তার ভুল সবচেয়ে বেশি দোষণীয়। খালীফা আল-মা'মূনকে একবার প্রশ্ন করা হলো: বৃদ্ধদের শিক্ষা গ্রহণ করা কি ভালো? বললেন: অজ্ঞতা যদি তাদের জন্য দোষ হয় তাহলে জ্ঞানার্জনও তাদের জন্য শোভন হবে। মালিক ইবন আনাস (রহ) বলেন:

لا ينبغى لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم.

যার নিকট জ্ঞান আছে তার জ্ঞানার্জন ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।[২০৭]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই হলো একজন মুসলিমের কর্ম পদ্ধতি: জ্ঞানের সমৃদ্ধির লোভ, নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জনে তৃপ্ত ও তুষ্ট না হওয়া, জ্ঞানের প্রতি বিমুখ না হওয়া, বার্দ্ধক্য তার জ্ঞান অন্বেষণে প্রতিবন্ধক না হওয়া।

মুসলিম উম্মাহ্‌র অগ্রবর্তী মনীষীগণ এ ব্যাপারে এতই আগ্রহী ছিলেন যে, কম-বেশি কিছু জ্ঞান সংগ্রহ ব্যতীত যেন তাদের একটি দিনও অতিবাহিত না হয়। তেমন হলে তারা সে দিনটিকে ব্যর্থতার ও ক্ষতির দিন বলে গণ্য করতেন। তাঁদের অনেকে এ কথা বলতেন:

إذا أتى على يوم لم أزدد فيه علما يقربنى من الله عز

২০৭. উল্লেখিত আছার বা বর্ণনাগুলো 'জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.১১৪-১১৫ থেকে সংকলিত

وجل فلابورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم.

আমার জীবনে একটি দিন এলো, আর আমি সে দিনটিতে আমাকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে এমন কিছু 'ইলমের বৃদ্ধি ঘটালাম না, তাহলে সেই দিনের সূর্যোদয়ে আমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন, অনেকে উপরোক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে বর্ণনা করেছেন। আসলে তা সঠিক নয়। বরং কোন সাহাবী অথবা তাবি'ঈর কথা। এ ধরনের কথা একজন আরব কবিও বলেছেন তাঁর নিম্নের শ্লোকটিতে:

إذا مر بى يوم و لم أستفد هدى + ولم أكتسب علما فما هومن عمرى.

আমার জীবন থেকে যদি একটি দিন অতিক্রম করে, এবং আমি কোন পথনির্দেশ লাভ করলাম না, কিছু জ্ঞানও অর্জন করলাম না, তাহলে সে দিনটি আমার জীবনের অংশ নয়।[২০৮]

'আলী (রা) একবার একটি ভাষণে বলেন:

و اعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدركل امرئ ما يحسن، فتكلموا فى العلم تتبين أقدا ركم.

জেনে রাখ, মানুষ সৎ কর্মশীল। প্রত্যেকটি মানুষের মর্যাদা তার ভালো কাজের মধ্যে। তোমরা জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলো, তোমাদের মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নের এ কথাটির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোন কথা নেই:

ما ترك الأول للآخر شيئا.

পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কোন কিছুই ছেড়ে যাননি।[২০৯]

৬. জ্ঞান অন্বেষণে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

ইসলাম শিক্ষার্থীকে যে আদব বা আচরণ শিক্ষা দেয় তার একটি হলো, তার অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, তাকে জ্ঞানের জন্য কষ্ট সহ্য করতে হবে, দিনের ক্লান্তি

---

২০৮. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.১০৫
২০৯. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.১১৯

রাতের জাগরণের সাথে মেলাতে হবে এবং জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ ও প্রবাস জীবনের যে কষ্ট তা সহ্য করতে হবে।

নবী মূসা (‘আলাইহিস সালাম) জ্ঞানার্জনের জন্য বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে খিজিরের (আ) নিকট গিয়েছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তা আল-কুরআনে এবং রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল-হাদীছে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কোন শিক্ষার্থীর তা অজানা থাকার কথা নয়। মূসার (আ) অভিব্যক্তি আল্লাহ উপস্থাপন করেছেন এভাবে:[২১০]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.

স্মরণ কর, যখন মূসা তার সাথীকে বললো, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামবো না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

মূসা (আ) ও তাঁর সাথী যে কত পথ পাড়ি দিয়েছিলেন তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। তাঁরা যে কত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন সে ব্যাপারে মূসার (আ) অভিব্যক্তি আল্লাহ উপস্থাপন করেছেন এভাবে:[২১১]

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا.

যখন তারা আরো অগ্রসর হলো মূসা তার সাথীকে বললো, আমাদের সকালের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

তাঁরা তাঁদের গন্তব্য স্থল অতিক্রম করে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন, তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য, যে কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্যের প্রয়োজন এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা মানুষকে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচাতো ভাই প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্যের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে:[২১২]

طلبت العلم، فلم أجده أكثر منه فى الأنصار، فكنت

---

২১০. সূরা আল-কাহ্ফ-৬০
২১১. প্রাগুক্ত-৬২
২১২. সুনান আদ-দারিমী, খ.১, পৃ.১১৪

أتى الرجل فأسئل عنه، فيقال لى : نائم، فأتوسد ردائى ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر، فيقول : متى كنت ههنا يا ابن عم رسول الله، فأقول : منذ زمن طويل، فيقول : بئسما صنعت، هلا أعلمتنى؟ فأقول : أردت أن تخرج إليَّ وقد قضيتَ حاجتك.

আমি জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি তা আনসারদের চেয়ে অন্য কারো নিকট বেশি পাইনি। আমি কারো বাড়িতে গিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। আমাকে বলা হতো: তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি আমার চাদর মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়তাম। অবশেষে তিনি জুহরের সময় বের হতেন। আমাকে দেখে বলতেন: ওহে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছেন? আমি বলতাম: অনেকক্ষণ। তিনি বলতেন: আপনি ঠিক করেননি, আমাকে কেন জানান নি? আমি বলতাম: আমি চেয়েছি, আপনি আপনার কাজ শেষ করে আমার কাছে আসুন।

ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁর এমন আচরণের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলতেন: আমি একজন শিক্ষার্থীকে হেয় করেছি, কিন্তু কাঙ্খিত ব্যক্তি ও বিষয়কে সম্মানিত করেছি।

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ আইউব আল-আনসারী (রা) মাদীনায় অবস্থানকালে একটি সনদে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদীছটি শোনেন:

من ستر مؤمنا فى الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة.

কেউ যদি দুনিয়াতে কোন মু'মিন ব্যক্তির বিপদ-আপদে ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাকে রক্ষা করবেন।

এই সনদে প্রথম সূত্র ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী 'উকবা ইবন 'আমির (রা)।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে হাদীছটি যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল 'উকবা ছাড়া আর কেউ তখন জীবিত ছিলেন না। তাই আবূ আইউব (রা) 'উকবার (রা) মুখ থেকে হাদীছটি শোনার জন্য মিসর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি 'উকবার (রা) বাসস্থানে যান এবং তাঁর মুখ থেকে হাদীছটি শোনার পর একটুও বিলম্ব না করে আবার বাহনের পিঠে আরোহণ করে মাদীনার দিকে যাত্রা করেন।[২১৩]

---

২১৩. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাতি ফিল ইহতিজাজ বিস সুন্নাহ্, পৃ.৩৭-৩৯

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমি জনৈক সাহাবীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীছ শুনি, যা আমি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। তাই সরাসরি সেই প্রথম সূত্রের মুখ থেকে হাদীছটি শোনার জন্য আমি একটি উট কিনলাম এবং তার পিঠে সাওয়ার হয়ে একাধারে একমাস ভ্রমণের পর শামে পৌঁছলাম। দেখলাম সেই ব্যক্তি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস আল-আনসারী (রা)। আমি তাঁকে সেই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে হাদীছটি শুনেছি।[২১৪]

এরকম ঘটনা ইতিহাসে আরো অনেক দেখা যায়। একটি মাত্র হাদীছের প্রথম তথা উচ্চতর সূত্রে পৌঁছার জন্য অনেক সাহাবী উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে দিনের পর দিন ভ্রমণ করেছেন। তাবি'ঈদের মধ্যেও এ ধরনের ভ্রমণের অনেক ঘটনা হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলতেন, আমি একটি মাত্র হাদীছের সন্ধানে বহুদিন ও বহু রাত্রির পথ অবশ্যই পাড়ি দেব।[২১৫]

একবার ইমাম শা'বী (রহ) এক ব্যক্তিকে একটি হাদীছ শুনিয়ে বলেন, এটিই গ্রহণ কর। এক সময় মানুষ এর চেয়ে সামান্য জ্ঞানের জন্য মাদীনায় চলে যেত। উল্লেখ্য যে, শা'বী (রহ) তখন ইরাকের কূফা নগরীতে ছিলেন। তিনি আরো বলেন:[২১৬]

لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن
ليسمع كلمة حكمة، مارأيت أن سفره قد ضاع.

যদি কোন ব্যক্তি একটি মাত্র জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার জন্য শামের প্রান্ত-সীমা থেকে ইয়ামানের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ভ্রমণ করে, আমি মনে করিনা তার সে ভ্রমণ ব্যর্থ হয়েছে।

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিমরা, বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণ যে পরিমাণ ভ্রমণ করেছেন, তার কোন নজীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। কেউ যদি শাফি'ঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল, আল বুখারী, মুসলিম (রহ) প্রমুখ ইমামের শিক্ষা-সফরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে তা হলে সে জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁরা যে কতখানি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অবগত হতে পারবে।

তাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণে রাতের ঘুম ও দিনের বিশ্রাম ত্যাগ করেছেন এবং কোন রকম বিরক্তি ও অসন্তোষ ছাড়াই নানা রকম প্রতিকূলতা ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁরা

---

২১৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ্, (বি.আই.সি, ঢাকা) পৃ.৯৭।
২১৫. মিফতাহুল জান্নাহ্, পৃ.৪১
২১৬. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, বাবুর রিহ্‌লাহ্ ফী তালাবিল 'ইলম

তাঁদের মহান শিক্ষকদের মুখ থেকে এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনেছিলেন :

لا ينال العلم براحة الجسم.

শরীরকে আরামদায়ক অবস্থায় রেখে জ্ঞান অর্জিত হবে না।

ইমাম মালিক (রহ) বলতেন: যতক্ষণ ক্ষুধা ও দারিদ্রের স্বাদ আস্বাদন না করবে, এ বিষয়টি অর্জন করা যাবে না। জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে রাবী'আ (রহ) যে কী পরিমাণ অভাবের মধ্যে পড়েন তা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর ঘরের ছাদের কড়িকাঠ বিক্রি করতে বাধ্য হন। এমন কি বাজারের ডাস্টবিন থেকে কিসমিসের পরিত্যাক্ত অংশ ও ফলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

শু'বা (রহ) তাঁর ছাত্র ও সংগী-সাথীদেরকে বলতেন:

ليبلغ الشاهد منكم الغائب.

তোমাদের মধ্য থেকে যারা উপস্থিত আছে তারা অবশ্যই অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছাবে।

একথা বলে যিনি জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন, তিনিই দারিদ্রকে উত্তরাধিকার করে গেছেন। আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সাহনূন বলে গেছেন:

لا يصلح العلم لمن يأ كل حتى يشبع.

জ্ঞান তার উপযুক্ত নয় যে উদরপূর্তি করে খায়।[২১৭]

জ্ঞানার্জনের জন্য কেবল দেহকে কষ্ট দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পার্থিব নানা রকম ব্যস্ততা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড কমিয়ে জ্ঞানের প্রতি একাগ্র ও মনোযোগী হওয়া। কারণ, একজন মানুষের হৃদয়-মন একটি। সেখানে একই সাথে একাধিক বিষয় স্থান পেতে পারে না। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:[২১৮]

مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ...

আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি...।

চিন্তা বিক্ষিপ্ত হলে সত্য অনুধাবন করতে অক্ষম হবে। এ জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে গেছেন ঃ "জ্ঞান তোমাকে তার কিছু অংশ দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার

---

২১৭. প্রাগুক্ত, বাবুল হাদ্দি'আলা ইসতিকামাতিত তালাবি ওয়াস সাবরি 'আলাল আযা

২১৮. সূরা আল-আহযাব-৪

সবটুকু দেবে। যখন তুমি তাকে তোমার সবটুকু দেবে, অত্যন্ত ধীরে, সতর্কতার সাথে সে তার কিছু অংশ তোমাকে দেবে।"

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন: বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিন্তা হলো সেই খালের মত যার পানি ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মাটি শুষে নেয়, কিছু বাতাসে টেনে নেয়। জমে থাকা এবং ক্ষেত পর্যন্ত পৌঁছার মত তেমন কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

জ্ঞানের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ রকম এবং জ্ঞান অন্বেষণে তাঁদের জীবনও ছিল এমনই। তাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। সত্যকে জানার আনন্দ তা অর্জনের কষ্টকে ভুলিয়ে দিত।

একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে কাঙ্খিত ও প্রশংসিত ধৈর্য এমন হওয়া উচিত যে, সে তার শিক্ষকের সকল কঠোরতা সহ্য করবে, রেগে গেলে বিনয়ের সাথে চুপ থাকবে। শিক্ষক যখন কথা বলতে চাইবেন না, চুপ থাকবেন, তখন তাঁর এই চুপ থাকার প্রতি সম্মান দেখাবে। এক্ষেত্রে নবী মূসার (আ) ধৈর্যই হলো উত্তম দৃষ্টান্ত। মূসার (আ) এই কঠিন ধৈর্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আল-কুরআনে বর্ণিত খিজিরের (আ) সাথে তাঁর সংলাপটির মধ্যে:

সেই সংলাপটি এরকম :[২১৯]

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.

মূসা তাকে বললো, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করবো কি? সে (খিজির) বললো, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে? মূসা বললো, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য

---

২১৯. সূরা আল-কাহ্ফ-৬৬-৭০

করবো না। (খিজির) বললো, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তাহলে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।

আল-কুরআনের এ বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আ) এ শিক্ষা-সফরে যে ধৈর্য ধারণ করেন তা ছিল চরম ধৈর্য এবং ক্ষুধা ও ভ্রমণের যে কষ্ট সহ্য করেন তাও ছিল চরম পর্যায়ের। তাঁর এই দীর্ঘ সফরের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন করা। অবশ্য এই সফরের শেষ পর্যায়ে মূসা (আ) ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। আর খিজির (আ) তাঁকে বিদায় দেন এই বলে:[২২০]

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا.

সে (খিজির) বললো, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। আর যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭. শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে একজন শিক্ষার্থীর আদব তথা আচার-আচরণের যেসব কথা এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: শিক্ষককে সম্মান করা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তিনি যতটুকু মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তা তাঁকে দান করা। কারণ, সন্তানের নিকট পিতার যে স্থান ও মর্যাদা, ঠিক একজন ছাত্রের নিকট তার শিক্ষকেরও সেই মর্যাদা। বরং ইয়াহইয়া ইবন মু'আয (রহ) বলেন: 'আলিমগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের প্রতি তাদের পিতা-মাতার চেয়ে বেশি দয়াশীল। তাঁকে বলা হলো: তা কিভাবে? বললেন: তাদের পিতা-মাতারা তাদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করেন, আর 'আলিমগণ তাদেরকে রক্ষা করেন আখিরাতের আগুন থেকে।

এ কারণে, যেমন ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেছেন, শিক্ষকের অধিকার পিতা-মাতার অধিকারের চেয়েও বড় হয়ে গেছে। পিতা-মাতা হলেন মানুষের এ পৃথিবীতে আগমণ ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তির অসীলা বা মাধ্যম। পক্ষান্তরে শিক্ষক হলেন পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের কারণ। শিক্ষক যদি না থাকতেন তাহলে পিতা-মাতার

---

২২০. সূরা আল-কাহ্‌ফ-৭৮

দিক থেকে যা লাভ করেছে তা অনন্তকালীন ধ্বংসের দিকে চলে যেত। তবে প্রকৃত শিক্ষক তিনি, যিনি আখিরাতের জীবনের জন্য উপকারী। অর্থাৎ আখিরাতের জ্ঞানের শিক্ষক অথবা আখিরাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পার্থিব জ্ঞানের শিক্ষক।[২২১] একজন আরব কবি শিক্ষক ও পিতার তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন:

فهذا مربى الروح والرح جوهر + وذاك مربى الجسم والجسم كالصدف.

ইনি (শিক্ষক) হলেন রূহ বা আত্মার শিক্ষক, আর রূহ হলো মণি-মুক্তো স্বরূপ। আর তিনি (পিতা) হলেন দেহের শিক্ষক এবং দেহ হলো ঝিনুক স্বরূপ।

হাসান ইবন 'আলী (রা) বলেন: 'আলিমগণ অর্থাৎ শিক্ষকগণ যদি না থাকতেন তাহলে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত হয়ে যেত। অর্থাৎ শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের খোয়াড় থেকে বের করে মনুষ্যত্বের দিগন্তে উন্নীত করেন। এ কারণে 'আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের মর্যাদা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু বাণী এসেছে। তাঁদের প্রতি এ সম্মান তাঁদের মৃত্যুর পরেও দেখাতে হবে। এখানে শিক্ষকদের মর্যাদা বিষয়ক কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হলো:[২২২]

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد (يعنى فى القبر) ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه فى اللحد.

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শহীদদেরকে কবর দেওয়ার সময় দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করছিলেন: এদের মধ্যে কে বেশি পরিমাণ কুরআন ধারণ করেছে। যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছিল, তিনি তাকেই আগে কবরে নামাচ্ছিলেন।

এই আগে কবরে নামানোর মাধ্যমে মূলত: তাঁর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এই মর্যাদার কারণ হলো বেশি পরিমাণ কুরআন ধারণ করা।

---

২২১. ইয়াহইয়াউ 'উলূমিদ দীন, খ.১, পৃ.৫৫
২২২. আল বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, হাদীছ-১৩৪৩।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন:[২২৩]

إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالى فيه؟ ولا الجا فى عنه، وإكر ام ذى السلطان المقسط.

বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের জ্ঞানে অধিকারী, তবে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার শামিল।

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا. (أى يعرف له حقه)

'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করেনা, ছোটদেরকে স্নেহ করেনা এবং আমাদের 'আলিমদের (জ্ঞানী) অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়না, সে আমার উম্মাতের কেউ নয়।[২২৪]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَعَلَّمُوْا العلمَ، وَتَعَلَّمُوْا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ والوقار، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। আর জ্ঞানের স্বার্থে মানসিক

---

২২৩. আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, হাদীছ-৪৮৪৩; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮০, হাদীছ-৯৮।

২২৪. মুসনাদু আহমাদ, খ.৫, পৃ.৩২৩; মাজমা' আয যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ.১২৭

প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য আয়ত্ত কর এবং যার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন কর, তার সামনে বিনয়ী হও।[২২৫]

আমরা আমাদের এ লেখায় ইতোপূর্বে কয়েকটি স্থানে নবী মূসার (আ) জ্ঞান অর্জনের জন্য খিজিরের (আ) নিকট গমন ও ক্লান্তিকর সফরের কথা উল্লেখ করেছি। কুরআনের সেই বর্ণনার মধ্যে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের সম্মান প্রদর্শন ও তার সামনে বিনয়ী হওয়ার দৃশ্যও বিধৃত হয়েছে। কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণের পর মূসা (আ) যখন খিজিরের (আ) সাক্ষাৎ পেলেন তখন অত্যন্ত আদরের সাথে ও বিনয়ীভাবে আরজ করেন:

...هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এজন্য আমি আপনার অনুসরণ করবো কি? (সূরা আল কাহফ : ৬৬।)

এখানে أَتَّبِعُكَ বাক্যটি লক্ষ্যণীয়। যার অর্থ 'আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?' তিনি اتِّبَاع (অনুসরণ) করার অনুমতি চেয়েছেন, সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু হওয়ার অনুমতি চাননি। কারণ, একজন স্বেচ্ছাসেবী স্বাধীন শিক্ষকের এ অধিকার আছে যে, তিনি তাঁর ছাত্র হিসাবে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি কারো নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এখানে ছাত্র মূসা (আ) ছিলেন একজন উঁচু পর্যায়ের ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী রাসূল, পক্ষান্তরে খিজিরের (আ) নবী হওয়া নিশ্চিত নয়, তা সত্ত্বেও তিনি এমন বিনয়ী ভাব প্রকাশ করেন। মূলত: তিনি শিক্ষকের অধিকার পূর্ণ করেন। মূসার (আ) মর্যাদা প্রমাণের জন্য আল্লাহর এ বাণীটিই যথেষ্ট:[২২৬]

يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي...

হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালাম (বাক্যালাপ) দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি...।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: আল্লাহর কসম! আমি কোন একজন আনসারীর বাড়িতে যেতাম, আমাকে বলা হতো: তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি চাইলে, তাকে জাগানো হতো। কিন্তু আমি তাকে ঘুমাতে দিয়েছি। যাতে তিনি ঘুম থেকে উঠে নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং ভালোমত তার নিকট থেকে হাদীছ শুনতে পারি।[২২৭]

---

২২৫. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮০, হাদীছ-১০০
২২৬. সূরা আল-আ'রাফ-১৪৪
২২৭. সুনান আদ দারিমী, খ.১, পৃ.১১৫

ইমাম শা'বী (রহ) বলেন:[২২৮]

صلى زيدبن ثابت رضى الله عنه على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس رضى الله عنه، فأخذ بركابه توقيرًا وتعظيمًا لعلمه وفضله، فقال له زيد : خل عنك يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس : هكذا نفعل بالعلماء والكبراء.

যায়দ ইবন ছাবিত (রা) একটি জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর তাঁর বাহন খচ্চরটি এগিয়ে আনা হলো যাতে তিনি তার পিঠে চড়তে পারেন। ইবন 'আব্বাস (রা) এগিয়ে এসে জিনের রিকাবটি মুট করে ধরেন (যাতে তিনি সহজে উঠতে পারেন)। যায়দ ইবন ছাবিতের (রা) জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি এমনটি করেন। যায়দ (রা) তাঁকে বলেন: হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি ছেড়ে দিন। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: আমরা 'আলিম ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে এমন আচরণ করে থাকি।

ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলেন :[২২৯]

كنت اتى باب عروة فأجلس بالباب، ولوشئت أن أدخل لدخلت، ولكن اجلالاله.

আমি 'উরওয়ার (রহ) ঘরের দরজায় এসে বসে থাকতাম। আমি ইচ্ছা করলে ঢুকতে পারতাম, কিন্তু তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এমন করতাম।

'আলী ইবন আবী তালিব (রা) বলেন: একজন 'আলিমের যে সকল হক বা অধিকার আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, জবাব দানের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না, অলসতা দেখালে চাপাচাপি করবে না, তিনি যখন উঠবেন তখন আরেকটু বসার জন্য তাঁর কাপড় ধরে টানাটানি করবে না, তাঁর কোন গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না, তাঁর নিকট অন্য কারো গীবাত করবে না, তাঁর কোন পদস্খলন কখনো কামনা করবে না, যদি পদস্খলন ঘটে তাহলে তার ওজর আপত্তি গ্রহণ করবে।

---

২২৮. জামি' বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.১৫৫; আল-মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.৯, পৃ.৩৪৫
২২৯. সুনান আদ-দারিমী, খ.১, পৃ.১১৫

তোমার কর্তব্য হলো তাঁকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা- যতক্ষণ তিনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে তাঁর সামনে বসবে না। তাঁর কোন প্রয়োজন হলে সবার আগে তুমি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।"[২৩০]

"শিক্ষকের সামনে শিক্ষার্থীর কথা বলা অথবা তাঁকে প্রশ্ন করা যেমন ভালো, তেমনি তাঁর সামনে চুপ থাকাও ভালো"-এ আচরণও শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে গণ্য করা হয়।

হাসান ইবন 'আলী (রা) তাঁর ছেলেকে বলেন: হে আমার ছেলে! তুমি যখন 'আলিমদের সাথে বসবে তখন বলার চেয়ে শোনার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকবে। ভালো মত শোনা শিখবে, যেমন ভালো মত চুপ থাকতে শিখে থাক। একজনের কথার মাঝখানে তার কথা কেটে দিয়ে কথা বলবে না, তা সে যত দীর্ঘই হোক।

শু'বা (রহ) বলতেন: "আমি যাঁর নিকট থেকে একটি হাদীছও শুনেছি, আমি তার দাস।" তাঁর এ কথাটি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে পরবর্তীতে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়ে। যেমন: বলা হতো:

من علمنى حرفا صرت له عبدًا.

> যিনি আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিয়েছেন আমি তাঁর দাসে পরিণত হয়েছি।

এ বাক্যটিতে জ্ঞানী ব্যক্তি ও শিক্ষকদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদার ভাব প্রকাশিত হয়েছে, যা অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। সবশেষে আধুনিক মিসরের জাতীয় কবি আহমাদ শাওকীর দু'টি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গটি শেষ করছি:

قم للمعلم وفه التبجيلا + كاد المعلم أن يكون رسولا.

أرأيت أعظم أو أجل من الذى + يبنى وينشئ أنفسا و عقولا؟

> শিক্ষকের সম্মানে উঠে দাঁড়াও এবং তাঁর প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। শিক্ষক প্রায় একজন রাসূলের মতই। যিনি অসংখ্য জীবন ও বুদ্ধির ভিত্তি গেড়ে বড় করে তোলেন, তুমি কি মনে কর তাঁর চেয়ে মহান ও সম্মানীয় আর কেউ আছে?

---

২৩০. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ.১, পৃ.১০৬-১০৭

৮. সুন্দরভাবে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করা

একজন 'আলিম অথবা শিক্ষককে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, কোন বিষয় বুঝতে না পারলে লজ্জায় তাঁকে প্রশ্ন করবে না। কারণ, ইসলামী শরী'আতে যে প্রশংসিত লজ্জার কথা বলা হয়েছে, যে লজ্জাকে ঈমানের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে লজ্জায় কেবল কল্যাণই বয়ে আনে, তা কোন ভাবেই এই লজ্জা নয়। বরং শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করার লজ্জা হলো তার দুর্বলতা ও হীনমন্যতা। এ কারণে ইমাম মুজাহিদ (রহ) বলেন:[২৩১]

لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر.

লাজুক ও অহংকারী- এ দু'প্রকৃতির মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে না।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বলেন:[২৩২]

نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين.

আনসারদের মহিলারা সবচেয়ে ভালো মহিলা। দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখে না।

ইমাম আল-বুখারী (রহ) উম্মু সালামার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না। নারীর স্বপ্নদোষ হলে তাকে কি গোসল করতে হবে? (অর্থাৎ যদি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখে যে, কোন পুরুষ তার সাথে যৌনমিলন করছে)। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যদি পানি দেখতে পায়।

আমরা উম্মু সালামাকে (রা) দেখতে পাই, তিনি উম্মু সুলাইমের (রা) এমন প্রশ্ন শুনে লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে ফেলেন। আর সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী 'আয়িশা (রা) উম্মু সুলাইমকে (রা) বলেন: তুমি নারী জাতিকে লজ্জা দিয়েছো।

কেউ যদি একান্তই কোন ব্যাপারে লজ্জার কারণে প্রশ্ন করতে না পারে তা হলে অন্যকে দিয়ে প্রশ্ন করে বিষয়টি জেনে নেবে। যেমন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) করেছিলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কন্যা ফাতিমা (রা) ছিলেন 'আলীর (রা) স্ত্রী। এ কারণে তিনি 'মাযই' অর্থাৎ বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত তরল রস বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করতে

---

২৩১. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম: বাবুল হায়াউ ফিল 'ইলম
২৩২. প্রাগুক্ত

লজ্জা পান। তাই 'আম্মার ও মিকদাদকে (রা) তিনি জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা সে বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন।[২৩৩]

ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী (রহ) বলেন:

العلم خزائن ومفا تيحها السؤال.

জ্ঞান হলো অনেকগুলি ভাণ্ডার স্বরূপ এবং যার চাবি হলো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা।

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তরে যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তা কেবল তাদেরকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই বের করা যায়। এতে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যও উপকার হয়। কারণ, এ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যে জ্ঞান তার মধ্যে গোপন থাকে তা বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীও তাতে উপকার লাভ করে। কারণ সে যা জানতো না তাও জানতে পারে, জানা থাকলে আরো নিশ্চিত হয়ে যায় এবং দ্বিধা-সংশয় থাকলে তা দৃঢ় হয়ে প্রত্যয় সৃষ্টি করে।

এ হলো একজন সজাগ ও মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বভাব বা আচরণ। সে যা কিছু পড়ে বা শোনে তা ধারণ করতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। আর বুঝতে না পারলে বারবার প্রশ্ন করে বুঝে নেয়। ইমাম আল বুখারী ইবন আবী মুলাইকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) তাঁর অজানা যা কিছু শুনতেন তা বারবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

বহু সাহাবী অনেক কিছু বুঝতে না পেরে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করে অবোধ্য বিষয়টি বুঝে নিয়েছেন। যেমন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো:[২৩৪]

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ...

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি...।

তখন অনেক সাহাবী বললেন: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম করেনি? তাদেরকে জবাব দেওয়া হলো: আয়াতে উল্লেখিত ظلم শব্দের অর্থ শিরক (شرك)। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন লুকমানের (আ) ভাষায় বলেছেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

নিশ্চয় শির্‌ক হলো মহা যুল্‌ম।

---

২৩৩. প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম; বাবু মান ইসতাহইয়া ফা আমারা গায়রাহু বিস-সুওয়ালি
২৩৪. সূরা আল-আন'আম-৮২

এ ধরনের দৃষ্টান্ত বহু আছে। যে প্রশ্ন করবে না সে নিজেকে বহু জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবে। একজন কবি বলেছেন:

> إذا كنت لا تدرى و لم تك بالذى + يسائل من يدرى، فكيف إذن تدرى؟
>
> যখন তুমি না জানবে এবং যে জানে তাকে জিজ্ঞেস না কর, তাহলে তুমি কিভাবে জানবে?

আর তাই 'উমার (রা) বলেন:

> من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء.
>
> যে জানবে সে মানুষকে শেখাবে। আর যে না জানে সে অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করবে।[২৩৫]

৯. সন্তানদের শিক্ষাদান করা সমাজের প্রত্যেকের দায়িত্ব

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি যেমন পরিবারের নিকটজনদের থেকে শুরু করে দূরবর্তীদের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ভাবে শিক্ষার বিষয়টিও একই রকম। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তার শিক্ষাদানের কাজটি শুরু করবে তার নিকটজনদের থেকে। তারপর ধাপে ধাপে তা প্রসারিত হবে পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রাম-মহল্লা ও দেশ-বিদেশ পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন :[২৩৬]

> يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا...
>
> হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন হতে রক্ষা কর...।

وَأَهْلِيكُمْ نَارًا -আয়াতের এ অংশটুকুর ব্যাখায় 'আলী (রা) বলেন : عَلِّمُوْا أهليكم الخير -তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ভালো ও কল্যাণের কথা শিক্ষা দাও। আল্লাহ তা''আলা আরো বলেন :[২৩৭]

> وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

---

২৩৫. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.১১৩
২৩৬. সূরা আত-তাহরীম-৬
২৩৭. সূরা তাহা-১৩২

এবং তোমরা পরিবার সদস্যদেরকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাইনা এবং আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তানদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সাহাবীদেরকে খুবই সচেতন করেছেন। যেমন একটি হাদীছে এসেছে :[২৩৮]

ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن.

কোন পিতার তার সন্তানকে সুন্দর আদব তথা আচার-আচরণ শিক্ষাদানের চেয়ে উত্তম দান ও উপহার আর কিছু নেই।

এভাবে পরিবার, সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের অধিকারের পর আসে প্রতিবেশীদের অধিকার। ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জিবরীল (আ) নবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও আমৃত্যু সাহাবায়ে কিরামকে প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এভাবে পরিবারের দাস-দাসী, চাকর-চাকরানীর অধিকারও এসে যায়। তারাও পরিবারের অংশ। তাদের সকলকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পরিবারের অথবা প্রতিবেশী 'আলিম ব্যক্তির। তারা শিক্ষালাভ করে ভালো কাজ করলে তা যেমন তাদের কল্যাণে আসবে, তেমনি পরিবারের কল্যাণও বয়ে আনবে। আর খারাপ কাজ করলে নিজেদের ও পরিবারের উভয়ের অকল্যাণ বয়ে আনবে। এমন কথাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছন :

فإن أحسنوا فلأ نفسهم ولها، وإن أساؤوا فعلى أنفسهم وعليها.

এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলকে শিক্ষাদানের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ইমাম আল-বুখারী (রহ) তাঁর সাহীহ্ গ্রন্থে 'বাড়ির কর্তাব্যক্তির তার দাসী ও পরিবারকে শিক্ষাদান' (باب تعليم الرجل أمته و أهله) পরিচ্ছেদে আবু মূসা আল-আশ'আরীর (রা) সূত্রে একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

---

২৩৮. আত-তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাতি

ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب امن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران.

তিন ব্যক্তি দুটি করে প্রতিদানের অধিকারী হবে। পূর্ববর্তী কিতাবের উপর বিশ্বাসী একজন মানুষ যে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরও ঈমান এনেছে। একজন দাস যে আল্লাহর হক (অধিকার) এবং তার মনিবের হক আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তির একজন দাসী আছে, সে তাকে সুন্দর ভাবে আদব-আখলাক শিখিয়েছে এবং চমৎকার ভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেই বিয়ে করেছে। তারও রয়েছে দু'টি প্রতিদান।

দাসীর মনিবের প্রথম প্রতিদানটি হলো সুন্দর আদব-আখলাক ও সুন্দরভাবে শিক্ষাদানের জন্য এবং দ্বিতীয় প্রতিদানটি হলো মুক্তিদান ও বিয়ে করার জন্য।

আল-কুরআনের বহু আয়াতের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহু বাণীতে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত হোক বা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হোক নগর বা গ্রামের প্রতিটি জনপদের প্রত্যেকটি মানুষ সুখে দুঃখে একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। বস্তুগত ক্ষেত্রে, অথবা বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অবস্থা কোন ভাবেই মেনে নেননি যে, মুসলিম সমাজের একজন অথবা কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থাকবে এবং তার প্রতিবেশীর কোন খোঁজ খবর রাখবে না। যেমন তিনি বলেন :[২৩৯]

ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم.

সে মু'মিন নয় যে পেটভরে খেয়ে রাত্রিযাপন করলো, আর তার প্রতিবেশী তারই পাশে উপোস কাটালো এবং সে তা জানে।

তেমনিভাবে বুদ্ধিগত অথবা বলা যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও যারা কিছু জ্ঞান

২৩৯. মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.৮, পৃ.১৬৭

লাভ করার সুযোগ পেয়েছে তাদের উপর তাদের অজ্ঞ-মুর্খ প্রতিবেশীদেরকে তা শেখানো ফরজ করা হয়েছে। সম্পদ থাকলে যেমন দরিদ্র প্রতিবেশীদেরকে যাকাত দিতে হয়, তেমনিভাবে 'আলিম যা জ্ঞানী ব্যক্তিকেও তার অজ্ঞ প্রতিবেশীদের তার জ্ঞানের যাকাত দেওয়া ফরজ করা হয়েছে। আর তা হলো তারা যে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদেরকে সে আলোতে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন 'আলকামা ইবন সা'দ (রহ) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে। তিনি বলেন :[২৪০]

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأثنى على طوائف من المسلمين خيرًا، ثم قال : مابنال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ولا يعلمونهم، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم، ويفقهونهم، ويعظونهم، ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيراهم، ويتفقهون، ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة، ثم نزل فقال قوم : من ترونهم عنى بهؤلاء؟ قال : الأشعربين هم قوم فقهاء ولهم جيران حفاة من أهل المياه والأعراب، فبلغ ذلك الأشعريين، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله، ذكرت قومًا بخير، وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال : ليعلمن قوم جيرانهم، وليغطنهم وليأمرنهم، ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم، ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة فى الدنيا، فقالوا يا رسول الله ! أنُفْطَنُ غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم : أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا،

২৪০. প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ. ১৬৪; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.১, পৃ.৮৭-৮৮, হাদীছ-১১৩

فقالوا : أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقوههم، ويعلموهم ويعظوهم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : "لعِنَ الذين كفروا مِنْ بَنِى إسرائيل على لسان داوودَ و عيسى ابْن مَرْيَمَ...."

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ভাষণ দিলেন। এতে তিনি কিছু সংখ্যক মুসলিমের ভালো কাজের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন : কিছু সংখ্যক মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে জ্ঞান বিতরণ করে না, ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয় না, উপদেশ দেয় না, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না?

কিছু লোকের কি হয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেখে না, দীনের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করে না, উপদেশ গ্রহণ করে না? আল্লাহর কসম! একটি সম্প্রদায় অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীরেদকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে, দীনের গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাবে, উপদেশ দেবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আরেকটি সম্প্রদায় অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখবে, দীনের গভীর তাৎপর্য জানবে, উপদেশ গ্রহণ করবে। অন্যথায় আমি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দেব। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন। ভাষণ শুনে শ্রেতারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে তোমরা মনে কর? একজন বললো : নিশ্চয়ই আশ'আরী গোত্রকে বুঝিয়েছেন। কারণ তারা ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী। কিন্তু তাদের প্রতিবেশীরা মূর্খ, যাযাবর ও পানির মালিক। আশ'আরীরা যখন এ ব্যাপারটা জানতে পারলো তখন রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে তারা বললো : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একদল লোকের প্রশংসা করলেন, আর আমাদের নিন্দা করলেন। আমরা কী করেছি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : একটি সম্প্রদায় তাদের প্রতিবেশীদেরকে অবশ্যই জ্ঞান শিক্ষা দেবে, উপদেশ দান করবে, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আরেকটি সম্প্রদায় অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে শিখবে, উপদেশ গ্রহণ করবে ও দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে। অন্যথায় আমি দুনিয়াতে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেব। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে বুঝবো? তিনি তাঁর পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারা আবারো তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনিও একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তখন তারা বললো

: ঠিক আছে আপনি আমাদেরকে এক বছর সময় দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এক বছর সময় দিলেন যাতে তারা প্রতিবেশীদেরকে শিক্ষা দান করতে পারে।

অতঃপর তিনি সূরা আল-মায়িদার ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াত পাঠ করলেন :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ... كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ...

বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা দাঊদ ও ঈসা ইবন মারইয়ামের মুখ থেকে অভিসম্পাত পেয়েছে... কেননা তারা মানুষকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতো না।

এই হাদীছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয় উঠেছে :

১. রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি একটি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকার বিষয়টি মেনে নেননি।
২. অজ্ঞ মূর্খরা তাদের মূর্খতার উপর বিদ্যমান থাকা এবং শিক্ষিতরা তাদেরকে শিক্ষাদান না করা- দু'জনের কাজই আল্লাহর নির্দেশ ও শরী'আতের পরিপন্থী কাজ।
৩. উভয় সম্প্রদায়ের কাজ বিদ্রোহ ও গর্হিত বলে বিবেচিত, যা অভিশাপ ও শাস্তির যোগ্য।
৪. রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শাস্তির ঘোষণা দেন, যাতে তারা শেখা ও শেখানোর দিকে দ্রুত মনোযোগী হয়।
৫. একটি সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা দূর করার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়টিকে এক বছর সময় দেন।
৬. রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল আশ'য়ারী গোত্রের 'আলিমগণ ও তাদের প্রতিবেশী জাহিলগণ নয়, বরং তা সাধারণ মৌলনীতি মূলক। বিষয়টি কোন গোষ্ঠী ও নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমিত নয়।
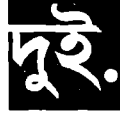
রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনকালে শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলামের প্রাথমিক পর্বে শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

ইসলামের প্রাথমিক পর্ব বলতে রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনকাল ও খিলাফাতে রাশেদার সময়কালের কথাই বলছি। আমরা জানি রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনকালেই গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর আরবের সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে আল-কুরআন ও ইসলামী শরী'আতের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করে। ফলে প্রতিটি গোত্রে ও প্রতিটি জনপদে পড়া ও পড়ানোর ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়।

মক্কা মুকাররামায় ইসলামের জন্য বিরূপ পরিবেশ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন ভাবে কুরআন শিক্ষা অব্যাহত ছিল। রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কী জীবনের পূর্ণ সময়কালে মক্কায় কোন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষালয় গড়ে ওঠেনি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হজ্জ মাওসুমে এবং সময় ও সুযোগ মত মানুষকে কুরআন শোনাতেন। এ সময়ে মাসজিদে আবূ বাকর, দারে আরকাম (আরকামের গৃহ), ফাতিমা বিন্ত খাত্তাবের বাড়ি, শি'আবূ আবী তালিব প্রভৃতি স্থানকে অনেকাংশে শিক্ষালয় বলে অভিহিত করা যায়। মক্কার সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ও রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কী জীবনের এ সময়কালে বেশ কিছু কারী ও মু'আল্লিম (কুরআন পাঠক ও শিক্ষক) তৈরি হয়েছিলেন যাঁরা অন্যদেরকে কুরআন শেখান এবং দীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করেন। খাব্বাব ইবন আরাত (রা) কুরআন শিক্ষা দিতেন ফাতিমা বিন্ত খাত্তাবের (রা) গৃহে। রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাতের পূর্বে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা) মাদীনার কুবা পল্লীতে, মুস'আব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মি মাকতুম ('আমর ইবন

কায়স আল আ'মা') নাকী' আল-খাদিমা'তে এবং রাফি' ইবন মালিক যারকী (রা) মাসজিদে যুরাইক-এ শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। এদের সকলেই ছিলেন উল্লেখিত মক্কার শিক্ষালয়গুলোর কৃতী ছাত্র। আর মাদীনার প্রথম পর্বের এই শিক্ষালয়ের ছাত্ররাই তখন মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত একাধিক মাসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানুষকে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের খিদমাতও আঞ্জাম দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাতের পরে মাদীনায় মাসজিদে নববী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে ওঠে। সেখানে স্বয়ং সায়্যিদুল মু'আল্লিমীন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া আবূ বাকর সিদ্দীক, উবাই ইবন কা'ব, 'উবাদা ইবন আস সামিত (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও এই শিক্ষালয়ের মুকরী ও মু'আল্লিম (কুরআনের পাঠক ও শিক্ষক) ছিলেন। এই মাসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ের যারা শিক্ষার্থী ছিলেন তারা নিজেদের ঘরে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে গোটা মাদীনা শহরটি জ্ঞান চর্চার শহরে পরিণত হয়। এর প্রতিটি অলি-গলিতে কুরআনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিনিধিদল মাদীনায় এসে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দক্ষ কুরআন পাঠক তথা কারীদেরকে মু'আলিম হিসেবে বিভিন্ন গোত্রে পাঠাতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই শিক্ষালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন গোত্রের নেতা ও প্রধানগণ নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে গোত্রীয় লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। এ সময়ে মক্কা ও মাদীনার পরে ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদে পঠন-পাঠন তৎপরতা সবচেয়ে বেশি শুরু হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীর, কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নিজ নিজ প্রভাব বলয়ের মধ্যে মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ, ফারায়েজ, দীন ও শরী'আতের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় মু'আয ইবন জাবাল, তায়িফে 'উছমান ইবন আবিল 'আস আছ-ছাকাফী, 'উমানে আবূ যায়দ আল-আনসারী, নাজরানে খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ, ইয়ামানে 'আলী ও আবূ 'উবায়দা ইবন আল-জাররাহ এবং জানাদে মু'আয ইবন জাবাল (রা) এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল আমীর ও কর্মচারী-কর্মকর্তাকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ করেন তারা নিজ নিজ স্থানের শিক্ষক ও ইমাম ছিলেন। মুসলিমদেরকে দীন বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সকল পদে তাদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হতো যারা

কুরআন, সুন্নাহ্ এবং দীন ও শরী'আতের জ্ঞানে জ্ঞানী হতেন। তাঁরা এসব বিষয়ের জ্ঞানই শিক্ষা দিতেন। শিক্ষামূলক সফরের ধারাবাহিকতাও চালু ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো। আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্কে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললো, আমরা বহু দূর থেকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এসেছি। পথে কাফির গোত্র মুদার এর আবাসস্থল। এ কারণে আমরা কেবল পবিত্র হারাম মাসে আপনার নিকট আসতে পারি। 'উকবা ইবন হারিছ (রা) মাত্র একটি মাসায়ালা জানার জন্য মাদীনায় রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিদমতে হাজির হন।[১]

প্রথম পর্বে শিক্ষার্থীদের থাকা ও খাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার দারুল আরকাম-এ অবস্থানকারী সাহাবীগণের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন সচ্ছল সাহাবীগণের গৃহে, যাকে জায়গীর নামেও অভিহিত করা যায়। মাদীনার কুবা-তে সা'দ ইবন খায়ছামার শূন্য বাড়ি "বায়তুল আয্যাব" ছিল ছাত্রাবাস। "আসহাবে সুফ্ফাহ্" মাসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। আর দূর-দুরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী তথা প্রতিনিধি দল এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ সাধারণত রামলা বিন্ত হারিছ এর গৃহে অবস্থান করতেন। আসহাবে সুফ্ফার আহারের ব্যবস্থা করতেন মাদীনার আনসারগণ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে। আর বহিরাগতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তা ও বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল।

কুরআনের শিক্ষা হতো সাধারণত মৌখিকভাবে। লিখিত মাসহাফের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনিতেই তৎকালীন আরবে লেখা-লেখির তেমন প্রচলন ছিল না। তা সত্ত্বেও ওহী লেখা হতো এবং শিক্ষার্থীদের হাতে কিছু কিছু সূরা লিখিতরূপেও পাওয়া যেত। মক্কাতে ফাতিমা বিনত খাত্তাবের গৃহে একটি সহীফা থাকার কথা জানা যায়।

মাদীনায় 'উবাদা ইবন আস-সামিত মৌখিকভাবে কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি লেখাও শেখাতেন। এছাড়া বদর যুদ্ধের বন্দীদের দ্বারা লেখা শেখানো হয়। ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে লেখার প্রচলন হয় এবং মাসহাফ লেখা হয়। কোন কোন সাহাবী মাসজিদে নববীতে হাদীছও লিখতেন। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে কুরআনের শিক্ষা মৌখিক ভাবেই হতো। সম্মানিত বিশেষ বিশেষ সাহাবী সম্পূর্ণ কুরআনের হাফিয ও কারী ছিলেন। পক্ষান্তরে বেশিরভাগ সাধারণ সাহাবা প্রয়োজন পূরণের মত কিছু সূরা মুখস্থ করে নিতেন।

---

১. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু তাহরীদ আন-নাবিয়্যি ওয়াফদা 'আবদিল কায়স, হাদীছ-৫; বাবুর রিহলা ফিল মাসায়ালা, হাদীছ-৮৬

সাহাবা ও তাবি'ঈনের সময়কালে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়। ইসলামী বিশ্বের সীমা ও আয়তন অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় আরব উপ-দ্বীপ ছাড়াও বিজিত অনারব দেশগুলিতেও শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। এ সময়ে দীনী তথা ধর্মীয় জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল মাদীনা। কারণ এখানে বহুসংখ্যক সাহাবীর অবস্থান ছিল। এখানে 'ইল্‌মে দীনের চর্চা সবচেয়ে বেশি ছিল। আর এটাই ছিল সকলের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রত্যাবর্তন স্থল।

এরপর মক্কা ছিল দ্বিতীয় কেন্দ্র। এ সময় ইরাকের কূফা ও বসরা উভয় শহরই ছিল ইসলামী জ্ঞান চর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ বসবাস করতেন। বিশেষ করে কূফায় 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের সাহাবী অবস্থানের কারণে সেখানে জ্ঞান চর্চার তৎপরতা অনেক বেশি ছিল। সেখানে প্রায় পাঁচ শো রাবী তাবি'ঈ (হাদীছ বর্ণনাকারী তাবি'ঈ) বিদ্যমান ছিলেন। এর পরেই ছিল বসরার স্থান। সেটাও ছিল কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হ চর্চার কেন্দ্র। বহু সাহাবী ছাড়াও সেখানে প্রায় দু'শো রাবী তাবি'ঈ বসবাস করতেন। ইরাকের পরেই ছিল মিসর ও শামের স্থান। বিশেষ করে বানু উমাইয়্যার শাসনামলে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ তৎপরতা অনেক বেশি ছিল। উঁচু স্তরের বহু সাহাবী ও তাবি'ঈ সেখানে এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় ইয়ামান ও এর আশে-পাশের অঞ্চলসমূহে; বিশেষত: জানাদ, রামা', যাবীদ প্রভৃতি স্থান জ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। ফারওয়া ইবন মাসীক সেখানে ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ও দীনী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গৌরবজনক ভূমিকা রাখেন। এখানে তাবি'ঈগণের মধ্যে ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ, হাম্মাম ইবন মুনতাবাহ্, তাঊস ইবন কায়সান, মা'মার ইবন রাশিদ (রহ) প্রমূখ ছিলেন সকলের কেন্দ্রস্থল।

ইসলামী বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে এবং খুরাসান ও অন্যান্য স্থানে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের উপস্থিতির সংখ্যা কম ছিল, এ কারণে অন্যান্য স্থানের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে সেখানে তা'লীম ও তারবিয়্যাতের প্রচলনও কম ছিল। একই কারণে আফ্রিকাতেও কম ছিল।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকালের পর সাহাবায়ে কিরামের সময়কালে 'উমার (রা) শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি নিজেই সুন্নাহ সংগ্রহের ইচ্ছা করেন, কিন্তু এ আশংকায় তা থেকে বিরত থাকেন যে, পূর্ববর্তী নবীদের (আ) উম্মাতসমূহের মত সর্বশেষ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতও কুরআনের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে না যায়। তিনি শাম, বসরা, কূফাসহ বিভিন্ন নগর ও জনপদে 'আলিম সাহাবীগণকে শিক্ষাদানের জন্য পাঠান। শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মকতব চালু করেন। কুরআনের অনুলিপি করে বহু সংখ্যক

মাসহাফ তৈরি করে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। কুরআনের হাফিযদেরকে পুরস্কার ও ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন।

তাঁরই চিন্তা ও চেষ্টায় ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি শহর ও গ্রাম পঠন-পাঠনের জনপদে পরিণত হয়। তিনি দীনী 'ইলমের প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর অনেক পরে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি হাদীছ ও সুন্নাহ সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ এবং এর পঠন-পাঠনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেন। এর ফলে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বে হাদীছ ও ফিক্‌হ লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলনের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। তিনি বিভিন্ন শহর ও জনপদে অসংখ্য দা'ঈ ও শিক্ষক পাঠান।

হিজরী ২য় শতক পর্যন্ত ইসলামী জ্ঞান চর্চার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলো হলো ঃ মাদীনা, মক্কা, তায়িফ, কূফা, বসরা, ইয়ামান, শাম, মিসর, আওয়াসিম, জাযীরা, মূসেল, ইয়ামামা, বাইরাইন, ওয়াসিত, আনবার, মাদায়িন, খুরাসান, রায়, কুম ইত্যাদি। খালীফা ইবন খায়্যাত, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ প্রমুখ ঐতিহাসিক তাঁদের তাবাকাতসমূহে উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহের ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও 'আলিমগণের জ্ঞান চর্চার তৎপরতার চিত্র তুলে ধরেছেন।

এ সময়ে শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ এবং অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপক রীতি-প্রথা চালু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের তাবি'ঈগণের ছাত্র-শাগরিদগণ নিজেদের উস্তাদগণের উস্তাদ সাহাবীগণের মুখ থেকে সরাসরি হাদীছ শোনার জন্য মাদীনায় ছুটে আসতেন। এভাবে সনদে 'আলী তথা উচ্চতর সনদ অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণ- ইচ্ছা বেশি ছিল। সাহাবায়ে কিরামের বিদ্যমান থাকার ফয়েজ ও বরকত থেকে দুনিয়া ক্রমশ শূণ্য হয়ে চলছিল। তাঁদের ছাত্র-শাগরিদগণ ছিলেন তাঁদের জ্ঞানের ওয়ারিছ ও আমানতদার। এ কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনকে সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) একবার তাবি'ঈগণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :[২]

حتى لوكان أحدهم من وراءالبحر لركبوا إليه يتفقهون منه.

এমন কি তাবি'ঈগণের কেউ যদি সাগরের অপর পাড়ে থাকে তাহলেও মানুষ সেখানে গিয়ে তাদের নিকট থেকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করবে।

---

২. মুসান্নাফু 'আবদির রায্‌যাক, (বৈরূত) খ. ১১, পৃ-২২২

একবার রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ সা'ঈদ আল খুদরীকে (রা) বলেন, মানুষ তোমার নিকট আসবে 'ইলমে দীন অর্জনের উদ্দেশ্যে। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের যে ভবিষদ্বাণী উচ্চারিত হয় পরবর্তীতে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনকালে মাসজিদসমূহে শিক্ষার আসর ও বৈঠক বসতো। অনেক সাহাবী নিজ নিজ গৃহে বৈঠক বসিয়ে মানুষকে তা'লীম দিতেন। পরবর্তীতে এই সুন্নাত অনুসারে 'আলিমগণ মাসজিদসমূহে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদানের কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী দু'তিন শো বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময় কালে শিক্ষাদানের জন্য অথবা শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কোন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে 'আবিদ ও যাহিদ (অধিক 'ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন এবং পার্থিব ভোগ-বিমুখ) ব্যক্তিদের থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বতন্ত্র স্থাপনা নির্মাণ ও তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের কিছু ঘটনা খিলাফাতে রাশেদার সময়ে পাওয়া যায়। আল্লামা মাকরীযী তাঁর "কিতাবুল খুতাত ওয়াল আছার" গ্রন্থে আবূ নু'আইমের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, যায়দ ইবন সুলজান ইবন সাবরা (মৃ. ৩৬ হি.) ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বসরার সায়্যিদুত তাবি'ঈন। তিনি দেখলেন, বসরার কিছু তাপস ব্যক্তি যারা কোন ব্যবসা করেন না এবং জীবন ধারণের জন্য তাঁদের উপার্জনের কোন উপায় ও অবলম্বন নেই। তারা 'ইবাদাত-বন্দেগীতে সর্বদা নিমগ্ন থাকেন। তাই তিনি তাঁদের থাকার জন্য কিছু ঘর তৈরি করেন এবং তাঁদের পানাহারের ব্যবস্থাও করেন।[৩] তখন ছিল 'উছমানের (রা) খিলাফাতকাল। 'আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার মানসুর জ্ঞানী-গুণী ও দার্শনিকদের জন্য তৈরি করেন 'বাইতুল হিকমা'। সেখানে তাঁদের থাকা এবং খাওয়া-পরার জন্য ভাতার ব্যবস্থাও করতেন। কুরাইশ বংশের একজন রুচিশীল মানুষ 'আবদুল হাকাম ইবন 'আমর ইবন সাফওয়ান নিজের বন্ধু-বান্ধবদের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেন। সেখানে খেলাধুলার সাজ সরঞ্জামসহ কিছু গ্রন্থও সংগ্রহ করেন।[৪]

'আব্বাসীয় খালীফা মু'তাদিদ বিল্লাহ (মৃ-২৮৯ হি) জ্ঞানী-গুণী ও দার্শনিকদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাগদাদের শাম্মাসিয়া এলাকায় শাহী মহল নির্মাণের জন্য ভূমি জরীফ ও অধিগ্রহণের সময় প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি ভূমি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেখানে বহু জাঁকালো ভবন নির্মাণ করেন। তার মধ্যে তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্র ও শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক বহু কক্ষ তৈরি করেন।

---

৩. আল-মাকরীযী, কিতাবুল খুতাত ওয়াল আছার, (মিসর) খ-৪, পৃ.২৭২

৪. ইবন হাযম আল-আন্দালূসী, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, (মিসর) পৃ.-১৬০

প্রত্যেক কক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানসমূহের শিক্ষকগণের থাকার ব্যবস্থা করে তাদের জন্য মোটা অংকের ভাতা নির্ধারণ করেন। যাতে কোন ব্যক্তি কোন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করলে সহজেই তা করতে পারে।[৫] তবে সে সময় পর্যন্ত ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও হাদীছের বর্ণনাকারীগণ তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম মাসজিদেই পরিচালনা করতে থাকেন। এ কাজের জন্য তাঁরা যেমন পৃথক কোন ভবন নির্মাণ করেননি তেমনি কোন খালীফাও সেদিকে দৃষ্টি দেননি। অবশ্য মরক্কোর দুই বোন জাঁকজমকপূর্ণ পৃথক শিক্ষালয় তৈরি করেন এবং তার আশেপাশে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য বহু কক্ষ তৈরি করেন। হিজরী ৩য় শতকে দীনী শিক্ষালয়ের ধারাবাহিকতায় এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। মরক্কোর "ফাস" শহরে মহিলা ফকীহ ও মুফতী উম্মুল বানীন ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ফিহরী ০১ রামাদান ২৪৫ হিজরীতে "জামি' কারবীয়্যীন" এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

এর জন্য তিনি মীরাছী সূত্রে প্রাপ্ত পবিত্র অর্থ দ্বারা হাওয়ারা গোত্রে ভূমি ক্রয় করেন। নিজের ভূমি থেকে পাথর সংগ্রহ করে মাসজিদের আশে পাশে দীনী 'ইলমের শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট বড় বহু কক্ষ নির্মাণ করেন। এই জামি' কারবীয়্যীন-এ বর্তমান সময় পর্যন্ত দীনী শিক্ষা চালু আছে।[৬] এটাকে মরক্কোর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় গণ্য করা হয়। ফাতিমার বোন মারইয়াম বিন্ত মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল ফিহরীও একই বছর অর্থাৎ হি. ২৪৫ সনে ফাস শহরে জামি' আল আন্দালুস এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একই রীতিতে এর চারপাশে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য বহু কক্ষ নির্মাণ করেন। ফাসের সুলতান ইদরীস ইবন ইদরীস আন্দালুসের (স্পেন) একটি মুসলিম দলকে ফাসের পূর্বাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। সেই অঞ্চলে মারইয়াম বিন্ত মুহাম্মাদ মাসজিদ নির্মাণ করে তার নাম রাখেন জামি' আল-আন্দালুস'।[৭]

হিজরী ৩৬১ সনে কায়রোতে জামি' আল-আযহার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য তাকও বানানো হয়। মাসজিদের চারপাশে শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা হলেও মাসজিদেই শিক্ষাদান ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। শিক্ষার্থীদের খাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য কী ব্যবস্থা ছিল তা অবশ্য জানা যায় না। শিক্ষার্থীরা নিজেরা সে ব্যবস্থা করতো না অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল তা জানার কোন উপায় নেই।

বাগদাদ, কায়রোসহ সকল ইসলামী শহরে হিজরী ৩য় ও ৪র্থ শতক পর্যন্ত মাসজিদসমূহেই শিক্ষার মাজলিস বসতো। খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩)

---

৫. কিতাবুল খুতাত ওয়াল আছার (মিসর), খ. ২, পৃ. ৩৬২
৬. ড. ইউসুফ আল কারদাবী, আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, (কায়রো), পৃ. ১৬০
৭. আমীর শাকীব 'আরসালান, হাদিরুল 'আলাম আল-ইসলামী, (মিসর) পৃ. ১৭

বাগদাদের "জামি' মানসুর" এ নিজের দারসের মাজলিস বসাতেন। মুরাবিদী মতবাদের বিখ্যাত ইমাম ও 'আলিম ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ নাফতাওয়াইহ (মৃ. ৩২৩ হি.) "জামি' মানসূর"-এর একটি স্তম্ভের পাশে বসে একাধারে পঞ্চাশ বছর যাবত শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে স্থান পরিবর্তন করেন নি। শাফি'ঈ মাযহাবের 'আলিম আবূ হামিদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইসফারাইনী (মৃ. ৪০৬ হি) বাগদাদের 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক এর মাসজিদে দারস দিতেন। এই দারসের মাজলিসে তিন শো থেকে সাত শো পর্যন্ত 'আলিম ও ফকীহ্ অংশ গ্রহণ করতেন। মাকদিসী বাশারীর বর্ণনা মতে জামি' আযহার এ সালাতুল 'ঈশার পর এক শো দশটি জ্ঞান চর্চার বৈঠক বসতো।

শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র স্থাপনা নির্মাণের পরও মাসজিদসমূহে দীনী শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে এবং জনগণের জন্য এর কল্যাণ মূলক ফলাফল সবসময় বেশিই ছিল। সেখানে সুন্নাতের অনুসরণ শিক্ষার সাথে সাথে সাধারণ মুসলিমগণ জাগতিক জ্ঞানের জ্ঞানও লাভ করতো। 'আল্লামা ইবন আল-হাজ্জ 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে লিখেছেন :[৮]

أَخْذُ الدَّرس فى الْمسْجد أفضل لأجل كثـــرة الانتفـــاع بالعلم لمن قصده ومن لم يقصده، بخــلاف المدرســـة فانه لاياتى إليها الاَّ مَن قصد العلم والاستفتاء فأخـــذه فى المدرسة أقل رتبة فى الانتشار منه فى الممسد.

মাসজিদে পাঠ গ্রহণ করা উত্তম। কারণ যে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং যে করে না উভয়ের ক্ষেত্রে তা সমান উপকারী। পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, সেখানে কেবল জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা পোষণকারী শিক্ষার্থী আসবে। এজন্য মাসজিদের পরিবর্তে বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জন করলে সে জ্ঞানের প্রচার-প্রসার তুলনা মূলক ভাবে কম হবে।

এ কারণে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরও মাসজিদে পাঠদানের ধারা অব্যাহত থাকে। এমন কি বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক স্থানে চলমান আছে। বর্তমান পদ্ধতির মাদরাসার সূচনার ব্যাপারে আল্লামা মাকরীযী বলেন :[৯]

إن المدارس مما حدث فى الاسلام ولم تكن تعرف فى

---

৮. মুহাম্মাদ'আবদারী, ইবনুল হাজ্জ, আল-মাদখাল (মিসর), খ. ১, প. ২০২
৯. কিতাবুল খুতাত ওয়াল আছার, খ. ২, পৃ. ৩৬৩

زمن الصحابة ولا التابعين وإنما حدث عملها بعد الأربع مائة من سنى الهجرة وأول من حفظ عنه أنه بنى فى الاسلام أهل نيسابور فبنيت المدرسة البيهقية.

ইসলামে মাদরাসার প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে হয়েছে। সাহাবা ও তাবি'ঈদের সময়ে এর কোন পরিচিতি ছিল না। এর প্রতিষ্ঠা হয় হিজরী ৪র্থ শতকের পরে। নিসাপুরের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। আর সেই প্রথম মাদরাসাটি হলো 'আল-মাদরাতুস বাইহাকিয়্যা' (বাইহাকী মাদরাসা)।

অনেকের মতে ৪র্থ শতকের পরে নয়, বরং ৪র্থ শতকের মধ্যেই নিসাপুরে শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্ ও 'আলিমগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাপক প্রসিদ্ধি আছে, উযীর নিজামুল মূলক তুসী (মৃ. ৪৮৫ হি) সর্বপ্রথম মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। অথচ ইমাম তাজুদ্দীন আস-সাবকীর বর্ণনা মতে উল্লেখিত উযীরের জন্মের পূর্বেই কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেবল নিসাপুরেই চারটি মাদরাসা চালু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটি আল-মাদরাসাতুল বাইহাকীয়্যা, দ্বিতীয়টি : আল-মাদরাসাতুস সা'দিয়্যা। এটি সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভাই নাসর ইবন সবুক্তগীন নিসাপুরের আমীর থাকাকালে প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় মাদরাসাটি নিসাপুরে প্রতিষ্ঠা করেন আবূ সা'দ ইসমা'ঈল ইবন 'আলী ইবন মুছান্না আসতর আবাদী (মৃ. ৪৪০ হি)। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ওয়া'ইজ ও সূফী সাধক। চতুর্থ মাদরাসাটি নিসাপুরে উস্তাদ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। হামিক এর বর্ণনা মতে আবূ ইসহাকের এ মাদরাসার পূর্বে নিসাপুরে এত সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ কোন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারপর ইমাম সাবকী লিখেছেন যে, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পর আমার প্রবল ধারণা হলো, নিজামুল মূলক শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন।[১০]

উল্লেখিত মাদরাসাগুলো ছাড়া সেই সময়ে নিসাপুর ও এর আসে পাশে শাফিঈ 'আলিম ও ফকীহগণের আরো কয়েকটি মাদরাসা চালু ছিল। কাজী আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন 'আলী ইবন শাহওয়াইহি ফারসী (মৃ. ৩২৪ হি) "মাদরাসা আবূ হাফস আল-ফাকীহ"-তে পাঠদান করতেন।[১১] ফকীহ্ আবূল হাসান মুহাম্মাদ ইবন শু'আইব বাইহাকী (মৃ. ৩২৪ হি) নিসাপুরের মাদরাসাতু আশ-শাওযাফি'-এর শিক্ষক ছিলেন।[১২]

---

১০. তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাকাত আশ-শাফি'ঈয়্যাহ্ আল-কুবরা, (মিসর), খ. ৪. পৃ. ৩১৪
১১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৮
১২. সামআনী, আল-আনসাব, খ. ২, পৃ. ৪১৩

ফকীহ্ আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন বূইয়া যাররাদ 'মারব আর-রূয' নামক স্থানের পাঞ্জ দাহ্-এর মাদরাসায়ে মুরিসত-এ দারস দিতেন।[১৩]

আল-কাযবীনী বলেন : 'আলিমদের নেতা ও অসংখ্য মানুষের শিক্ষক 'আল্লামা রাজি উদ্দীন এসব মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার হালকায়ে দারসে চার শো বিজ্ঞ ফকীহ উপস্থিত হতেন। তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার পূর্বে আর কেউ তা করেন নি। তাঁর পূর্বে 'ইলমুল মুনাজারার কোন নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। তিনিই প্রথম এর নিয়ম পদ্ধতি চালু করেন। এ কারণে তাঁর যুগের সকল 'আলিমের চেয়ে তাঁর দারসের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আল-কাযবীনী আরো বলেন, আবূত তায়্যিব সাহল আস সা'লূকীও এসব মাদরাসার প্রতি আরোপিত হন। তিনি বিচার ও শিক্ষাদানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার দারসের মাজলিসে খুরাসানের ফকীহগণ উপস্থিত হতেন। তিনি যখন পাঠ লিখাতেন তখন তাঁর মাজলিসে পাঁচশো কালির দোয়াত রাখা হতো।[১৪]

ইমাম আবূল মুজাফ্ফার মানসূর ইবন মুহাম্মাদ সাম'আনী মাযহাব পরিবর্তন করে হানাফী থেকে শাফিঈ হয়ে যান। তাকে মারব এর মাদরাসাতু আসহাবিশ শাফি'ঈ-তে রাখা হয়।[১৫] ফকীহ্ আবূল মা'আলী শাবীব ইবন 'উছমান রাহবী বাগদাদের মাদরাসায়ে নাজিয়াতে পড়াতেন। এটি প্রতিষ্টা করেন তাজুল মুলক মারযুবান ইবন খসরূ। তিনি ছিলেন মালিক শাহ সালজূকীর উযীর। উস্তায আবূল কাসিম আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন কাশইয়ারী যায়নুল ইসলাম নিসাপুরীর ছিল একটি নিজের বংশীয় মাদরাসা। সেই মাদরাসার চত্বরে নিজ বংশের 'আলিম ও সম্মানীয় মুরব্বীগণকে দাফন করা হতো।

উযীর নিজামুল মুলক তূসীর পূর্বেই নিসাপুরসহ অন্যন্যা স্থানে 'আলিম ও ফকীহগণ একাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্য থেকে কিছু মাদরাসার পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত মহান উযীর তাঁর উযারতির সময়কালে ইসলামী বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে প্রত্যেকটি বড় শহরে একাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের ভাতা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। তাঁর এই মহৎ কাজের সূচনা সম্পর্কে যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ কান্‌বদীনী লিখেছেন, একবার সুলতান আল্‌প 'আরসালান (মৃ.৪৬৫ হি.) নিসাপুরে যান। সেখানে একটি মাসজিদের পাশ দিয়ে

---

১৩. ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা' ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত) খ. ৩, পৃ. ২০৪
১৪. মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া কাযবীনী, আছারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল 'ইবাদ (মিসর), খ. ১, পৃ. ১৭৪
১৫. তাবাকাত আশ-শাফি'ঈয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩৪৪

যাবার সময় দেখতে পান, ছেড়া-ফাঁটা পুরানো জামা-কাপড় পরে শিক্ষার্থীদের একটি দল মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা সুলতানকে অভ্যর্থনাও জানালো না, তার জন্য দু'আও করলো না। আল্প 'আরসালান নিজামুল মুলকের নিকট সেই সব লোকদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন, এরা শিক্ষার্থী। অত্যন্ত উঁচু মানের ও ভদ্র মেজাযের। পার্থিব ভোগ-বিলাসের ধারে কাছে তারা নেই। তাদের এ অবস্থাই তাদের দারিদ্র ও অভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। উযীর নিজামুল মুলক যখন অনুভব করলেন, তাদের ব্যাপারে সুলতানের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়েছে, তখন বললেন, সুলতান অনুমতি দিলে আমি তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবন তৈরি করে প্রত্যেকের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতাম। তাহলে তারা একাগ্রতার সাথে জ্ঞানার্জনে মগ্ন হতে পারতো এবং সুলতানের জন্য দু'আ করতো। সুলতান তাকে অনুমতি দান করেন। নিজামুল মুলক নিসাপুরের সর্বত্র মাদরাসার জন্য স্বতন্ত্র স্থাপনা গড়ে তোলার ফরমান জারি করেন। সুলতান রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে উযীর নিজামুল মুলক এর জন্য যে বিশেষ বরাদ্দ দেন তার সবই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৬]

এরপর নিজামুল মুলক বাগদাদ, বলখ, নিসাপুর, হিরাত, ইসফাহান, বসরা, মারব, তাবারিস্তান, মূসেল এবং ইরাক ও খুরাসানের প্রতিটি শহরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মাদরাসা "মাদরাসায়ে নিজামি'য়া" নামে প্রসিদ্ধ। বাগদাদে মাদরাসায়ে নিজামি'য়ার প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ৪৫৭ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে এবং এর উদ্বোধন হয় ১০ যুলকা'দা ৪৫৯ হি. সনে। নিজামুল মুলক নির্দেশ দেন, এই মাদরাসার শিক্ষক হবেন ফকীহ আবূ ইসহাক শিরাযী (মৃ: ৪৭৫ হি.)। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্বোধনের দিন শিক্ষার্থীগণ তার সাথে মাদরাসায় এসে পঠন পাঠনে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আবূ ইসহাক শিরাযী অনুপস্থিত থাকলেন। তাঁকে সন্ধান করেও পাওয়া গেল না। তখন ফকীহ আবূ নসর ইবন সাববাগকে ডেকে এনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর আবূ ইসহাক শিরাযীকে তাঁর মাসজিদে পাওয়া যায়। তার ছাত্ররা ইবন সাববাগ এর দারসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নিয়োগ দানের বিশদিন পর তাঁকে বরখাস্ত করে আবূ ইসহাক শিরাযীকে এনে তাঁর স্থানে বসানো হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে দারস দেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর ছাত্ররা নিজামিয়া মাদরাসায় শোক সভার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে নিযামুল মুলকের ছেলে মুয়ায়্যিদুল মুলক আবূ সা'দ আল-মুতাওয়াল্লীকে আবূ ইসহাক শিরাযীর শূন্য স্থলে নিয়োগ দেন। নিয়োগের এ খবর নিযামুল মুলকের নিকট পৌঁছালে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, আবূ ইসহাক শিরাযীর ওফাতের পর মাদরাসা এক বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হোক। অতঃপর

১৬. আছারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল 'ইবাদ খ. ১, পৃ. ৪১২

শায়খ আবূ নাসর 'আবদুস সায়্যিদ ইবন সাব্বাগ-সাবেক শিক্ষককে তার পূর্বের স্থলে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৭]

অতঃপর ইসলামী বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের সকল শাসক, উযীর ও আমীর নিজ নিজ এলাকায় মাসজিদ, মাদরাসা, এবং খানকাসমূহ নির্মাণ করে 'আলিম, ফকীহ্, মুহাদ্দিছ এবং মাশায়িখগণকে সমবেত করেন এবং তাঁদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। এই ব্যাপারে প্রত্যেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি অন্যকে ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। 'আলিমগণের মধ্য থেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান একটি দল ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন এই বলে যে, এখন জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সুলতান ও আমীরদের করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছে এবং 'ইলম ও দীনের উপর দুনিয়াদার লোকদের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাদরাসাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশে একটি চমৎকার বিপ্লব সূচিত হয়। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দীনী পাঠ্যসূচীর মধ্যে পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞান ঢুকানো হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পঠন-পাঠনে নিমগ্ন হয়। যে যুগে ফকীহগণ মাদরাসাসমূহের চার দেওয়ালের মধ্যে পঠন পাঠনে ব্যস্ত ছিলেন তখন মুহাদ্দিছগণ মাসজিদের পরিবেশ থেকে বের হয়ে মাঠে-ময়দানে উন্মুক্ত পরিবেশে হাদীছ বর্ণনা ও লিখনের মাজলিস বসাতেন এবং হাজার হাজার হাদীছের ছাত্র সমবেত হয়ে তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শুনতেন এবং লিখতেন। যে সকল মুহাদ্দিছ হাদীছ লেখাতেন তাঁদের মাজলিসে দরাজকণ্ঠের অনেক ব্যক্তি থাকতেন যাঁরা মুহাদ্দিছের মুখ থেকে বের হওয়া কথাটি মাজলিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়কালের শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ.

আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে

---

১৭. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান (মিসর) খ. ১, পৃ. ৩১

এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।[১৮]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল-কিতাব ও আল-হিকমাতের শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে পাঠান। এ পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবেই তাঁর আগমন হয়েছে। ভিতর-বাইরে, আবাসে-প্রবাসে, রাত-দিন সর্ব অবস্থায় এবং সকল স্থানে তাঁর পবিত্র সত্তাটি ছিল চলমান শিক্ষা কেন্দ্র। বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন সময়ে এক লাখেরও বেশি ছাত্র তথা সাহাবী তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সেই শিক্ষার ওপর 'আমল করেছেন, অন্যদের নিকট সেই জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছেন এবং পৃথিবীবাসী নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তা থেকে উপকার লাভ করেছে। তিনি বলেছেন:[১৯]

مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ وَالْعُشْبَ الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماءَ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفةً أخرى انما هى قيعانٌ لاتُمسك ماءًا ولاتُنْبِتُ كلأً فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فَعِلم وَعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يَقْبَلْ هدى الله الذى أرسلت به (رواه البخارى)

আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইলম দান করে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই মুষলধারার বর্ষণের মত যা ভূমিতে পড়ে এবং উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, তার এমন একটা পরিচ্ছন্ন অংশ পানি শোষণ করে নেয়। তারপর সেখানে প্রচুর ঘাস ও লতা-গুল্ম জন্মায়। আর সেই ভূমির অপর একটি অংশ উদ্ভিদ অঙ্কুরণের অনুপযোগী, যা বর্ষিত পানি ধরে রাখে। আল্লাহ

১৮. সূরা আলে 'ইমরান : ১৬৪
১৯. সাহীহ আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু ফাদলি মান 'আলিমা ওয়া 'আল্লামা, খ. ১, পৃ. ১৭৫, সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল

> সেই পানি দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে সেই পানি পান করে, অন্যদেরকেও পান করায় এবং তা দ্বারা কৃষি ভূমিতে সেচ দেয়। আর ভূমির একটি অংশ হলো প্রস্তরময় প্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত, যা পানি ধরে রাখে না এবং সেখানে উদ্ভিদও গজায় না। এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনকে ভালো মত বুঝেছে, আমার 'ইলম ও হিদায়াত তার উপকারে এসেছে। তা নিজে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে 'ইলম ও হিদায়াত আসার পর মূর্খতা থেকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি এবং আল্লাহর হিদায়াত যা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কবুল করেনি।

কুরআন ও হাদীছের রূপ ও আকৃতিতে নবীর শিক্ষাসমূহের এত বিশাল ভান্ডার আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে যে তার বিপরীতে পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ একান্তই নিঃস্ব ও তুচ্ছ মনে হয়। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাসমূহের ভান্ডারে সকল কথা অত্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার থেকে সামান্য কিছু উপস্থাপন করা হবে। যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দারসের মাজলিস এবং সে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের চিত্র ফুটে ওঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল এমন একজন শিক্ষকই ছিলেন না যে কিছু পুস্তক পড়ে ও পড়িয়ে দায়িত্ব শেষ করবেন, বরং সর্বাবস্থায় সব রকম শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনকারী মু'আল্লিম ছিলেন।

হিজরাতের পূর্বে মক্কার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

হিজরাতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এমন কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় ছিল না যেখানে অবস্থান করে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শেখা ও শেখানোর ধারা অব্যাহত রাখতে পারতেন। রাত-দিন সর্বক্ষণ বিভিন্ন চিন্তা এবং ঘটনার জট লেগেই থাকতো। সেই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সত্তাই ছিল চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কিছু সদস্য চুপিসারে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়াও আবূ বাকর সিদ্দীক (রা), খাব্বাব ইবন আরাত (রা) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন শিক্ষক। এই সময়কালে এমন সব স্থান ও বৈঠককে শিক্ষালয় হিসেবে অভিহিত করা যায় যেখানে নাজুক অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কোন না কোন ভাবে কিছু কুরআন পাঠ শিক্ষা দেওয়া হতো।

মাসজিদে আবূ বাকর (রা)

ইসলামের প্রথম পর্বে মক্কায় যখন মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন অনেকের মত আবূ বাকর (রা) হাবশায় হিজরাতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি মক্কা থেকে পাঁচ রাত্রির দূরত্বের পথ, মতান্তরে ইয়ামানের "বারক আল গিমাদ" নামক স্থানে পৌঁছলেন। একথা "আল-কারা" গোত্রের নেতা ইবনু আদ-দাগিনার কানে গেলে তিনি আবূ বাকরের (রা) সাথে দেখা করে বলেন, আবূ বাকর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি পৃথিবীর এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে আমার রব, আমার প্রভুর 'ইবাদাত করতে পারি। ইবন আদ-দাগিনা আবূ বাকরকে (রা) বলেন ঃ

فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج وَلاَ يخرِج وإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلَّ وتُقْرى الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك.

আপনার মত মানুষ বের হয়ে যেতে পারেন না, বের করে দেওয়াও যায় না। কারণ আপনি বিত্তহীনদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, ইয়াতীম, দুঃস্থদের ভার বহন করেন, অতিথিদের আহার করান এবং সত্যের পথে আগত বাধা-বিপত্তিতে সাহায্য করেন। অতএব আমি আপনার আশ্রয়দানকারী। আপনি ফিরে চলুন এবং আপনার শহরে আপনার রবের 'ইবাদাত করুন।

ইবনুদ দাগিনা আবূ বাকরকে (রা) সংগে নিয়ে মক্কায় আসলেন। তারপর রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকেও উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। কুরাইশরা ইবনুদ দাগিনার আশ্রয়দানের অঙ্গিকার মেনে নিল, তবে তারা ইবনুদ দাগিনাকে বললো ঃ

مر أبا بكر فليعبد ربَّه في داره، فليصل فيها وليقرأ ماشاء، ولايؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتتن نساءناو أبناءنا.

আপনি আবূ বাকরকে বলুন, তিনি যেন তাঁর বাড়ির ভেতরে তাঁর রবের

'ইবাদাত করেন, সেখানে সালাত আদায় করেন এবং যা ইচ্ছা পাঠ করেন। আমাদেরকে যেন কোন রকম কষ্ট না দেন। আর তার সে কাজ যেন জোরে জোরে না করেন। কারণ আমরা ভয় করছি, আমাদের নারী ও সন্তানরা বিভ্রান্তিতে পড়ে না যায়।

ইবনুদ দাগিনা কুরাইশদের এ কথাগুলো আবূ বাকরকে (রা) বললেন। তারপরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره، ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره، وكان يصلى فيه ويقرأ القرأن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبوبكر رجلا بكّاء، لايملك عينيه إذا قرأ القران.

আবূ বাকর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাড়ির ভেতরে তার রবের 'ইবাদাত করতে থাকেন। বাড়ির বাইরে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতেন না এবং কুরআনও জোরে পড়তেন না। অতঃপর আবূ বাকর (রা) তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মাসজিদ বানান। সেখানে সালাত আদায় ও কুরআন পাঠ করতেন। এ দৃশ্য দেখা ও কুরআন পাঠ শোনার জন্য তাঁর চারপাশে মুশরিক নারী ও তাদের সন্তানদের ভীড় জমে যেত। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখতো ও শুনতো। আর আবূ বাকর (রা) তো ছিলেন একজন অধিক ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, কুরআন পাঠের সময় তিনি তাঁর দু'চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেন না।

এ অবস্থা কুরাইশ গোত্রের মুশরিক নেতাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে। তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠায়। তিনি উপস্থিত হলে তারা তাকে বলে আমরা তোমার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে শর্তের উপর আবূ বাকরকে (রা) আশ্রয় দিয়েছিলাম তা তিনি ভঙ্গ করেছেন এবং নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় মাসজিদ বানিয়ে সেখানে প্রকাশ্যে সালাত আদায় ও কুরআন পাঠ করছেন। আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের নিয়ে শঙ্কিত। যদি তিনি পূর্বের প্রতিশ্রুতিমত তাঁর কর্মকান্ড বাড়ির অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে কোন আপত্তি নেই, অন্যথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আপনার নিরাপত্তা থেকে

বেরিয়ে যেতে চান কিনা? কারণ আমরা আপনাকে দেওয়া অঙ্গিকার যেমন ভঙ্গ করতে চাই না তেমনি প্রকাশ্যে তাঁর এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দিতে পারিনা। আয়িশা (রা) বলেন, ইবনুদ দাগিনা আবূ বাকরের (রা) নিকট গিয়ে বলেন, আপনি জানেন আপনার সংগে আমার কী অঙ্গীকার হয়েছিল। হয় আপনি তা মেনে চলুন, না হয় আমার নিরাপত্তার অঙ্গীকার আমাকে ফিরিয়ে দিন। আমি এটা চাইনা যে, আরববাসী একথা শুনুক যে, আমি এক ব্যক্তির ব্যাপারে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। আবূ বাকর বললেন ঃ

فإنى أردُّ إليك جوا رك وأرضى بجوار الله عز وجل.

আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট থাকছি।[২০]

মাসজিদে আবূ বাকর-এ যেমন কোন মু'আল্লিম ও কারী ছিলেন না, তেমনিভাবে সেখানে কোন শিক্ষার্থীও ছিল না। অবশ্য এই মাসজিদটি ছিল মক্কার কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র এবং এখানে তখনকার মারাত্মক বৈরী পরিবেশে কাফিরদের ছোট্ট শিশু-কিশোররা কুরআন তিলাওয়াত শুনতো।

ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাবের (রা) শিক্ষাকেন্দ্র

কুরাইশ বংশের 'আদাবিয়্যা শাখার ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব ইবনু নুফায়ল ছিলেন 'উমার ইবন খাত্তাবের বোন। ইসলামের সূচনাপর্বে তিনি স্বামী সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই নিজেদের গৃহে খাব্বাব ইবন আরাত (রা)-এর নিকট কুরআন শিখতেন। 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তরবারি হাতে নিয়ে বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, বোন ও বোনের স্বামী উভয়ে কুরআন পাঠ করছেন। সীরাতে ইবন হিশামে এসেছে।[২১]

وعندهما خباب بن الأ رت معه صــحيفة فيــه طــه يقرءهما إياًّها.

তাঁদের দু'জনের নিকট খাব্বাব ইবন আরাত (রা) ছিলেন। তার নিকট

---

২০. বুখারী, কিতাবুল কিফালা, বাবু জিওয়ারু আবী বাকর আস-সিদ্দীক; ইবন কাছীর, আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যা (বৈরুত) খ. ১ পৃ. ২৭৮-২৮০, ইউসুফ আল-কান্দালুবী, হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশক) খ. ১, পৃ. ২৮২-২৮৪

২১. সীরাতু ইবন হিশাম (মিসর) খ. ১, পৃ. ৩৪৪

সহীফা (পুস্তিকা) ছিল যাতে সূরা তা-হা' লিখিত ছিল এবং তিনি তাদের দু'জনকে তা পাঠ করাচ্ছিলেন।

সীরাতে হালাবিয়্যাতে 'উমারের (রা) কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ভগ্নিপতির গৃহে দু'জন মুসলিমের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের একজন খাব্বাব ইবন আরাত (রা) এবং অন্যজনের নাম আমার স্মরণ নেই। খাব্বাব ইবন আরাত (রা) আমার বোন-ভগ্নিপতির নিকট যাওয়া আসা করতেন এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা) আরো বলেন :[২২]

كان القوم جلوساً يقرؤن صحيفة معهم.

এ দলটি যারা তাদের কাছে ছিল বসে বসে সহীফা পাঠ করছিল।

ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাবের গৃহটি কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র এবং একটি শিক্ষালয় বলা যেতে পারে। কারণ সেখানে কম পক্ষে দু'জন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া 'উমারের (রা) বর্ণনাতে "قوم" শব্দ এসেছে যা দ্বারা দু'-এর অধিক সংখ্যা বুঝা যায়।

দারুল আরকামের শিক্ষা কেন্দ্র

আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা) মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। মক্কায় তাঁর বাড়িটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। ইসলামের ইতিহাসে এই স্থানটির গুরুত্ব অত্যধিক। মক্কার বরকতময় স্থানসমূহের মধ্যে এটিকে গণ্য করা হয়। এই গৃহটিকে 'দারুল ইসলাম' (ইসলামের ঘর), "মুখতাবা" (আত্ম গোপনের স্থান) অভিধায় স্মরণ করা হয়। আল-আরকামের (রা) ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি প্রথম পর্বের মুহাজিরদের একজন। দশজনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি "হিল-ফুল ফূদুল" সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি হিঃ ৫৫ সনে মাদীনায় মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল আশির উর্ধ্বে।[২৩]

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার শক্তিহীন মুসলিমগণ হাবশায় হিজরাত করেন। মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমগণ অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন। এমন কি নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। এখান থেকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

২২. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৩০১

২৩. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৫২-২৫৩, টীকা-১। ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখুল ইসলাম (বৈরুত) খ. ১, পৃ. ৮০

ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং সেখানে অবস্থান করেই সাহাবীগণকে কুরআনের তা'লীম দিতেন। কুরআনের যতটুকু নাযিল হতো তা তাদেরকে মুখস্থ করাতেন।[২৪]

ইবন সা'দের তাবাকাত ও আল হাকিমের আল-মুসতাদরিকে এসেছে :

كان النبى صلى الله عليه وسلم يسكن فيها فـــى أول الاسلام وفيها يدعو الناس إلى الاسلام فأسلم فيها قوم كثير.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের সূচনা পর্বে এই গৃহে অবস্থান করতেন এবং মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। আর এখানে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৫]

আবূল ওয়ালীদ আল-আযরাকী তাঁর "আখবারু মাক্কাহ্" গ্রন্থে লেখেনঃ

يجتمع هو وأصحابه عند الأرقم بن أبـــى الأرقـــم و يقرءهم القرأن و يعلمهم فيه.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ দারুল আরকামে সমবেত হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে কুরআন পড়াতেন ও দীনের তা'লীম দিতেন।[২৬]

দারুল আরকাম শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে 'উমার (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণকারী দু'ব্যক্তিকে কোন স্বচ্ছল মুসলিমের দায়িত্বে দেওয়া হতো। তারা সেই স্বচ্ছল লোকটির বাড়িতে থাকতো, খেতো। এই দারুল আরকামে একবার প্রায় একমাস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান করে গোপনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত ও দীনী তা'লীম দিতে থাকেন। এটি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাস স্থল। পানাহারের ব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছল সাহাবায়ে কিরামের গৃহে।

এ সময় 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলিমগণ প্রকাশ্যে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করতে শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে ঈমানী শক্তি ও

---

২৪. ড. মুহাম্মাদ আল-আজ্জাজ আল-খাতীব, আস-সুন্নাহ্ কাবলাত তাদবীন (বৈরুত), পৃ. ৩৭
২৫. আবূ 'আবদিল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরিক, খ. ৩, পৃ. ৫২২
২৬. আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কাহ্ (মাককাহ্ মুকাররামাহ্), খ. ২ পৃ. ২১০

সাহস সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা) এই বাড়িটি তাঁর সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

উল্লেখিত স্থানগুলো ছাড়াও মক্কায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) দু'জন, চারজন করে একত্র হয়ে কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন। বিশেষ করে দারুল আরকামে 'উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমগণ অত্যন্ত সাহাসী হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা প্রকাশ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরআন শোনা ও শোনানোর কাজ শুরু করেন। শি'আবু আবী তালিব- এ অন্তরীন থাকাকালীন প্রায় তিন বছর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে মুসলিমদেরকে কুরআন শোনাতেন এবং তাঁদের পড়া শুনতেন। এখানে আবূ তালিবের খান্দানের লোকেরা ছাড়াও অন্যদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা স্বাভাবিক যে, তাঁরাও শেখা ও শেখানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর মক্কায় রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িটি মুসলিমদের সমাবেশ স্থল ও শিক্ষালয়ে পরিণত হয়। সেখানে তারা কুরআন ও ইসলামের বিধি বিধান শিখতেন।[২৭]

এমনিভাবে হাবশায় হিজরাতকালীন সময়ে সেখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা) শেখা ও শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এই হাবশায় হিজরাতকারীদের মধ্যে মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা)ও ছিলেন, যাঁকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরাতের পূর্বে মু'আল্লিম হিসেবে মাদীনায় পাঠান। হাবশায় মুহাজিরদের মধ্যে জা'ফার ইবন আবী তালিবও ছিলেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও মুসলিমদের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলেন, নাজ্জাসীকে সূরা "كهيعص" প্রথম থেকে পাঠ করে শোনান। সে পাঠ শুনে নাজ্জাশী কেঁদে ফেলেন।

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় কাফির-মুশরিকদের মাজলিস-মাহফিল, হাট-বাজার, মেলা, প্রদর্শনীসমূহ এবং হজ্জ মওসুমে বিভিন্ন অবস্থান ও স্থানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সেখানে তিনি মানুষকে কুরআন শোনাতেন। এ জাতীয় সকল স্থানই কুরআন ও দীনের শিক্ষালয় ছিল।

মাদীনা মুনাওয়ারার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

মক্কা মুকাররামায় দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দেয় এবং সেখানকার শক্তিশালীদের যুলমের শিকার হয়। তবে মাদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এখানে সর্বপ্রথম সম্মানিত, মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং গোত্রীয় নেতাগণ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে সব ধরনের

---

২৭. আস-সুন্নাহ্ কাবলাত তাদবীন, পৃ. ৩৭

সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানে কুরআন মাজীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

ما يفتح من مصر أومدينة عنوة فان المدينـــة فتحـــت بالقرأن.

কিছু দেশ অথবা শহর শক্তি প্রয়োগে ও বলপূর্বক জয় করা হবে। তবে মাদীনা বিজিত হয়েছে কুরআন দ্বারা।

'আকাবার প্রথম বাই'আতের পর থেকেই মাদীনায় কুরআন ও দীন শিক্ষার তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এ সময় আনসারদের দু'টি গোত্র আওস ও খাযরাজ-এর সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। মক্কা থেকে ব্যাপক ও আনুষ্ঠানিক হিজরাতের দু'বছর পূর্বেই মাদীনায় মাসজিদ নির্মাণ ও কুরআনের তা'লীমের কাজ শুরু হয়ে যায়। জাবির (রা) বলেন:

لقد لبثنا بالمدينة المنورة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين نعمّر المســـاجد و نقـــيم الصلواة.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আগমনের দু'বছর পূর্বেই আমরা মাসজিদসমূহ নির্মাণ ও সালাত আদায় করতাম।

এই দুই বছর সময়কালে নির্মিত মাসজিদসমূহে সালাতের ইমামগণ সেখানে মু'আল্লিমের দায়িত্বও পালন করতেন। সে সময় পর্যন্ত শুধু সালাত ফরয হয়েছিল। এ কারণে কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের সাথে শরী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান ও উত্তম নৈতিকতার তা'লীম দেওয়া হতো। সেখানে স্বতন্ত্র তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল, যেখানে নিয়মমাফিক তা'লীম দেওয়া হতো। এই তিনটি শিক্ষা কেন্দ্র এমনভাবে চালু ছিল যে, মাদীনা শহর ও এর আশে পাশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুসলিমগণ অতি সহজেই শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। প্রথম কেন্দ্রটি ছিল মাদীনার মধ্যভাগে অবস্থিত মাসজিদে বানূ যুরাইকে। সেখানে তা'লীম দিতেন রাফি' ইবন মালিক যারকী আল-আনসারী (রা)। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি ছিল মাদীনা শহরের দক্ষিণে একটু দূরে মাসজিদে কুবায়। সেখানে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা) তা'লীমের দায়িত্ব পালন করতেন। সা'দ ইবন খায়ছামার (রা) বাড়িটি ছিল এই কুবা মাসজিদের সাথে, আর এই বাড়িটি

"বাইতুল 'উয্‌যাব" (بيت العزّاب) নামে পরিচিত ছিল। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ এখানে অবস্থান করতেন।

তৃতীয় কেন্দ্রটি মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে কিছু দূরে উত্তর দিকে,"নাকী'উল খাদিমাত" (نقيع الخضمات) নামক এলাকায়। সেখানে পড়াতেন মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা)। আর সা'দ ইবন যুরারার (রা) বাড়িটি ছিল যেন একটি স্বতন্ত্র মাদরাসা। এই তিনটি স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও আনসারদের বিভিন্ন গোত্র ও বসতি এলাকায় কুরআন পাঠ ও দীনী তা'লীমের কাজ চলতো।

মাসজিদে বানী যূরাইক কেন্দ্র

'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মাদীনার উল্লেখিত তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে সর্বপ্রথম মাসজিদে যুরাইকে কুরআনের তা'লীমের ব্যবস্থা করা হয়।

أول مسجد قرئ فيه القرأن بالمدينة مسجد زريق.

> মাসজিদে যুরাইক মাদীনার প্রথম মাসজিদ যেখানে প্রথম কুরআন পাঠ করা হয়।

এই শিক্ষা কেন্দ্রের মু'আল্লিম ও কারী ছিলেন রাফি' ইবন মালিক যারকী (রা)। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বানু যুরাইক শাখার সন্তান, 'আকাবার প্রথম বাই'আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দশ বছরের মধ্যে যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল তার সবটুকুই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দান করেন। তার মধ্যে সূরা ইউসুফও ছিল। তিনি তাঁর গোত্রের নাকীব ও সর্দার ছিলেন। তাঁকে মাদীনার কামিল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য করা হতো। সেই সময়ের পরিভাষায় "কামিল" এমন সব ব্যক্তিকে বলা হতো যারা লিখতে পড়তে জানতো, তীর ও বর্শা নিক্ষেপে দক্ষতা ও পূর্ণ জ্ঞান রাখতো। রাফি' ইবন মালিক (রা) এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

তিনি আকাবার বাই'আত শেষে মাদীনায় ফিরে এসে নিজ গোত্রের মুসলিমদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং গোত্রের বসতি এলাকায় একটি উঁচু স্থানে বসে মানুষকে তা'লীম দিতে শুরু করেন। মাদীনায় সর্বপ্রথম সূরা ইউসুফের তা'লীম রাফি' ইবন মালিকই দেন। তিনি এখানকার প্রথম মু'আল্লিম। পরবর্তীতে এই চত্বরে মাসজিদে বনী যুরাইক নির্মিত হয়। এটির অবস্থান ছিল শহরের মধ্যস্থলে মাসজিদে গামামার নিকটে দক্ষিণ দিকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনা আগমনের পর রাফি' ইবন মালিকের (রা) দীনী দা'ওয়াত, শিক্ষা কার্যক্রম ও সুস্থ

স্বভাব-প্রকৃতি দেখে খুব খুশী হন। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উস্তাদ এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ছিলেন খায়রাজ গোত্রের যুরাইক শাখার মুসলিমগণ।[২৮]

মাসজিদে কুবার শিক্ষাকেন্দ্র

দ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল মাদীনার দক্ষিণে কিছু দূরে কুবা পল্লীতে। সেখানে মাসজিদ নির্মিত হয়। 'আকাবার বাই'আতের পর বহু সাহাবী যাদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল, মক্কা থেকে হিজরাত করে কুবায় এসে উঠতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। এই মুহাজিরদের মধ্যে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা) ছিলেন কুরআনের সবচেয়ে বড় 'আলিম। তিনি এই মাসজিদে কুবাতে তা'লীম দিতেন, ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনা আসা পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত থাকে।

'আবদুর রহমান ইবন গানাম বলেন ঃ[২৯]

> حدثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم فى مسجد قبا ءاذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا.

> রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দশজন সাহাবী আমাকে বলেছেন, মাসজিদে কুবায় আমরা দীনী 'ইলম পরস্পর শিখতাম, শেখাতাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা পড়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুযায়ী আমল না করবে প্রতিদান পাবে না।

এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায় কুবার মুহাজিরদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি কুরআনের 'আলিম ও ছাত্র ছিলেন। তাদের মধ্যে সালিম (রা) ছিলেন সবচেয়ে বড় 'আলিম। আর তিনি সেখানে সালাতের ইমামতির সাথে সাথে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

---

২৮. আল-বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান (মিসর), পৃ. ৪৫৯; ইবন হাজার আল-'আসকিলানী, আল-ইসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত), খ. ২, পৃ. ১৯০; নূরুদ্দীন আস-সামহূদী, ওয়াফা আল-ওয়াফা বিআখবারিল মুসতাফা (মিসর), খ. ২, পৃ. ৮৫

২৯. ইবন 'আবদিল বার আল-আন্দালুসী, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, (মিসর) খ. ২, পৃ. ৬

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন ঃ[৩০]

لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرانا.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে প্রথম পর্বের মুহাজিরগণ যখন কুবার 'আল-'উসবা' নামক স্থানে আসেন তখন তাদের ইমামতি করতেন সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা। তিনি তাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।

সালিম (রা) ছিলেন প্রসিদ্ধ কুরআন বাহকদের একজন। একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কুরআন পড়া শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে সালিমের মত কুরআনের 'আলিম ও কারী সৃষ্টি করেছেন। তিনি সাহাবীগণকে একথাও বলেন, তোমরা এ চারজন কুরআনের 'আলিম ও কারীর নিকট কুরআন পড়বে ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ, সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, উবাই ইবন কা'ব ও মু'আয ইবন জাবাল (রা)। একটি যুদ্ধে সালিম (রা) মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে কিছু লোকের অনাস্থা সৃষ্টি হলে তিনি বলেন :

بئس حامل القرأن أنا إن فررت.

যদি আমি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই তাহলে তো অতি নিকৃষ্ট কুরআন বাহক হয়ে যাব।

তারপর তিনি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাম হাতে পতাকাটি তুলে ধরেন। সেটিও আহত হলে পতাকাটি বগলে ধারণ করেন। তারপর মাটিতে ঢলে পড়েন। এ অবস্থায় তার মনিব আবূ হুযায়ফার (রা) অবস্থা জানতে চাইলেন। যখন জানতে পারলেন তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। তখন বললেন, আমাকে তাঁর পাশেই দাফন করবে। আবূ হুযায়ফা (রা) সালিমকে (রা) পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩১]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সালিমের (রা) জ্ঞান-গরিমা, বিশেষত আল-কুরআনে তাঁর

---

৩০. সাহীহ আল বুখারী, বাবু ইমামতিল 'আবদি ওয়াল মাওলা
৩১. আল ইসাবা, খ. ৩, পৃ. ৫৭

পারদর্শিতার সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। আর একথাও জানা যায় যে, তিনি কুবার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন।

এখানে আবূ খায়ছামা সা'দ ইবন খায়ছামা আওসীর (রা) বাড়িটি ছিল যেন কুবা মাদরাসার ছাত্রাবাস। তিনি বানু 'আমর ইবন 'আওফ গোত্রের নাকীব ও নেতা ছিলেন। 'আকাবার বাই'আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত। বাড়িটি ছিল খালি। এ কারণে নবাগত মুহাজিরগণ এখানে অবস্থান করতেন। বিশেষত: যাঁরা তাদের স্ত্রী সন্তান মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন অথবা যাদের কোন সন্তান ছিল না। এ কারণে এ বাড়িটিকে (বাইতুল 'উযযাব) بيت العُزاب –অবিবাহিতদের বাড়ি এবং 'বাইতুল আগরাব' (বহিরাগতদের বাড়ি) বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে এসে কুবাতে কুলছুম ইবন হিদম (রা)-এর বাড়িতে ওঠেন এবং অবস্থান করেন। এই বাড়ির পাশেই ছিল সা'দ ইবন খায়ছামার 'বাইতুল 'উযযাব' বাড়িটি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরবর্তীতে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে যেতেন এবং মুহাজিরদের সাথে বসে তাদেরকে খুশি করার জন্য কথা বলতেন।[৩২]

কুবা মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক সকলেই ছিলেন প্রথম পর্বের মুহাজিরবৃন্দ এবং তাঁদের সাথে আরো ছিলেন স্থানীয় মুসলিমগণ।

নাকী' আল-খাদিমাত শিক্ষালয়

তৃতীয় শিক্ষালয়টি ছিল মাদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে আস'আদ ইবন যুরারার (রা) গৃহে। আর এর অবস্থান ছিল হাররা বানী বায়াদাতে। এ জনপদটি বানূ সালামার আবাসস্থলের পরে "নাকী' আল-খাদিমাত" নামক এলাকায়। এটি ছিল উর্বর সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে। এখানে "খাদীমা" নামক এক প্রকার নরম, দেখতে সুন্দর ঘাস জন্মাতো। এদিক থেকেই 'আকীক উপত্যকায় বন্যা আসতো। পরবর্তীকালে 'উমার (রা) এটাকে জিহাদের জন্য পালা ঘোড়ার চারণভূমি বানান। ইয়া'কূত আল-হামাবী স্থানটির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[৩৩]

هو نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب لخيل المسلمين.

'নাকী' আল-খাদিমাত' হলো সেই স্থান যেটাকে 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) মুসলিমদের ঘোড়ার চারণভূমি বানান।

---

৩২. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৯৩
৩৩. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত) খ. ৫, পৃ. ৩৪৮

এই শিক্ষালয়টি অবস্থানগত দিক দিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় হওয়ার সাথে সাথে ব্যাপকতা ও কল্যাণধর্মীতার দিক দিয়ে অন্য দু'টি শিক্ষালয় থেকে ছিল ভিন্নধর্মী ও উন্নতমানের।

'আকাবার বাই'আতের সময় আনসারদের দু'টি গোত্র- 'আওস ও খাযরাজের নাকীব ও নেতাগণ ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট মাদীনায় কুরআন ও দীনী তা'লীমের জন্য একজন মু'আল্লিম পাঠানোর আবেদন জানান। তাদের দাবী ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) তাদের সাথে পাঠান। ইবন ইসহাকের বর্ণনা মতে 'আকাবার প্রথম বাই'আতের পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) আনসারদের সাথে মাদীনায় পাঠান। তিনি বলেন:[৩৪]

فلما انصرف عنه القوم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عميربن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى، وأمره أن يقرئهم القران ويعلمهم الإسلام، ويفقههم فى الدين فكان يسمى المقرى بالمدينة مصعب، وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس أبى أمامة.

আনসারগণ যখন বাই'আতের পরে মাদীনায় ফিরতে লাগলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) পাঠান। যাবার সময় তাকে বলে দেন, সেখানে তুমি মানুষকে কুরআন পড়াবে, ইসলামের তা'লীম দেবে এবং দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবে। মুস'আব (রা) মাদীনায় "মুকরী" (কুরআন পাঠ শিক্ষাদানকারী) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয় আস'আদ ইবন যূরারার (রা) বাড়িতে।

এই দুই মহান ব্যক্তি কুরআনের তা'লীম ও ইসলামের তাবলীগের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী ছিলেন। মুস'আব (রা) কুরআনের তা'লীমের সাথে সাথে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সালাতের ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। এক বছর পর তিনি মাদীনাবাসীদেরকে নিয়ে মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন উপস্থিত হন তখন তার "মুকরী" উপাধিটি বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল।

---

৩৪. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১ পৃ. ৪৩৪, উসদুল গাবা, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯

আস'আদ ইবন যুবারা (রা) জুম'আর নামায ফরজ হওয়ার পূর্বেই মাদীনায় জুম'আর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই জামা'আতের ইমামতিও করতেন মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা)। এ কারণে কোন কোন বর্ণনায় জুম'আ কায়িম করার সূচনাকে তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়।

মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) ছাড়াও ইবন উম্মি মাকতূম (রা)ও এখানে তা'লীম দিতেন। তিনি মুস'আব ইবন 'উমাইরের (রা) সাথে মাদীনায় আসেন। বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন:

أول من قدم علينا مصعب بن عمير و ابن أم مكتـــوم وكانوا يقرؤن الناس.

আমাদের এখানে সর্বপ্রথম মুস'আব ইবন 'উমাইর এবং ইবন উম্মি মাকতূম আসেন। তারা মানুষকে কুরআন পড়াতেন।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুস'আবকে (রা) বিশেষভাবে তা'লীমের জন্য পাঠান এবং ইবন উম্মি মাকতূম (রা) তাঁর সাথে ছিলেন, এ কারণে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে তার সম্পৃক্ততার কোন আলোচনা আসেনা। তাছাড়া তিনি একজন অন্ধব্যক্তি ছিলেন, আর তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমও ছিল সীমিত পরিসরে।

মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) সূচনা পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা পরিবারের লোকেরা জানতে পেরে তাঁর উপর ভীষণ দৈহিক নির্যাতন চালায় এবং ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু মুস'আব (রা) কোন রকমে পালিয়ে হাবশাগামী মুহাজিরদের দলে ভীড়ে যান। কিছুকাল হাবশায় অবস্থান করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। অত:পর মাদীনায় হিজরাত করেন। বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেন, খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সদস্য আস'আদ ইবন যূরারা (রা) আকাবার প্রথম বাই'আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর গোত্রের নাকীব ছিলেন। নাকীবগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়সী। হিজরী ০১ সনে যখন মাসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ চলছে তখন তাঁর ইনতিকাল হয়। তখন নাজ্জার গোত্রের লোকেরা তাদের জন্য আরেকজন নাকীব নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবেদন জানায়। তিনি তাদেরকে বলেন, আমিই তোমাদের নাকীব। অপর একটি মতে তিনি আকাবার বাই'আতের পূর্বেই মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মাদীনায় আনসারদের মধ্যে প্রথম মুসলিম।

ইবন উম্মি মাকতূমের (রা) প্রকৃত নাম 'আমর অথবা 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স। উম্মুল মুমিনীন খাদীজার (রা) মামাতো ভাই এবং প্রথম পর্বের একজন মুসলিম। সাধারণত

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিহাদে যাওয়ার সময় তাঁকে মাদীনার আমীর নিয়োগ করে যেতেন। তিনি সালাতের ইমামতি করতেন। একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

নাকী' আল-খাদিমাত শিক্ষাকেন্দ্রের একজন ছাত্র বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বেই আমি "তিওয়ালে মুফাসসাল" এর কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আগমনের পূর্বে আমি সতেরটি সূরা পড়ে ফেলেছিলাম এবং যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তা শোনালাম তিনি ভীষণ খুশি হলেন।[৩৫]

নাকী আল-খাদিমাত– এর এই শিক্ষাকেন্দ্রটি শুধু একটি কুরআনী মকতব বা মাদরাসা ছিল না, বরং সাধারণ হিজরাতের পূর্বে মাদীনায় একটি ইসলামী কেন্দ্রের অবস্থানে ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল। তাদের সর্বশেষ যুদ্ধটি "হারবুল বু'আছ"-বু'আছ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এটি সংঘটিত হয় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে। এ সব যুদ্ধে দুই গোত্রের বহু মানুষ নিহত হয়। তাদের মধ্যে বহু সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে গোত্র দু'টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ইসলাম তাদের ক্ষেত্রে করুণা ও দয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বলেন।[৩৬]

كان يوم بعاث يومًا قدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدافترق ملؤهم وقُتِلَتْ سرواتهم وجرحوا، قدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى دخولهم فى الاسلام.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনা আগমনের পূর্বেই আল্লাহ বু'আছ যুদ্ধ সংঘটিত করান। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসেন তখন উভয় গোত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের বড় বড় নেতা নিহত ও আহত হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য পূর্ব

---

৩৫. শামসুদ্দীন আয-যাহরী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, (হায়দারাবাদ) খ. ১, পৃ. ৩০
৩৬. সাহীহ্ আল-বুখারী, বাবুল কাসামাহ ফিল জাহিলিয়্যাহ

থেকেই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

ইসলাম গ্রহণের পরও দু'গোত্রের মধ্যে রেষারেষির ভাব বিদ্যমান ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ইমামতির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারতো, এ কারণে উভয় গোত্র মুস'আব ইবন উমাইরের (রা) ইমামতির ব্যাপারে একমত হয়।

فكان مصعب بن عميـــر يـــؤمهم، وذلـــك إن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمّه بعض فجمع بهم أول جمعة فى الإسلام.

মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) তাদের সকলের ইমামতি করতেন। কারণ 'আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় একে অপরের ইমামতি অপসন্দ করতো। এজন্য দুটি গোত্র ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের প্রথম জুম'আ প্রতিষ্ঠা করেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মুস'আবকে (রা) লেখেন যে তুমি সালাতুল জুম'আ পড়াবে। সম্ভবত এই কারণে জুম'আর সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে মাদীনায় তা কায়িম করা হয়। প্রথম জুম'আর জামা'আতে মাত্র চল্লিশজন মুসলিম অংশগ্রহণ করেন। পরে এসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চার শো পর্যন্ত পৌঁছে। প্রথম জুম'আর দিন একটি ছাগল যবেহ করা হয় এবং তা দ্বারা মুসল্লীগণকে আহার করনো হয়। এতে দু'গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার আবেগ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

একই সাথে মাদীনার ইয়াহুদীদের يوم السبت তথা 'সাবত দিনের' চেতনার বিপরীতে এখানকার মুসলিমদের মধ্যে তার থেকে একদিন পূর্বে عيد الأسبوع তথা সাপ্তাহিক খুশির দিনের আনন্দ ও সমাবেশের চেতনার প্রকাশ পায়। সম্ভবত ইয়াহুদীদের বিপরীতে এটাই ছিল প্রথম সাহস, ঐক্য ও ধর্মীয় শক্তির প্রকাশ। তাছাড়া এই দীনী ও ইসলামী কেন্দ্রের কারণে মাদীনার ইয়াহুদীদের (ফিহর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত) ধর্মীয় ও শিক্ষাকেন্দ্র বাইতুল মাদারিস (بيت المدارس)-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব কমে যায়। এই কেন্দ্রে তারা সমবেত হয়ে শেখানো এবং প্রার্থনা করার মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতো। এখন থেকে 'আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইয়াহুদীদের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।[৩৭]

---

৩৭. ইবন দুরাইদ, আল-ইশতিকাক, পৃ. ২৬

ইসলামের পূর্বে 'আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ে লেখাপড়ার প্রচলন কম ছিল। এ ব্যাপারে তারা ইয়াহুদীদের মুখাপেক্ষী ছিল। অবশ্য কিছু লোক এ সময় লিখতে ও পড়তে জানতো। তাদেরই মধ্যে ছিলেন রাফি' ইবন মালিক যারকী, যায়দ-ইবন ছাবিত, উসাইদ ইবন হুদাইর, সা'দ ইবন 'উবাদা, উবায় ইবন কা'ব (রা) প্রমূখ।[৩৮] এই লোকগুলোর অধিকাংশ ব্যাপক হিজরাতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মাদীনায় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কাজে তৎপর ছিলেন। নাকী'আল-খাদিমাত কেন্দ্রের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তেমনিভাবে সম্পর্ক ছিল 'আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

এই তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেই সময় মাদীনা মুনাওয়ারার বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে শিক্ষার মাজলিস ও আসর চালু ছিল। বিশষ করে বানূ নাজ্জার, বানূ 'আবদিল আশহাল, বানূ জুফার, বানূ 'আমর ইবন 'আওফ, বানূ সালিমসহ বিভিন্ন গোত্রের মাসজিদে এই শিক্ষা মাজলিসের ব্যবস্থা ছিল। 'উবাদা ইবন সামিত 'উতবা ইবন মালিক, মু'আয ইবন জাবাল, 'উমার ইবন সালামা, উসাইদ ইবন হুদাইর, মালিক ইবন হুওয়াইরিছ (রা) উল্লেখিত স্থান ও মাসজিদসমূহের ইমাম ও মু'আল্লিম ছিলেন।

এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রের "নিসাবে তা'লীম" তথা পাঠ্যসূচি বিষয়ে একথা জানা প্রয়োজন যে, সে সময় ইবাদাতের মধ্যে কেবল সালাত ফরয হয়েছিল। আর 'আকাবার বাই'আতের সময় মাদীনার আনসার মহিলাদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই বাই'আত ছিল এরকম! "আমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করবো না। চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবো না, কারো উপর মিথ্যা দোষারোপ করবো না এবং ভালো কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবো না।"

এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন ও সালাতের তা'লীমের সাথে পূর্বের বিষয়সমূহের তা'লীম দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) বিদায় দেওয়ার সময় তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেন।[৩৯]

وأمره أن يقرءهم القرأن ويعلمهم الاسلام ويفقّهم فى الدين فكان يسمّى المقرى بالمدينة.

মানুষকে কুরআন পড়াবে, ইসলামের তা'লীম দেবে এবং তাদেরকে দীনের তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী করবে। মাদীনায় তাঁকে 'মুকরী' বলা হতো।

---

৩৮. ফুতূহ আল বুলদান, পৃ. ৪৫৯
৩৯. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৩৪

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই দিকনির্দেশনা অনুসারে এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রে কুরআনের তা'লীম দেওয়া হতো, দীন শেখানো হতো। সাধারণভাবে আয়াত ও সূরাসমূহ মৌখিকভাবে মুখস্থ করানো হতো। এই শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ রাত-দিন সকাল-সন্ধ্যার শর্ত থেকে মুক্ত ছিল। যে কেউ যে কোন সময় এখানে এসে সবক নিতে পারতেন।

মক্কা ও মাদীনার মধ্যবর্তী "গামীম" শিক্ষাকেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সত্তাটিই ছিল ইসলামী শিক্ষার একটি চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। হিজরাতের সফরের মধ্যে কুরআনের তা'লীমের ধারা অব্যাহত ছিল। তিনি মক্কা ও মাদীনার মধ্যবর্তী "গামীম" নামক স্থানে সূরা "মারইয়াম" এর তা'লীম দেন। ইবন সা'দ লেখেন :[৪০]

لمَّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم اتاه بريدة ابن الحصيب الأسلمى فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء ثمانين بيتًا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه كان رسول الله قد علَّم بريدة بن الحصيب ليلتئذٍ صدرًا من سورة مريم، وقدم بُريدة بن الحصيب بعد أن مضت بدر و أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتعلم بقيتها وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من ساكنى المدينة.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা থেকে মাদীনার দিকে হিজরাত করেন এবং পথিমধ্যে "গামীম" নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন তখন বুরাইদা ইবন আল হাসীব আল-আসলামী তাঁর নিকট

---

৪০. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, (বৈরূত), খ. ৪, পৃ. ১৭৬; হায়াতুস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ৩; উসুদুল গাবা, খ. ১, পৃ. ২৪৩

আসেন। তিনি বুরাইদাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। অত:পর বুরাইদা এবং তাঁর সংঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রায় আশিটি ঘরের মানুষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতুল 'ঈশা আদায় করলেন। তারাও সকলে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রাতে বুরাইদাকে সূরা মারয়ামের প্রথম দিকের কিছু আয়াত তা'লীম দেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর বুরাইদা যখন মাদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসেন তখন সূরা মারইয়ামের অবশিষ্ট অংশ শিখে নেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাদীনায় থেকে যান।

এই ঘটনাটি ইবন সা'দ অন্যত্র সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাতের সফরে বুরাইদা ইবন আল হাসীবের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাকে সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কিছু আয়াত তা'লীম দেন। উহুদ যুদ্ধের পরে বুরাইদা যখন মাদীনায় আসেন, সূরার বাকী অংশ তা'লীম নেন। হাফিয ইবন হাজারও এরকমই লিখেছেন।[৪১]

গামীম (গাইন বর্ণের উপর ফাত্হ غَمِيْم) মাদীনার নিকটবর্তী রাবিগ ও হুজফার মধ্যবর্তী, অথবা 'উসাফান ও মাররুজ জাহরান এর মধ্যবর্তী একটি স্থান। এই গামীমে বানূ আসলামের আশিটির অধিক বাড়ির লোকদের বসতি ছিল। যাদের সংখ্যা কয়েক শো হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে বুরাইদা ও তাঁর সংঙ্গীগণই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইমামতিতে সালাতুল 'ঈশা আদায় করেন। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে কেবল বুরাইদার কুরআনের তা'লীম গ্রহণের কথাটিই এসেছে।

বুরাইদা ইবন হাসীব ইবন 'আবদুল্লাহ আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন উঁচু মর্যদার সাহাবী। রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয় খালীফা 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে খুরাসানে জিহাদ করেছেন। তারপর "মারব" নামক স্থানে আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানে হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনেক।

---

৪১. তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ৩৬৫; আল-ইসাবা, খ.১, পৃ. ১৫১

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনায় হিজরাতের পরের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

হিজরাতের পূর্বে মাদীনায় তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেখানকার মাসজিদসমূহের ইমামগণ তা'লীম দিতেন। হিজরাতের পরেই মাসজিদে নববী নির্মিত হয় এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় মাদরাসা। মাদীনার ছোট-বড় সকল শিক্ষাকেন্দ্র এই কেন্দ্রীয় মাদরাসার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সেই সাথে বিভিন্ন গোত্রে কারী পাঠানো হয় যাঁরা কুরআন ও দীনের বিধি-বিধান বিষয়ে তা'লীম দিতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মাদীনার বাইরে মক্কা, তায়িফ, নাজরান, ইয়ামান, বাহ্‌রাইন, উমান প্রভৃতি অঞ্চল স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয় এবং তথাকার আমীর ও আমিলগণকে মু'আল্লিম ও মুকরীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মাসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনায় হিজরাতের দু'বছর পূর্ব থেকেই মাদীনার মাসজিদে বানূ যুরাইক, মাসজিদে কুবা, নাকী' আল-খাদিমাত এবং অন্যান্য মাসজিদগুলোতে কুরআন, দীনের বিধি-বিধান ও ইসলামী শরী'আতের তা'লীম চলে আসছিল। সেখানে যাঁরা তা'লীমের দায়িত্ব পালন করছিলেন তাঁদের মু'আল্লিম ও মুকরী উপাধিটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেখান থেকে বের হওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও অনেক হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পর মাসজিদে নববীতে কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা চালু হয়, যাকে "মাজলিস" বা হালকা নামে স্মরণ করা হয়। এ নাম দু'টি পরবর্তী বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, সালাতুল ফজরের পর আবূ লুবাবা (রা) খুঁটির নিকট গিয়ে বসা। সেখানে পূর্ব থেকেই আসহাবে সুফ্‌ফা, দুর্বল, হতদরিদ্র মানুষ, যাদের অন্তরসমূহ মুগ্ধ হয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ এবং বহিরাগত ব্যক্তি ও প্রতিনিধিবৃন্দ বেষ্টনী করে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের সকলকে কুরআন, হাদীছের জ্ঞান এবং দীনের তা'লীম দিতেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দান ও মন জয়ের চেষ্টা করতেন। এর কিছুক্ষণ পর উঁচু স্তরের সম্মানীয় ও বিত্তবান লোকেরা আসতেন এবং বৃত্তাকারে বসা মাজলিসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের দিকে তাকাতেন এবং তাঁরাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকাতেন। এ সময় এ আয়াত নাযিল হয়:[৪২]

---

৪২. সূরা আল-কাহাফ : ২৮

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ.

আপনি সেইসব লোকদের সাথে থাকুন যারা সকাল ও সন্ধ্যা নিজেদের রবকে স্মরণ করে, তারা তাদের রবের সন্তুষ্টি কামনা করে।

এরপর সেইসব লোকেরা বললো, আপনি এই সব নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে আমাদের থেকে দূরে বসান, আমরা আপনার পাশে সর্বক্ষণ বসে থাকবো। তাদের এমন দাবীর প্রেক্ষিতে নাযিল হলো এ আয়াত :[৪৩]

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ.

আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে সরিয়ে দেবেন না যারা সকাল ও সন্ধ্যা তাদের রবকে স্মরণ করে। তারা চায় তাকে খুশি করতে।

আবূ লুবাবা খুঁটিকে তাওবার খুঁটিও বলা হয়। এটা মাসজিদে নববীর সেই পবিত্র খুঁটি যাতে আবূ লুবাবা (রা) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অনুশোচনায় নিজেকে বেঁধে রাখেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন, তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই খুঁটির পাশে অধিকাংশ সময় নফল নামায আদায় করতেন। আর এখানেই সকালের তা'লীমের মাজলিসটি বসাতেন।

আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতুল ফাজর শেষ করলে আমরা তাঁর পাশে বসে যেতাম এবং আমাদের কেউ তাঁকে কুরআন বিষয়ে, কেউ ফারায়েজ বিষয়ে, আর কেউ স্বপ্নের তাবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন।[৪৪]

জাবির ইবন সামুরা (রা) বলতেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে গিয়ে যেখানে জায়গা পেতাম, বসে যেতাম।

প্রথম পর্যায়ে মাজলিসে বসার বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। যিনি যেখানে জায়গা পেতেন বসে যেতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথারীতি হালকা বা বৃত্ত তৈরি করেন। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমি

---

৪৩. সূরা আল-আন'আম, ৫২, ওয়াফা আল-ওয়াফা, পৃ. ৪৪৫
৪৪. মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান, জাম'উল ফাওয়ায়িদ (মিসর) খ. ১, পৃ. ৪৮

ছিলাম দুর্বল মুসলিমদের একজন। আমরা, মুহাজিরদের দারিদ্র ও প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের অপ্রতুলতার অবস্থা এমন ছিল যে ল্যাংটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে একজন আরেকজনের সাথে ঠাসাঠাসি করে বসে যেতাম। আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন পড়তো আর আমরা সকলে তা শুনতাম। একবার আমাদের এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হলেন এবং আমাদের মাঝখানে বসে আমাদেরকে বৃত্তাকারে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমাদের পুরো দলটি এমনভাবে বৃত্তাকারে বসে পড়লো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারাকের উপর উপস্থিত সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল।[৪৫]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাথে মাজলিসে বসে ছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি আসে। দুইজন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে একটু এগিয়ে যায়। মাজলিসের মধ্যে খালি জায়গা পেয়ে একজন বসে পড়ে, দ্বিতীয় জন বৃত্তাকারে বসা লোকদের পেছনে বসে এবং তৃতীয়জন ফিরে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা'লীম শেষ করে বলেন, এই তিন জনের মধ্যে একজন আল্লাহর দিকে গেছে, আল্লাহ্ তার প্রতি করুণা করেছেন। দ্বিতীয় জন লজ্জা পেয়েছেন, আল্লাহ্ তার সাথে লজ্জার আচরণ করেছেন। আর তৃতীয়জন প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৬]

জাবির ইবন সামুরাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে বসতেন? বললেন, হ্যাঁ, আমি অনেক বেশি তাঁর মাজলিসে অংশগ্রহণ করতাম। যতক্ষণ সূর্যোদয় না হতো তিনি মুসাল্লার উপর বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পর উঠে মাজলিসে আসন গ্রহণ করতেন। মাজলিসে সাহাবীগণ জাহিলী যুগের বিভিন্ন ঘটনা বলাবলি করে হাসতেন, তিনিও মৃদু হেসে দিতেন।

যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিবেশী। যখন ওহী নাযিল হতো, তিনি আমাকে ডেকে লেখাতেন। মাজলিসে যখন আমরা পার্থিব বিষয়ে কথা বলতাম তখন তিনিও পার্থিব বিষয়ে কথা বলতেন। যখন আমরা আখিরাতের কথা বলতাম তিনিও আখিরাতের কথা বলতেন। যখন আমরা খাদ্য-খাবারের কথা বলতাম তখন তিনিও খাদ্য-খাবারে কথা বলতেন।[৪৭]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। একবার আবূ হুরাইরা (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

---

৪৫. খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্, (বৈরূত) খ. ২, পৃ. ১২২
৪৬. আল-জাবীদী, তাজরীদ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম
৪৭. আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ খ. ২, পৃ. ১১

আপনি আমাদের সাথে হাসি-কৌতুকের কথা বলেন। তিনি বললেন, আমি কেবল সত্য কথাই বলি। জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ্ আল বাজালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই আমাকে দেখতেন, আমার সামনে মৃদু হাসি দিতেন। আনাস (রা) বলেন, সাহাবীদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় কাজ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখা। তা সত্ত্বেও তাঁকে আসতে দেখে দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁদের জানা ছিল, একাজ তাঁর পছন্দের নয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসের ভাব-গাম্ভীর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, অংশগ্রহণকারীগণ গভীরভাবে মনোযোগী থাকতেন। উসামা ইবন শুরাইক (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর আশে-পাশে সাহাবীগণ এমন মনোযোগী অবস্থায় বসে ছিলেন যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।[৪৮] একবার মাজলিস থেকে এক ব্যক্তি উঠে গেল এবং তার স্থানে অন্য এক ব্যক্তি বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর প্রথম ব্যক্তি ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে বসা লোকটিকে বললেন, সরে যাও, প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁর নিজের বসার স্থানটির উপর অধিকার সবচেয়ে বেশি।[৪৯]

প্রথম দিকে মাজলিসে শিক্ষার্থীদের বসার বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট বৃত্ত বানিয়ে বসে যেতেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথারীতি একটি মাজলিসে সকলকে এনে বৃত্তাকারে বসান। জাবির ইবন সামুরা (রা) বলেন :[৫০]

> دخل رسول الله صلى عليه وسلم المسجد و هم حلقٌ فقال مالى أراكم عزين.
>
> রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিভিন্ন স্থানে বৃত্ত করে বসে ছিলেন, তিনি বললেন, কী ব্যাপার, তোমরা ভাগ ভাগ হয়ে বসে আছ কেন? অর্থাৎ একত্রে বস।

আবূ সাইদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি দরিদ্র-দূর্বল মুহাজিরদের সাথে বসে ছিলাম। তাদের কিছু লোক উলঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয়ে একজন আরেকজনের সাথে গা

---

৪৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৩
৪৯. আল বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর (হায়দ্রাবাদ) ৪/২, পৃ. ১৫৯
৫০. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল আদাব, বাবুল হিলাক

লাগিয়ে বসা ছিলেন। একজন কারী আমাদেরকে কুরআন পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে কারীও তিলাওয়াত বন্ধ করে চুপ হয়ে গেলেন। তিনি সালাম করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছো? আমরা বললাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এজন কারী কুরআন পাঠ করছেন, আর আমরা শুনছি। আমাদের এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন :

الحمد لله الذى جعل من أمتى من أمــرت أن أصـــبر نفسي معهم.

সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাদের সাথে বসার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একথা বলে তিনি আমাদের মাঝখানে বসে পড়েন, যাতে তিনি আমাদের সকলের সামনে থাকেন। তারপর হাত দ্বারা ইশারা করেন যে, এভাবে বস। মাজলিসে উপস্থিত সকলে এমন ভাবে বসলেন যে, সকলের মুখ তাঁর দিকে হয়ে গেল। তারপর তিনি বলেন; ওহে হতদরিদ্র মুহাজিরগণ। তোমাদের জন্য সুসংবাদ। কিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ আলোকিত অবস্থায় উঠবে। তোমরা বিত্তবানদের চেয়ে অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ দিন (পার্থিব দিনের হিসেবে) পাঁচশো বছর হবে।[৫১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ

দীনী শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যধিক উৎসাহ ও জোর দিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের জন্য বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষালয়ে আসতেন, তিনি অত্যন্ত উদার চিত্তে তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে সুসংবাদ দিতেন। মুরাদ গোত্রের সাফওয়ান ইবন 'আসসাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য এসেছি। তিনি বললেন।[৫২]

مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحف به الملائكة

৫১. প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কাসাস
৫২. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম খ. ১, পৃ. ৩২

وتظلّه بأجنحتها فيركب بعضها بعضاً حتى تعلوا إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلبُ.

শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগতম! শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণে ফেরেশতাগণ ঘিরে রাখে এবং পালক দ্বারা তাদের মাথার উপর ছায়াদান করে। তাদের দলটি পৃথিবী থেকে উপরে নিচের আসমান পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষার মাজলিসে স্থানীয় শিক্ষার্থীগণ ছাড়াও বহিরাগত বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতেন। বহিরাগতদের উপস্থিতি হতো সাময়িক, তবে স্থানীয়রা স্থায়ীভাবে উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম-বেশি হতো। আবূ হুরাইরার (রা) বর্ণনায় আসহাবে সুফ্ফার সংখ্যা সত্তর (৭০) এসেছে, যারা সর্বক্ষণ. এই শিক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। আনাস (রা) বলেন, অধিকাংশ সময় আমরা ষাট (৬০) জনের মত মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে থাকতাম। অনেক সময় এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। বিশেষ করে বহিরাগত শিক্ষার্থীদলের আগমনে সংখ্যা বেড়ে যেত। বুজায়লা প্রতিনিধি দলে ১৫০, নাখা' প্রতিনিধি দলে ২০০ এবং মুযায়না প্রতিনিধি দলে ৪০০ জন সদস্য ছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য প্রতিনিধি দলে বিভিন্ন সংখ্যক সদস্য থাকতেন। তাঁদের আগমন যেহেতু দীন সম্পর্কে জানার জন্য হতো, এ কারণে তারাও মাজলিসে অংশ গ্রহণ করতেন। অনেক সময় স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে অনেকে ফিরে যেতেন। মাদীনা ও 'আওয়ালী মাদীনার অনেকে তাঁদের ক্ষেত-খামারে কর্মব্যস্ততার কারণে নিজেরা হাজির হতে পারতেন না, তাঁরা প্রত্যেক গোত্র বা এলাকা থেকে পালাক্রমে একজন-দু'জন করে আসতেন এবং ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে মাজলিসের খবর দিতেন। 'উমার (রা) বলেন:[৫৩]

كنتُ أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما، وأنزل يومًا، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك.

---

৫৩. সাহীহ আল-বুখারী, বাবুত তানাউল ফিল 'ইলম

আমি এবং আওয়ালী মাদীনার বানূ উমাইয়া ইবন যায়দ গোত্রের এক আনসারী প্রতিবেশী দু'জন পালা করে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট যেতাম। একদিন তিনি যেতেন এবং একদিন আমি যেতাম, যেদিন আমি যেতাম সেদিন ওহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবর নিয়ে আসতাম, আর যেদিন তিনি যেতেন, তেমনই করতেন।

এক ব্যক্তি তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাকে (রা) বললো : আবূ মুহাম্মাদ! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ ও কর্মকাণ্ড বিষয়সমূহে আমরা এই ইয়ামানী (আবূ হুরাইরা) কে আপনাদের চেয়ে বড় 'আলিম বলে জানতাম না। তালহা (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি যতকিছু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন, আমরা তা শুনিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তিনি যা কিছু জানেন, আমরা তা জানিনা। তারপর তিনি বলেন:

إناكنا أقوامًا أغنياء، لنابيوتات وأهلون وكنا نــأ تــى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النهار، ثم نرجــع وكان مسكينًا لا مال له ولا أهل.

আমরা ছিলাম বিত্তবান মানুষ, আমাদের ছিল বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজন। আমরা দিনের দু'প্রান্তভাগেঃ সকাল-সন্ধ্যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতাম। তারপর আবার ফিরে যেতাম। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন হতদরিদ্র। তাঁর না ছিল সম্পদ, আর না ছিল পরিবার-পরিজন।

তারপর তিনি বলেন, তাঁর হাত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতের মধ্যে থাকতো। তিনি যেখানে যেতেন আবূ হুরাইরাকে (রা) সংগে নিয়ে যেতেন। আমরা কোন সৎ মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনা।[৫৪]

বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেন, আমরা সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীছ শুনতাম না। আমাদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা ছিল। সেই সময় মানুষ মিথ্যা বলতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৫৪. আত-তারীখ আল-কাবীর, ২/২ পৃ. ১৩২

ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত লোকেরা তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করতেন যাঁরা উপস্থিত হতে পারতেন না।[৫৫]

আনাস (রা) বলেন, যে সকল হাদীছ আমরা বর্ণনা করছি, তার সবই আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাসরি শুনিনি। সেই যুগে আমরা একজন আরেকজনকে মিথ্যাবাদী বলতাম না।[৫৬]

শিক্ষা মাজলিসে সকল শিক্ষার্থী অত্যন্ত আদবের সাথে বসতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতেন। হাবীব ইবন আবী ছাবিত বলেন, যখন কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে বসতেন তখন তার দুই হাঁটু সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতেন না এবং তাঁর অনুমতি নিয়েই মাজলিস থেকে উঠতেন।

আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মাজলিসে উপস্থিত সকলকে সালাম করলো السلام عليكم বলে! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته তারপর লোকটি বসে বলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِيْ لَهُ وَيَرْضٰى .

> আল্লাহর জন্য অনেক অনেক সুন্দর, বরকতময় প্রশংসা; আমাদের রব (প্রভু) যেমন প্রশংসা ভালোবাসেন, যেমন প্রশংসা তাঁর জন্য শোভনীয় এবং যেমন প্রশংসায় তিনি খুশী হন।

তার একথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেমন বললে? লোকটি পূর্বের কথাগুলো আবার উচ্চারণ করলেন। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসে বসা লোকদের বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দশজন ফেরেশতা একথাগুলো লেখার জন্য এগিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই মাজলিসে বসা অবস্থায় বেশি বেশি ইসতিগফার করতেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) বলেন, আমরা গুণতাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মাজলিসে অসংখ্যবার বলতেন :

---

৫৫. মুসতাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ১২৭; হাকিম নীসাপুরী, মারিফাতু, 'উলুম আল-হাদীছ (মিসর) পৃ. ১৪

৫৬. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ৫১

رَبِّ اغْفِرْلِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحِيْمُ.

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি ক্ষমাশীল হোন, নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পারম দয়ালু।

মাজলিস শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণত এই দু'আটি পাঠ করতেন :[৫৭]

اَللّٰهُمَّ أَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّنَا، وَلاَ مُبَلِّغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি আপনার ভয় ও ভীতি দান করুন যা আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, আপনার আনুগত্য দিন যা আমাদেরকে আপনার জান্নাতে পৌঁছে দেয়, ইয়াকীন দিন যা আমাদের পার্থিব বিপদসমূহ সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ! যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখেন, আমাদের কান, আমাদের চোখ আমাদের শক্তি দ্বারা আমাদেরকে উপকার করুন এবং এই উপকার ও সুবিধাকে আমাদের উত্তরাধিকারী করুন। আমাদের প্রতিশোধ তাঁদের জন্য নির্ধারণ করুন যারা আমাদের উপর যুলুম করেছে। শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন। দীনের বাপারে আমাদেরকে মুসীবতে ফেলবেন না, দুনিয়াকে আমাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত বানাবেন না। আর এমন ব্যক্তি ও দলকে

---

৫৭. আবূ বাকর আহমাদ আদ-দায়নাওয়ারী, 'আমালুল ইওম ওয়াল লাইলাহ (হায়দ্রাবাদ) পৃ. ৪৫

আমাদের উপর ক্ষমতাবান করবেন না যারা আমাদের প্রতি দয়া দেখাবে না।

একবার মাজলিস শেষে তিনি এ দু'আ পাঠ করেন :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ الٰـــهَ الاَّ اَنْـــتَ وَأَسْـــتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ, আপনি কত না পবিত্র। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।

এই দু'আ শুনে মাজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, আপনি তো পূর্বে এ দু'আ পাঠ করতেন না। তিনি বললেন :

ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِى المَجَلِسِ.

মাজলিসে যা হয় এটা হচ্ছে তার কাফ্ফারা। (তিরমিযী, 'আমালুল ইওম ওয়াল লায়লা)

আসহাবে সুফ্ফা

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিস বা বৈঠকে প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। আনসার, মুহাজির, স্থানীয়, বহিরাগত, মর্যাদাবান, অভিজাত, গোত্রীয় নেতা, রাজা-বাদশাহ্, জ্ঞানী, মূর্খ, শহুরে, মরুচারী বেদুঈন, আরবী, আজমী, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সকলে এক সাথে বসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, মেধা, যোগ্যতা, স্বভাব-প্রকৃতি, ভাষা, উচ্চারণ পদ্ধতি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে তা'লীম দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসের ঐসকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে "আসহাবে সুফ্ফা" বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা রাত-দিন সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে থাকতেন। শেখা, শেখানো, যিক্র-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত এবং পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ ছিল না।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আমি সত্তর (৭০) জন আসহাবে সুফ্ফা কে দেখেছি যাঁদের শরীরে চাদর পর্যন্ত থাকতো না। শুধু সেলাই বিহীন লুঙ্গী বেঁধে রাখতেন, অথবা তাঁদের

দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি কম্বল জড়ানো থাকতো। সতর মুক্ত হওয়ার ভয়ে তা হাত দিয়ে ধরে রাখতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ ভাবে তাদেরকে দীনের তা'লীম দিতেন। এই মহান ব্যক্তিগণ পরস্পরের নিকট পড়তেন, পড়াতেন অথবা যিক্‌র-আযকারে নিমগ্ন থাকতেন।

আবূ হুরাইরা (রা) নিজেও আসহাবে সুফ্‌ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁদের সকলের পানাহারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বলেন, আমাদের মুহাজির ভাইগণকে বাজারের কাজকর্মসমূহ ব্যস্ত রাখতো, আমাদের আনসার ভাইগণ ব্যস্ত থাকতেন বাগান, ক্ষেত-খামার ও বিষয় সম্পদ দেখাশুনার কাজে। আর আবূ হুরাইরা (রা) পেটে পাথর বেঁধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেবায় পড়ে থাকতো এবং এমন সব সময় ও স্থানে উপস্থিত থাকতো যেখানে ঐ সব লোক উপস্থিত থাকতেন না। এমন সব কথা মুখস্থ করতো যা ঐ সব লোক করতেন না।[৫৮]

আবূ হুরাইরার (রা) এ বর্ণনা যেন আসহাবে সুফ্‌ফার মুখপত্র। আর এসব ব্যক্তিবর্গ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসের সবচেয়ে বেশি নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিলেন।

আসহাবে সুফ্‌ফার সংখ্যা ও তাঁদের নাম

সাধারণ অবস্থায় আসহাবে সুফ্‌ফার সংখ্যা ষাট-সত্তরের কাছাকাছি হতো। কম-বেশিও হতো। 'আলিমগণ তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা ৪০০ বলেছেন। এখানে আমরা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছিঃ (১) আসমা ইবন হারিছা আল-আসলামী, (২) আগারূরু মুযানী, (৩) 'আওস ইবন 'আওস আছ-ছাকাফী, (৪) বারা' ইবন মালিক আল-আনসারী, (৫) বাশীর ইবন খাস্‌সাসিয়্যা, (৬) বিলাল ইবন রাবাহ আল-হাবশী, (৭) ছাবিত ইবন দাহ্‌হাক আল-আনসারী আল-আশহালী, (৮) ছাবিত ইবন ওয়াদী'আ আল-আনসারী, (৯) ছাকীফ ইবন 'আমর ইবন সামীত, (১০) ছাওবান মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (১১) জারিয়া ইবন শায়বা ইবন কার্‌ত, (১২) জারহাদ ইবন খুওয়াইলিদ, (১৩) রাবাহ আসলামী, (১৪) জুবাইল ইবন সূরাকা দামরী, (১৫) জুনদুব ইবন জুনাদা, (১৬) আবূ যার আল-গিফারী, (১৭) হারিছা ইবন নু'মান আল-আনসারী, (১৮) হাজ্জাজ ইবন 'আমর আল-আসলামী, (১৯) হুযায়ফা ইবন উসাইদ আবূ সারীহা আল-গিফারী, (২০) হুযায়ফা

---

৫৮. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু হিফজিল 'ইলম

ইবন ইয়ামান, (২১) হাযিম ইবন হারমালা আল-আসলামী, (২২) হাবীব ইবন যায়দ ইবন 'আসিম আল-আনসারী, (২৩) হারমালা ইবন ইয়াস, (২৪) হাকাম ইবন 'উমাইর ছামাবী, (২৫) হানজালা ইবন আবী 'আমির আর-রাহিব আল-আনসারী, (২৬) খালিদ-ইবন যায়দ আবূ আইউব আল-আনসারী, (২৭) খাব্বাব ইবন আরাত, (২৮) খুবাইব ইবন ইয়াসাফ ইবন 'উতবা আবূ 'আবদির রহমান', (২৯) খুরাইম ইবন আওস আত-তাঈ, (৩০) খুরাইম ইবন ফাতিক আল-আসাদী, (৩১) খুনাইস ইবন হুযাফা, (৩২) যুল বিজাদাইন 'আবদুল্লাহ্ আল-মুযানী, (৩৩) রাবী'আ ইবন কা'ব আল-আসলামী, (৩৪) রিফা'আ ইবন 'আবদিল মুনযির (ইবন যানবার) আবূ লুবরা আল-আনসারী, (৩৫) যায়দ ইবন খাত্তাব আবূ 'আবদির রহমান, (৩৬) সালিম ইবন 'উবাইদ আল আশজা'ঈ, (৩৭) সালিম ইবন 'উমাইর ইবন সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, (৩৮) সায়িব ইবন খাল্লাদ, (৩৯) সা'দ ইবন মালিক, (৪০) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, (৪১) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, (৪২) সা'ইদ ইবন 'আমির ইবন জুযাইম জুমাহী, (৪৩) সাফীনা ইবন 'আবদির রহমান মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (৪৪) সালমান আল-ফারিসী, (৪৫) শাদ্দাদ ইবন আওস, (৪৬) শুকরান মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (৪৭) শাম'উন আবূ রায়হানা আযদী/আনসারী, (৪৮) সাফওয়ান ইবন বায়দা', (৪৯) সুহাইব ইবন সিনান, (৫০) তাখ্‌ফা ইবন কায়স আল-গিফারী, (৫১) তালহা ইবন 'আমর নাদারী, (৫২) তালহা ইবন 'আমর আল-আনসারী, (৫৩) 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ্ (ইবন আল-জাররাহ) আবূ 'উবাইদা ইবন আল-জাররাহ্, (৫৪) 'আব্বাদ ইবন খালিদ আল- গিফারী, (৫৫) 'উবাদা ইবন কারস/কারত, (৫৬) 'আবদুল্লাহ্ ইবন উনাইস, (৫৭) 'আবদুল্লাহ্ ইবন উম্মি মাকতূম, (৫৮) 'আবদুল্লাহ্ ইবন বাদার আল-জুহানী, (৫৯) 'আবদুল্লাহ্ ইবন হাবশী খাছ'আমী, (৬০) 'আবদুল্লাহ্ ইবন আল- হারিছ ইবন জাযআ আয-যুবাইদী, (৬১) 'আবদুল্লাহ্ ইবন হাওয়ালা আযদী, (৬২) 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদিল আসাদ আল-আসাদী আবূ সালামা মাখযূমী, (৬৩) 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, (৬৪) 'আবদুল্লাহ্ ইবন হারাম আবূ জাবির আল-আনসারী সুলামী, (৬৫) 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ, (৬৬) 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমাইর ইবন আবস আল-আনসারী আল-হারিছী, (৬৭) 'আবদুর রহমান ইবন কারত, (৬৮) 'উবাইদুল্লাহ্ মাওলা রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (৬৯) 'উতবা ইবন 'আবদি-সুলামী, (৭০) 'উতবা ইবন গাযওয়ান, (৭১) 'উতবা ইবন মুনযির সুলামী, (৭২) 'উছমান ইবন মাজ'উন, (৭৩) 'ইরবাদ ইবন সারিয়া, (৭৪) 'উকবা ইবন 'আমির আল-জুহানী, (৭৫) 'উকাশা ইবন মিহসান আল-আসাদী, (৭৬) 'আম্মার ইবন ইয়াসির, (৭৭) 'আমর ইবন তাগলিব, (৭৮) 'আমর ইবন বা'ছা সুলামী, (৭৯) 'আমর ইবন 'আওফ

আল- মুযানী, (৮০) 'উয়াইমির ইবন সা'ইদা আল-আনসারী, (৮১) 'আয়্যাদ ইবন হাম্মাদ আল- মুজাশি'ঈ, (৮২) ফুরাত ইবন হায়্যান 'ইজলী', (৮৩) ফুদালা ইবন 'উবাইদ আল-আনসারী', (৮৪) কুর্‌রা ইবন ইয়াস আবূ মু'আবিয়া আল-মুযানী, (৮৫) কা'ব ইবন 'আমর আবূল য়ুস্‌র আল-আনসারী, (৮৬) কান্নায ইবন হুসাইন আবূ মারছাদ আল-গানাবী, (৮৭) মিসতাহ ইবন উছাছা ইবন 'আব্‌বাদ, (৮৮) মাস'উদ ইবন রাবী' আল-কারী, (৮৯) মুস'আব ইবন 'উমাইর, (৯০) আবূ হালীমা আল-কারী (মু'আয ইবন আল-হারিছ আল-আনসারী আল-কারী), (৯১) মু'আবিয়া ইবন হাকাম সুলামী, (৯২) মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, (৯৩) নাদলা ইবন 'উবাইদ আবূ বারযা আল-আসলামী, (৯৪) হিলাল মাওলা মুগীরা ইবন শু'বা, (৯৫) ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ আল- জুহানী, (৯৬) ওয়াছিলা ইবন আল-আসকা', (৯৭) ইয়াসার আবূ ফাকীহা মাওলা সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, (৯৮) আবূ ছা'লাবা আল- খুছানী, (৯৯) আবূ রাযীন, (১০০) আবূ 'আসীব মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (১০১) আবূ ফিরাস সুলামী, (১০২) আবূ কাবশা মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (১০৩) মুওয়াইহিবা মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (১০৪) আবূ হুরাইরা আদ-দাওসী রাদি আল্লাহ্ 'আনহুম ওয়া রাদূ 'আনহু যালিকাল ফাওযুল কাবীর।

প্রায় চার শো আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্য থেকে এক শো'র সামান্য কিছু বেশি সদস্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবূ হুরাইরা (রা) ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরীর (রা) মত সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী; 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত ফকীহ; আবূ 'উবায়দা ইবন আল জাররাহ (রা) ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের (রা) মত বিজয়ী সেনাপতি- যাঁদের নেতৃত্বে শাম, খুরাসান ও 'আজম বিজিত হয়; আবুদ দারদা' (রা) ও আবু যার আল গিফারীর (রা) মত 'আবিদ ও দুনিয়া বিরাগী-যুহ্‌দ ও তাকওয়া, সত্য ও সততায় যাঁদের কোন তুলনা নেই। তাছাড়া মুসলিমগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে দীনী 'ইলম, ঈমান ও ইয়াকীনে ছিলেন একেকজন চলমান চিত্র স্বরূপ।

স্থানীয় শিশু-কিশোর ও উঠতি বয়সের তরুণগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশু-কিশোরদের দারুণ প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনিও তাদেরকে ভীষণ আদর ও স্নেহ করতেন। তাদেরকে দীনী 'ইলম শিক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন এবং এর জন্য বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ শোনাতেন। যেমন তিনি বলেন ঃ[৫৯]

---

৫৯. জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ৮২

أيّما ناشٍ نشأ فى طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له أجر أربعين صدّيقا.

যে তরুণ জ্ঞানার্জন ও ইবাদাতের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, এমন কি সেই অবস্থায় বেড়ে ওঠে আল্লাহ তাকে চল্লিশজন সিদ্দীকের প্রতিদান দেন।

তিনি তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামকে এ উপদেশও দিয়েছেন ঃ[৬০]

سيأتيكم شبابٌ من أقطار الأرض يطلبون الحديث فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًا.

তোমাদের নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তরুণরা আসবে হাদীছ জানতে। যখন তারা আসবে তোমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে।

ইমাম আল বুখারী تعليم الصبيان القرآن অধ্যায়ে ইবন 'আব্বাসের (রা) শৈশবকালে কুরআন মুখস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন। মাদীনার শিশু-কিশোররা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসে উপস্থিত হয়ে দীনী শিক্ষা লাভ করতেন, পরবর্তীতে তারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেই সময় তাঁদের বয়স আট-দশ বছর থেকে পনের-ষোল বছর পর্যন্ত ছিল। যেমন ঃ হুসাইন ইবন 'আলী ইবন আবূ তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, নু'মান ইবন বাশীর, আবূত্ তুফাইল কিনানী, সায়িব ইবন ইয়াযীদ, 'উমার ইবন আবূ সালামা, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, মুসলিম ইবন মাখলাদ, সাহল ইবন সা'ঈদী, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাদি আল্লাহ 'আনহুম)।[৬১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এইসব কিশোর ও নব্য যুবকদেরকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। তিনি মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামানের আমীর ও মু'আল্লিম হিসেবে নিয়োগ দেন। 'উত্তাব ইবন সায়্যিদকে মক্কার আমীর, 'উছমান ইবন আবিল 'আস আছ-ছাকাফীকে (রা) তায়িফের আমীর ও ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেন। অথচ তাঁরা সকলে ছিলেন অল্প বয়সী তরুণ। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু 'আব্বাসকে (রা) নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে এই দু'আ করেন : اللهمَّ علمه الكتاب-হে আল্লাহ! তুমি

---

৬০. খাতীব আল-বাগদাদী, শারফু আসহাবিল হাদীছ, পৃ. ২১

৬১. খাতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফাইয়াহ ফী 'ইলম আর রিওয়াইয়াহ (হায়দ্রাবাদ) পৃ. ৫৫

তাকে কিতাব শিক্ষা দাও।[৬২] মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তার জবাবে খুশী হয়ে তাকে প্রত্যায়ন ও সাহস দিতে গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

সামুরা ইবন জুনদুব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে একজন বালক ছিলাম। আমি তাঁর বাণীসমূহ মুখস্থ করতাম। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসে আমার চেয়েও বেশি বয়সের মানুষ থাকতেন। এ কারণে আমি কথা বলতে পারতাম না।

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন গাছ যা একজন মুসলিমের মত এবং যার পাতা ঝরে না? আমার অন্তর বললো, সেটা খেজুর গাছই হবে। কিন্তু আমি চুপ থাকলাম। কারণ আমি ছিলাম, মাজলিসের দশম ব্যক্তি এবং সবার চেয়ে কম বয়সী। জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ আল বাজালী (রা) বলেন ঃ[৬৩]

> كنا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم غلماناً حزاورةً تعلمنا الايمان قبل أن نتعلمَّ القرأن ثم تعلمنا القرأن فازددنا به ايماناً.
>
> আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে শক্তি-সামর্থবান বালক ছিলাম। আমরা কুরআন পড়ার পূর্বে ঈমান শিখি, তারপর কুরআন পড়ি। যে কারণে আমাদের ঈমান আরো বেশি শক্তিশালী হয়।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর এবং আমি মুহকাম আয়াতসমূহ পড়ে ফেলেছিলাম। সা'ঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, ইবন 'আব্বাস (রা) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় মুহকাম আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম মুহকাম কি? বললেন, মুফাস্সাল।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে কয়েক সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। বিদায়ের আগে তিনি প্রত্যেকের মুখ থেকে কুরআন পাঠ শোনেন। তারপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তিটির নিকট

---

৬২. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম
৬৩. আত-তারিখ আল-কাবীর ১/১, পৃ. ৩২০

এগিয়ে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? লোকটি কয়েকটি সূরার নাম উচ্চারণ করতে করতে বলেন, এটা, এটা এবং সূরা আল বাকারা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, সূরা আল বাকারা কি তোমার মুখস্থ আছে? লোকটি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তিনি বললেন : চল, তাহলে তুমিই এ বাহিনীর আমীর।[৬৪]

মালিক ইবন হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা সকলে ছিলাম সমবয়সী তরুণ। আমরা বিশ দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অবস্থান করি। মালিক (রা) আরো বলেন ঃ

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الصلواة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني. (بخارى، كتاب الآذان: مسلم، باب من. أحق بالإمامة)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দয়ালু, স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। তাই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা পরিবারের কাকে কাকে ছেড়ে গিয়েছি? আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাও। তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে সালাত শেখাবে। তোমাদের কেউ একজন আযান দেবে এবং বয়সে যে বড় সেই সালাতে ইমামতি করবে। তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো সেইভাবে সালাত আদায় করবে।

একজন কুরাইশ যুবক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আপনি আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। এ কথা শুনে মাজলিসে উপস্থিত সকলে

---

৬৪. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ১৬৮

তাঁকে তিরস্কার করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তিনি নিকটে গেলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মায়ের জন্য তুমি এ কাজ শোভন মনে করবে? যুবক বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম, আমি কখনো শোভন মনে করবো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার মত সকলে তাদের মায়ের ক্ষেত্রে এ কাজকে শোভন মনে করে না। এভাবে তিনি যুবকের মেয়ে, বোন, খালা ও ফুফুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, আর যুবক শক্তভাবে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে থাকেন, এভাবে প্রত্যেক মানুষই এ কাজ শোভন মনে করে না, অবশেষে তিনি যুবকের বুকের উপর হাত রেখে দু'আ করেন:

اللّٰهُمَّ اغفر ذنبه و طهِّر قلبه وحصِّن فرجه.

হে আল্লাহ! তার পাপ ক্ষমা করে দিন, তাঁর অন্তর পরিচ্ছন্ন করে দিন এবং তার যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখুন।

এর ফলাফল এই হয় যে, এরপর সেই যুবক আর কখনো কারো দিকে চোখ উঠিয়ে তাকায়নি।[৬৫]

বহিরাগত শিশু, কিশোর ও যুবক

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসে কেবল মাদীনা ও এর আশে-পাশের যুবক ও শিশু কিশোররাই থাকতো না, বরং দূর-দূরান্ত এবং বিভিন্ন গোত্রের শিক্ষার্থীগণ অর্থাৎ প্রতিনিধি দলের সাথে তাদের সন্তানরাও জেদ করে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে মাদীনায় আসতো, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট কুরআন শিখতো এবং দীনী জ্ঞান অর্জন করতো। অনেকে তাঁদের বয়োজেষ্ঠ্য ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের থেকে বেশি জ্ঞান অর্জন করে ফেলতো।

একবার একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলো। ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরব দেশীয় ইসলামী প্রথা মত তাদের সকলকে কিছু উপহার দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আর কেউ বাকী নেই তো? তারা বললো:

---

৬৫. প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৪৩

نعم غلام خلَّفناه على رحالنا وهو أحدثنا سناً

হাঁ, আমাদের শিবিরে একজন কিশোরকে রেখে এসেছি। সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। কিশোরটি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই গোত্রের একজন সদস্য, আপনি তাদেরকে দান করেছেন, আমার প্রয়োজনও পূরণ করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রয়োজন কি? কিশোরটি বললো, আমার প্রয়োজন আমার গোত্রের প্রয়োজনসমূহের মত নয়। আমি আমার জনপদ থেকে কেবল এজন্য এসেছি যে, আপনি আল্লাহর নিকট এ দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমার প্রতি দয়া করেন এবং 'আমর অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা সৃষ্টি করে ঐশ্বর্যবান করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই কিশোরের জন্য দু'আ করেন:

اللّٰهُمَّ اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه.

হে আল্লাহ! তার পাপ ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন এবং তার অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা সৃষ্টি করুন।

তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই দু'আর ফল এই হয় যে, সারা জীবন তিনি মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। জীবনে কারো নিকট কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।[৬৬]

বানূ তামীমের প্রতিনিধি দলে তিরিশজন (৩০) কিশোর ছিলেন, তাদের মধ্যে সুফইয়ান ইবন 'উযাইলের ছেলে কায়সও একজন। তিনি তাঁর পিতাকে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাব। সুফইয়ান ইবন 'উযাইল বলেন, ছেলে! আমরা খুব দ্রুত ফিরে আসবো। তাদেরই সাথে আরেকজন ছিল 'আমর ইবন আহতাম্মের ছেলে। তাকেও উপহার দেওয়া হয়। বানূ নাজ্জারের এক মহিলার বর্ণনা মতে বিলাল তাঁকে উপহার দেন :[৬৭]

أعطاه يومئذ وهو أصغرهم خمس أواق.

তাঁকে সেদিন পাঁচ উকিয়া দেন এবং সে ছিল সর্ব কনিষ্ঠ।

---

৬৬. তাবাকাতু ইবন সা'দ খ. ১, পৃ. ৩২৩; ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, (মিসর) খ. ৩, পৃ. ৬১

৬৭. তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ২৯৫-২৯৭

বানূ বাক্কা' প্রতিনিধি দলে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি মু'আবিয়া ইবন ছূর ইবন 'উবাদাও ছিলেন। তাঁর বয়স তখন এক শো বছর। সাথে তার ছেলে বিশরও ছিলেন। মু'আবিয়া ইবন ছূর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলেনঃ

إنىِّ أتبرَّك بمسِّك وقدكبرت وابنى هذا برَّبى فامسح وجهه.

> আমি আপনাকে স্পর্শ করে সৌভাগ্যবান হতে চাই। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার এ ছেলে আমার সাথে ভালো আচরণ করে। আপনি তার মুখমন্ডলে হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিন।

তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশর ইবন মু'আবিয়ার মুখ মণ্ডলে হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দেন।[৬৮] ছাকাফী গোত্রের প্রতিনিধি দলে 'উছমান ইবন আবিল 'আস আছ-ছাকাফী ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সী। দলের সদস্যরা তাকে তাদের আবাসস্থলের জিনিস-পত্রের হিফাযাতের দায়িত্বে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হতেন। দুপুরে যখন তারা ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে যেত তখন 'উছমান ইবন আবিল 'আস চুপে চুপে লুকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে কুরআন পড়তেন ও দীনের তা'লীম নিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিশ্রাম নিতে দেখলে তিনি আবূ বাকর (রা) ও উবাই ইবন কা'বের (রা) নিকট গিয়ে দীনের বিভিন্ন কথা শিখতেন। দীন ও ইসলামের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ এবং চেষ্টা সাধনা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুণ খুশি হন। তাঁকে তায়িফের আমীর নিয়োগ করেন। অথচ তাঁর দলের মধ্যে তিনি সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন।[৬৯]

এ প্রসঙ্গে একটি শিশুর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আবূ যায়দ 'আমর ইবন সালামা জুরমী (রা) নিজের ছোটবেলার ঘটনা বর্ণনা করতেন। বলতেন, আমরা কয়েকজন ছোট্ট ছেলে একটি ঝর্ণার ধারে খেলা করতাম। সেটা ছিল সাধারণের চলাচলের পথ। আমরা সেই পথে চলাচলকারীদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তারা বলতো, এক ব্যক্তি বলে যে, তিনি একজন নবী, আল্লাহ তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, আর এই ওহী তাঁর উপর নাযিল হয়, আর

---

৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৪
৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫০৮

আমি তাদের মুখ থেকে যে সকল আয়াত শুনতাম মুখস্থ করে ফেলতাম এবং তা আমার অন্তরে যেন খোদাই হয়ে যেত। এভাবে আমি কুরআনের বহু অংশ আমার অন্তরে সংগ্রহ করে ফেলি। এরপর আমার পিতা আমাদের গোত্রের মুসলিমদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যান এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। ফেরার পর আমরা তাঁকে স্বাগতম জানাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যবাদিতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় হবে সে নামায পড়াবে। আমাদের গোত্রের লোকেরা ইমামতির ব্যাপারে চিন্ত-ভাবনা করলো, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি কুরআনের হাফিয পাওয়া গেলনা। কারণ, আমি চলাচলকারী পথিকদের নিকট থেকে কুরআন শুনে মুখস্থ করে ফেলতাম। এ কারণে আমাকে তারা ইমাম বানায়। সে সময় আমার বয়স ছিল ছয় বছর। সিজদায় গেলে আমার পরনের কাপড় উড়ে পিঠের উপর উঠে যেত এবং পাছা আলগা হয়ে যেত। এ অবস্থা দেখে লোকেরা আমাকে একটি জামা বানিয়ে দেয়। জামাটি পেয়ে আমি দারুণ খুশি হই।[৭০]

বৃদ্ধ ও দীর্ঘায়ু ব্যক্তিগণ

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা মাজলিসের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন বয়স্ক মানুষ। তারা বেশি বয়সে শিক্ষা পেয়েছেন। ইমাম আল বুখারী (রহ) বলেন:[৭১]

وقد تعلم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى كبر سنهم.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ বেশি বয়সে শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকে হতেন এত বেশি বয়সের যে তাঁরা দৈহিক শক্তি সামর্থ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমন বেশি বয়সী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে নিজেদের অক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতার কথা বলে দীনী তা'লীম লাভ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বার্দ্ধক্যের দিক লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। যেমন বাক্‌কা' প্রতিনিধি দলে

---

৭০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৬
৭১. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু আল-ইগতিবাতি ফিল 'ইলম ওয়াল হিকমাহ্

মু'আবিয়া ইবন ছূর (রা) ছিলেন এক শো বছর বয়সের। তিনি ছেলে বিশরকে সংগে করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসেন এবং অনেক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিয়ে ফিরে যান।

কুবাইসা ইবন মুখরিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট গেলাম। তিনি আমার যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। বললাম ঃ

كبر سنىّ ورقّ عظمى فأ تيتك لتعلمنى ماينفعنى الله به.

আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছি, হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আমি আপনার নিকট এসেছি। আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমার উপকার করেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওহে কুবাইসা! যদি তুমি সকাল বেলা তিনবার "سبحان الله العظيم بحمده" বল তাহলে যে পাথর ও গাছ-পালার পাশ দিয়ে যাবে তারা সবাই তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আর তুমি অন্ধত্ব, কুষ্ঠ রোগ ও পঙ্গুত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। তাছাড়া তুমি এ দু'আটি পড়তে থাকবে:[৭২]

اللّٰهُمَّ أنِىِّ أَسْئَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَاقْضِ عَلَىَّ مِــنْ فَضْـــلِكَ

وَانْشُرْ عَلَىَّ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَتِكَ.

হে আল্লাহ! আপনার নিকট যা আছে আমি তার থেকে প্রাপ্তীর জন্য প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনার দয়া আমার উপর ছড়িয়ে দিন এবং আমার প্রতি আপনার বরকত ও সমৃদ্ধি নাযিল করুন।

আবূ রায়হানা শাম'উন আযদী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিবেদন করলাম, আমার কুরআন পড়তে কষ্ট হয়। তিনি বললেন, তুমি বেশি বেশি সালাত আদায় করবে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমাকে পড়ান। তিনি বললেন তুমি ذوات الراء-রা (ر) বিশিষ্ট সূরা তিনটি পড়ে নাও। লোকটি বললেন!

---

৭২. জাম'উল ফাওয়ায়িদ খ. ১, পৃ. ৩৮

كبر سنى و اشتد قلبى و غلظ لسانى.

আমার অনেক বয়স হয়েছে, অন্তর কঠিন এবং জিহ্বা শক্ত হয়ে গেছে।

তার কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে তুমি ذوات حم-তুমি حم বিশিষ্ট সূরা তিনটি পড়ে নাও। লোকটি এবারো একই কথা বললেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি ذات السبحات-এর সূরা তিনটি পড়ে নাও। লোকটি নিজের কথার পুনবৃত্তি করতে করতে বললেন أقرأنى سورة جامعة-আপনি আমাকে একটি ব্যাপক সূরা পড়িয়ে দিন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সূরা إذا زلزلت الأرضُ পড়িয়ে দেন। সূরাটি পড়ে লোকটি বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি এর অতিরিক্ত কখনো পড়বো না। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করেনঃ أفلح الرجل লোকটি সফলকাম হয়েছে।[৭৩]

অনারব শিক্ষার্থীগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসে অনারব শিক্ষার্থীগণও অংশগ্রহণ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা দ্বারা নিজেদের যোগ্যতাকে আরো শাণিত করে তুলতেন। সে সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ফার্সী, রুমী, হাবশী, হিন্দী প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করতো। তাদের মধ্যে ফার্সী তথা পারস্যবাসীর সংখ্যা ছিল বেশি। ইরাক, উমান, বাহরাইন, ইয়ামান এবং উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে পারস্য বংশোদ্ভূত বহু মানুষের বাস ছিল। এসব অঞ্চলের শাসকগণ পারস্য সম্রাটদের প্রভাব বলয়ে ছিলেন। আরবদের পারস্যে এবং পারস্যবাসীদের আরবে যাতায়াত ছিল। এ কারণে অনেক ফার্সী শব্দের ব্যবহার আরবীতে আছে। আরবে বসবাসকারী পারস্যবাসীদের أبناء فارس বা أبناء (إبن এর বহুবচন) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর আরববাসীদের মত এসব অনাবর অধিবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশেষ করে ইয়ামানে পারস্য সম্রাট কিসরার শাসক 'বাযান' ইসলাম গ্রহণের পর বহু "আবনা" (أبناء) ইসলাম গ্রহণ করেন। বাযান রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদেরকে কাদের মধ্যে গণ্য করা হবে? রাসূলুল্লাহ্

৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭১

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :[৭৪]

أنتم منا و إلينا أهل البيت.

তোমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই أبناء فارس বা পারস্য সন্তানদেরই একজন ছিলেন ইয়াহনাস (يحنس)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ফিরে গিয়ে তার মত অন্য 'আবনা' কে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে নু'মান ইবন বাযরজ– এর কন্যাগণ এবং ফিরোয দায়লামী ইসলাম গ্রহণ করেন। সালমান আল-ফারেসীর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর পারস্যবাসীরা তাদের অতীতের এই ধর্মীয় নেতার অনুসরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালমানের (রা) ব্যাপারে বলেছিলেন, সালমান আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فاذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيرا.

পূর্ব দিক থেকে তোমাদের নিকট মানুষ আসবে জ্ঞান অর্জনের জন্য। যখন তারা আসবে, তোমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে।" এই হাদীছে পারস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৭৫]

মাদীনার আনসারদের মধ্যে অনেক ফার্সী মাওয়ালী ও দাস-দাসী ছিল। 'উকবা অথবা আবূ 'উকবা (রা) ছিলেন জুবায়র ইবন 'আতীক আল-আনসারীর (রা) ফার্সী মাওলা। তিনি উহুদ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের এক মুশরিক সৈন্যকে হত্যা করে গর্বভরে উচ্চারণ করেন: أنا الغلام الفارسى-আমি একজন ফার্সী দাস। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি أنا الأنصارى "আমি একজন আনসারী" কেন বললে না? কোন সম্প্রদায়ের মাওলা তথা মুক্ত করা দাস সেই সম্প্রদায়েরই গণ্য করা হয়। রাশীদ ফার্সী ছিলেন আনসারদের বানু মু'আবিয়া শাখা গোত্রের মাওলা তথা আযাদকৃত দাস। অনেকে পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাটি এই রাশীদের প্রতি আরোপ করেছেন।[৭৬]

---

৭৪. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৬৯
৭৫. আত্ তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মা জাআফিল ইসতীসা, বিমান ইয়াতুলুবুল 'ইলমা
৭৬. আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৩০৭, খ. ৪, পৃ. ২৫৪

এই কারণে পারস্যবাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছিল। 'আল্লামা ইবনুল আছীর তালহা আল-আনসারীর (রা) আলোচনা প্রসঙ্গে তারই সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একথাটি বর্ণনা করেছেন :

إنَّ أسعد العجم بالاسلام أهل فارس.

ইসলাম গ্রহণ করে অনারবদের মধ্যে পারস্যবাসীরাই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হয়েছে।

তাছাড়া পারস্যবাসীদের ধর্ম ও জ্ঞানগত স্থান ও মর্যদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যেমন ঃ

لوكان العلم معلقا بالثريا لناله رجل من أبناء فارس.

জ্ঞান যদি সূরাইয়্যা নক্ষত্রের উপর ঝুলানো অবস্থায় থাকে তাহলেও পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে কোন একজন তা লাভ করবে।

কোন কোন বর্ণনায় العلم এর স্থলে الايمان এবং رجل এর স্থলে رجال এসেছে। অনারবরা আরবী ভাষা ভালোমত না জানার কারণে আরবী বাক্যরীতি ও বর্ণ ধ্বনি উচ্চারণে অক্ষম ছিল। একারণে প্রথম প্রথম কুরআন পড়তে তাদের কষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এই অক্ষমতা উপলব্ধি করে তাদের নিজেদের মত পড়ার অনুমতি দেন। শুধু অনুমতি নয়, সাহসও দিয়েছেন। জাবির (রা) বলেন ঃ[৭৭]

خَرَجَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرء القران، وفينا أعرابى والعجمى، فقال اقرءوافكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام والقدح يتعجلونه، ولا يتأجلونه.

আমরা কুরআন পড়ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন। আমাদের মধ্যে বেদুঈন এবং অনারবও ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা পড়, সবাই ভালো পড়ছো। পরবর্তীতে এমন সব মানুষ আসবে যারা কুরআন তো

---

৭৭. জাম'উল ফাওয়ায়িদ খ. ১, পৃ. ২৮৭

খুব ভালো করে পড়বে। যেমন তীর সোজা করে দাঁড় করানো হয়। তারা দ্রুত পড়বে, থেমে থেমে পড়বে না।

ইমাম আল বুখারী (রহ) "কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার" অধ্যায়ে باب من تكلّم بالفارسية و الرطانة (যারা ফার্সী ও অনারব ভাষায় কথা বলেছে) রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) خندق (খন্দক) শব্দটি ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। এটি ফর্সী كندة শব্দের আরবী রূপ। এছাড়া আরো কিছু ফার্সী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। একটি মাজহুল ও মুনকার বর্ণনা এমন আছে যে, পারস্যবাসীরা সালমান আল-ফারেসীকে (রা) লেখেন যে, আপনি আমাদের জন্য সূরা আল–ফাতিহার ফার্সী তরজমা লিখে পাঠান। এর প্রেক্ষিতে তিনি بسم الله الرحمن الرحيم এর ফার্সী তরজমা بنام يزدان يخشا يند লিখে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থাপন করেন এবং পারস্যবাসীরা তা সালাতে পাঠ করতে থাকে। অবশেষে তাদের জিহ্বার জড়তা কেটে যায়।[৭৮]

অবশ্য এ বর্ণনা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। পারস্যবাসী ছাড়াও আরবে বসবাসকারী হাবশীদের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) দুইবার তাদের দেশ-হাবশায় হিজরাত করেন এবং তথাকার বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করে দীন ও মুসলিমদের জন্য অবদান রাখেন। ফার্সী ভাষার পরে হাবশী ভাষা বিষয়ে মুসলিমগণ বেশি অবহিত ছিলেন। পারস্যবাসীদের মধ্যে সালমান ফারেসীর (রা) যে দীনী সম্মান ও মর্যাদা ছিল, হাবশাবাসীদের মধ্যে বিলাল হাবশীর (রা) অবস্থা একই ছিল। এর পাশাপাশি তখন আরবে রোমানদেরও বসবাস ছিল। তাদের সাথে মক্কাবাসীদের প্রাচীন কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। এ সকল আজমী তথা অনারব অধিবাসীদের সৌভাগ্যবান সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চাক্ষুস দেখা ও তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী বর্ণনায় ভূমিকা রেখেছেন।

মাদীনার অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র

মাসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মাজলিস ছাড়াও রিসালাত যুগে মাদীনার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। মাদীনার মাসজিদসমূহ, পাড়া-মহল্লা, গোত্রসমূহ, বিভিন্ন মাজলিস-মাহফিল, এমনকি রাস্তা ঘাটেও শিক্ষাদান ও গ্রহণের ধারা

৭৮. মুহাম্মদ আবদুস আজীম আয-যুরকানী, মানাহিল 'ইরফান ফী 'উলুম আল-কুরআন (কায়রো) খ. ২, পৃ. ১৩৩

চালু হয় এবং কিতাব-সুন্নাহ ও ফিকহের চর্চা শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার একটি ভাষণে এক শ্রেণীর মানুষের প্রশংসা করে বলেন, এটা কেমন কথা যে কিছু মানুষ না নিজেদের প্রতিবেশীকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়, না তাদেরকে 'ইলম দান করে, না ওয়াজ-নসীহত শোনায়, আর না "আমর বিল মা'রূফ ওয়া নেহী আনিল মুনকার" করে অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলে। আর এটাই বা কেমন কথা যে, কিছু মানুষ তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে না জ্ঞান অর্জন করে, না দীনের তত্ত্বজ্ঞান শেখে, আর না ওয়াজ-নসীহত গ্রহণ করে। মানুষের উচিত নিজেদের প্রতিবেশীকে দীনের তা'লীম দেয়া, তাদেরকে ফিক্হ শেখানো এবং ওয়াজ-নসীহত ও "আমর বিল মারূফ ওয়া নেহী আনিল মুনকার" করা। মানুষের উচিত নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা, তাদের নিকট থেকে ফিকহের তা'লীম নেয়া ও ওয়াজ-নসীহত গ্রহণ করা। অন্যথায় আল্লাহর কসম! ঐসব লোককে আমি শাস্তি দেব। একথা গুলো বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বর থেকে নেমে পড়েন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) পরস্পর বলতে থাকেন যে, বল তো তিনি কোন লোকদের সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছেন? কেউ বললেন, আশা'ইরা গোত্র এর উদ্দেশ্যে। তারা হলো 'ইলম ও ফিকহের অধিকারী এবং তাদের প্রতিবেশী হলো মূর্খ ও বেদুঈন। যখন একথা আশা'ইরাদের কানে গেল তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একটি দলকে ভালো বলে উল্লেখ করেছেন- আর আমাদেরকে নিন্দা-মন্দ করে শাসিয়েছেন। আমাদের অপরাধ কি? তিনি তাঁদেরকে পূর্বের কথাই বলেন। আশা'ইরাগণ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এক বছর সময় দিন। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। যাতে তারা এই সময়ের মধ্যে তাদের এলাকার লোকদেরকে দীন শিক্ষা দেয়, জ্ঞানদান করে এবং ওয়াজ-নসীহত করে। এরপর আশা'ইরাগণ এক বছরের মধ্যে তাদের এলাকার মূর্খলোক ও বেদুঈনদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের এমন তা'লীম দেয় যে বিভিন্ন স্থানে শেখা ও শেখানোর প্রবাহ সৃষ্টি হয়।[৭৯]

পারিবারিক শিক্ষালয়

এ সময়ে মাদীনার ঘরে ঘরে কুরআন শিক্ষার প্রচলন হয়, পারিবারিক মকতব চালু হয়। ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাদের সন্তানগণ, পৌত্রগণ এবং তাঁদের স্ত্রীগণও

৭৯. যাকীউদ্দীন আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (ঢাকা) খ. ১, পৃ. ৮৮-৮৯, জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ৫২

কুরআনের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘ইলমে দীন উঠে যাবার বিষয়ে কথা বললেন। যিয়াদ-ইবন লাবীদ আল-আনসারী (রা) আরজ করলেন :[৮০]

كيف يختلس منا وقد قرأنا القرأن فوالله لنقرأنّه ولتقرأنه نساءنا و أبناءنا.

‘ইলম আমাদের থেকে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা তো কুরআন পড়ে ফেলেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তা পড়ে থাকি, আমাদের স্ত্রীগণও তা পড়ে এবং আমাদের সন্তানরাও তা পড়ে।

অপর একটি বর্ণনায় কথটি এভাবে এসেছে :[৮১]

فقلت يا رسول الله و كيف يذهب العلم وقد أثبت و وَعته القلوب.

আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ‘ইলম কিভাবে চলে যাবে, অথচ তা তো দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং আমাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষণ করেছে?

আরেকটি বর্ণনায় যিয়াদ ইবন লাবীদের (রা) সূত্রে এসেছে :[৮২]

قالوايا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرءه أبناءنا ويقرأه أبناءنا أبناءهم.

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ‘ইলম কিভাবে চলে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদেরকে পড়াই এবং আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদেরকে পড়ায়।

এসব বর্ণনা দ্বারা মাদীনায় কুরআন ও দীনী শিক্ষার জন্য পারিবারিক মকতবের আধিক্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

কুরআনের নৈশ শিক্ষালয়

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মাদীনায় কুরআন শিক্ষার জন্য

---

৮০. আত্ তিরমিযী, আবওয়াবুল ‘ইলম, বাবু মা জাআ ফী যাহাবিল ‘ইলম
৮১. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ২০
৮২. উসুদুল গাবা, খ. ৩, পৃ. ৩৭২

নৈশ শিক্ষালয় চালু ছিল। সেখানে বহু সাহাবী গিয়ে কারী ও মু'আল্লিমদের নিকট কুরআন পড়তেন এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। সকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লেগে যেতেন।

ذكر أنس بن مالك رضى الله عنه سبعين رجلا من الانصار كانوا إذا جنّهم الليل آووا إلى معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القران، فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب الحطب واستعذب من الماء ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوها.

আনাস ইবন মালিক (রা) আনসারদের সত্তর (৭০) জন লোকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যখন রাত হতো তখন তারা মাদীনায় তাদের মু'আল্লিমদের নিকট যেত এবং রাত জেগে জেগে কুরআন পড়তো। সকাল হলে যাদের মধ্যে শক্তি-সমর্থ থাকতো কাঠ ও মিষ্টি পানি আনতো, আর যাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকতো তারা তাদের ছাগলের নিকট গিয়ে দেখাশুনা করতো।

এই নৈশ শিক্ষালয়ে সারা রাত কুরআন পড়া ও শোনা চলতো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত আগ্রহ- উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। এছাড়া মাদীনার বাইরে বিভিন্ন গোত্র ও তাদের মাসজিদসমূহেও এ ধরনের নৈশ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে মাদীনার মাসজিদসমূহের ইমামগণ ব্যাপকভাবে কুরআনের তা'লীম দিতেন। সেখানে রাত-দিনের কোন পার্থক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষালয় থেকে বের হওয়া বিশিষ্ট জনকে ইমাম নিয়োগ করা হতো। তিনি সালাতের ইমামতির সাথে সাথে মানুষকে কুরআন ও শরী'আতের তা'লীমও দিতেন।

মুজাহিদদের মধ্যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ

সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিহাদের মধ্যেও কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন। শত্রু এলাকায় কুরআন নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। তবে কুরআন শেখা ও শেখানোর ধারা অব্যাহত রাখা হতো। সহীহ আল বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) শত্রু এলাকায়ও কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন।

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وقدسافر النبى صلى الله عليه وسلم و أصحابه فى أرض العدووهم يعلمون القرأن.

ইবন 'উমার (রা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণনা করছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ শত্রু এলাকায় সফর করেন এবং সাহাবীগণ কুরআন পড়াতেন।[৮৩]

যখন কোন অভিযানে বাহিনী বের হতো তখন তাতে অনেক বেশি সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) অংশ গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবীসহ মাদীনায় থেকে যেতেন। এ সময়ে কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হলে, অভিযানে বের হওয়া লোকদের তা অজানা থেকে যেত। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় এ আয়ত :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের এটা উচিৎ নয় যে, তারা সবাই বের হয়ে পড়বে। সুতরাং এমন কেন হবে না যে, প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক বের হবে, তাহলে বাকী লোকেরা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে, এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সতর্ক করবে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, তাহলে তারা সতর্ক হবে।[৮৪]

এরপর থেকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সংগে থেকে যেতেন এবং এ সময় নাযিল হওয়া কুরআনের অংশ ফিরে আসা মুজাহিদদের শেখাতেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের সাথে যখন যুদ্ধে যেতেন তখন এ সময়ে যতটুকু কুরআন নাযিল হতো, মাদীনায় থেকে যাওয়া অনুমতি প্রাপ্ত ও অক্ষম লোকদের তা শেখাতেন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সাহাবীগণ।[৮৫]

---

৮৩. সাহীহ আল বুখারী, বাবুস সাফরি বিল মাসাহিফ ইলাল আরদিল 'আদুব্বি
৮৪. সূরা আত-তাওবা : ১২২
৮৫. আবূ হাতিম আর-রাযী, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (হায়দ্রাবাদ), খ. ১, পৃ. ৪০৩

স্থানে স্থানে কুরআন শিক্ষার মাজলিস

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের মাজলিসসমূহে কুরআন ও দীনের তা'লীম এবং পারস্পরিক আলোচনার ধারা চালু রাখতেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন :[৮৬]

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدوا يتحدثون، كان حديثهم الفقه الاّ أن يأمروا رجلا فيقرء عليهم سورة أو يقرء رجل سورة من القرأن.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ যখন একস্থানে বসতেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাদের সে আলোচনার বিষয় হতো দীনের বিধি-বিধান বিষয়ক। তবে সেই আসরে তারা কাউকে নির্দেশ দিতেন এবং সে তাঁদের সামনে একটি সূরা পড়তো, অথবা কেউ স্বত: প্রণোদিত হয়ে কুরআনের একটি সূরা পড়তো।

যে সকল সাহাবী নিজেদের জীবন-জীবিকার ব্যস্ততার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে নিয়মিত উপস্থিত হতে পারতেন না, উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁদের নিকট ওহী এবং হাদীছ বর্ণনা করতেন। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শেখা ও শেখানোর কর্মধারা চালু ছিল। 'উমার (রা) বলেন, মাদীনার 'আওয়ালীতে বানূ উমাইয়্যা ইবন যায়দ গোত্রে আমার এক অনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দু'জন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে হাজির হতাম। যে দিন আমি যেতাম ফিরে এসে প্রতিবেশীকে ওহী ও হাদীছ শোনাতাম, আর যেদিন তিনি যেতেন, ফিরে এসে আমাকে বলতেন। আনাস (রা) বলেন, যে সকল হাদীছ আমরা তোমাদেরকে শোনাচ্ছি তার সবই আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে শুনিনি। সেই সময় মানুষ মিথ্যা বলতো না। আর আমরা একে অপরকে মিথ্যাবাদী মনে করতাম না। বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন আমরা আমাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। আমাদের বন্ধুরা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনা করতো।[৮৭]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাস্তায় বসে আলোচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৮৬. আত-তাবাকাত, খ. ২, পৃ. ৩৭৪
৮৭. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ৫১

ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তখন তাঁরা বললেন,

يا رسول الله مالنا بُدٌّ من مجا لسنا نتحدَّث فيها

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের এই মাজলিসসমূহ এজন্য প্রয়োজন যে, এখানে আমরা পরস্পর হাদীছ বর্ণনা করি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে, তোমরা রাস্তার অধিকারও প্রদান করবে।

এ সকল বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মাদীনায় অলি-গলিতে তখন কিতাব, সুন্নাহ ও দীন বুঝার ব্যাপক ধারা শুরু হয়েছিল। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর সবাই দীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়তেন ও পড়াতেন। ফলে একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে গোটা শহরটি
دار العلم (দারুল 'ইলম) তথা জ্ঞানের নগরীতে পরিণত হয়।

বিভিন্ন গোত্রে ও স্থানে মু'আল্লিমদের নিয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনা থেকে দুরবর্তী স্থান ও গোত্রসমূহে এমনভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন যে, তাঁর মাজলিস থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীগণকে কারী, মুবাল্লিগ ও মু'আল্লিম হিসেবে সেখানে পাঠান। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় শ্রেণীর 'আলিমগণই থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলটিকে প্রয়োজনীয় দীনী তা'লীম দানের পর তাদেরকে বলেন :

احفظوه و أخبروه من وراءكم.

এগুলো মনে রেখ, আর যারা তোমাদের পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকে অবহিত করবে।

বানু আবাস গোত্রের প্রতিনিধিদল আসার পূর্বেই তাদের লোক মাদীনায় এসে দীনের তা'লীম লাভ করেছিলেন এবং তাঁরা ফিরে গিয়ে স্বগোত্রীয় লোকদের তা'লীম দিয়েছিলেন। এ কারণে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন :[৮৮]

---

৮৮. আত-তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ২৯৬

إنَّه قدم علیناقراءنا فأ خبرونا الح.

আমাদের কারীগণ আপনার নিকট থেকে এসে আমাদেরকে বলেছেন।

ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের ইমাম ও আমীর ছিলেন ‘উছমান ইবন আবিল ‘আস (রা)। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :[৮৯]

وكان يصليٍّ بهم ويقرءهم القرأن.

তিনি লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন এবং তাদেরকে কুরআনের তা‘লীম দিতেন।

শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিকতায় এ ঘটনা বড় হৃদয় বিদারক যে, ‘আদাল ও কারা গোত্রদয়ের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ওখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। আপনার সাহাবীদের একটি দল আমাদের সাথে পাঠান, যাঁরা আমাদেরকে দীনের তা‘লীম দেবেন, কুরআন পড়াবেন, ইসলামী শরী‘আত ও আরকান শেখাবেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছয়জন কারী ও হাফিযকে তাদের সাথে দেন। তাঁরা হলেন : মারছাদ ইবন আবী মারছাদ গানাবী, খালিদ ইবন বুকাইর লায়ছী, ‘আসিম ইবন ছাবিত ইবন আবূ আফলাহ, খুবাইব ইবন ‘আদী’, যায়দ ইবন দাছিনা ইবন মু‘আবিয়া; ‘আবদুল্লাহ্ ইবন তারিক (রাদি আল্লাহু ‘আনহুম)।

এই কাফিলাটি যখন রাজী‘ নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছে তখন ঐ কাফিররা তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে। খুবইব ইবন ‘আদীকে (রা) মক্কায় নিয়ে বিক্রী করে এবং মক্কার কাফিররা তাঁকেও হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর ‘উত্তাব ইবন উসাইদকে (রা) মক্কার ইমারাত এবং মু‘আয ইবন জাবালকে (রা) তা‘লীমের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইবন ইসহাক বলেন :[৯০]

انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إِلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلَّف معه معاذبن جبل يفقه الناس فى الدين ويعلَّمهم القرانَ.

---

৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫০৮
৯০. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫০০

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় ফিরে গেলেন। 'উত্তাব ইবন উসাইদকে (রা) মক্কার আমীর বানিয়ে যান এবং মু'আয ইবন জাবালকে (রা) তাঁর সাথে রেখে যান, যাতে তিনি মক্কাবাসীদের দীনের তা'লীম দেন ও কুরআন শেখান।

ইবন সা'দ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন:[৯১]

إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خلَّف معاذبن جبل بمكة حين وجه إلى حنين يفقه أهل مكة ويقرءهم القران.

রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইন যাবার সময় মু'আয ইবন জাবালকে (রা) মক্কায় রেখে যান, যাতে তিনি মক্কাবাসীদেরকে ফিকহর তা'লীম দেন এবং কুরআন পড়ান।

নাজরানের বানূ হারিছ ইবন কা'বের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ ইবন ওয়ালীদকে (রা) চার শো ইসলামী সৈনিকসহ পাঠান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদকে (রা) নির্দেশ দেন, আক্রমণের পূর্বে তাদেরকে তিনবার ইসলামের দা'ওয়াত দেবে। খালিদ নির্দেশ পালন করেন এবং তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে বানূ কা'ব ইবন হারিছকে দীনের তা'লীম দেন। ইবন সা'দ বলেন:[৯২]

ونزل بين أظهرهم يعلِّمهم الاسلام وشرائعه وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলাম, ইসলামী শরী'আত, কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর তা'লীম দেন।

একটি বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয ইবন জাবাল ও আবূ মুসা আল-আশ'আরীকে (রা) ইয়ামানে পাঠান এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দেন:

أن يعلما الناس القران.

তারা দু'জন যেন মানুষকে কুরআনের তা'লীম দেয়।

---

৯১. আত-তাবাকাত, খ. ২, পৃ. ৩৪৮
৯২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭২

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমীর ও 'আমেলগণ কেবল আমীর ও হাকেমই ছিলেন না বরং তারা মুবাল্লিগ, মু'আল্লিম, ইমাম ও কারীও ছিলেন। তারা কুরআন সুন্নাহ, ফিক্‌হ ও ইসলামী শরী'আতের তা'লীম দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামানের 'জানাদ' অঞ্চলের আমীর ও কাজী নিয়োগ করেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীনের তা'লীমও দিতেন। খালীফা ইবন খায়্যাত লিখেছেন :[৯৩]

ومعاذبن جبل على الجند، والقضاء وتعليم الناس الاسلام وشرائعه، وقراءة القران.

মু'আয ইবন জাবালকে 'জানাদ' অঞ্চলের বিচার কাজ পরিচালনা ও মানুষকে ইসলাম, ইসলামী শরী'আত ও কুরআনের তা'লীমের জন্য নিয়োগ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ যায়দ আল-আনসারী ও 'আমর ইবন আল-'আস আস-সাহমীকে (রা) আম্মানের শাসকদ্বয়- 'উবায়দ ইবন জালানদী ও জায়ফার ইবন জালানদীর নিকট পাঠান। তাঁরা দু'ভাই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পাঠানো আমীর ও মুবাল্লিগদের নির্দেশ দিয়েছিলেন এভাবে:[৯৪]

إن أجاب القوم إلى شهادة الحق، وأطاعوا الله ورسوله فعمرو الأمير، وأبو زيد على الصلوة وأخذ الاسلام على الناس وتعليمهم القران والسنن.

যদি সেখানকার মানুষ সত্যের সাক্ষ্যদানে সাড়া দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মেনে নেয়, তাহলে 'আমর ইবন আল-'আস আমীর হবে, আর আবূ যায়দ সালাতের ইমাম হবে, মানুষের নিকট থেকে ইসলামের অঙ্গীকার নেবে এবং তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর তা'লীম দেবে।

রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত সেখানে তারা দু'জন তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তবে একটি বর্ণনা মতে আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা) তার পূর্বেই মাদীনায় ফিরে আসেন।

---

৯৩. তারীখু খলীফা ইবন খায়্যাত (দিমাশক) খ. ১, পৃ. ৭২
৯৪. ফুতূহ আল-বুলদন, প. ৭৮

ইবন সা'দের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলা' ইবন আল-হাদরামীকে (রা) যাকাত আদায় ও কুরআনের তা'লীমের উদ্দেশ্যে 'আম্মানবাসীদের নিকট পাঠান।

أسلم أهل عَمَّان فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمى لتعليمهم شرائع الاسلام ويصدَق أموالهم.

আম্মানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ) তাদেরকে ইসলামী শরী'আতের তা'লীম এবং যাকাত আদায়ের জন্য 'আলা' ইবন আল-হাদরামীকে সেখানে পাঠান।[৯৫]

ইয়ামান থেকে কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলে:

ابعث فينا من يفقهنا فى الدين ويعلّمنا السنن ويحكم فينا بكتاب الله.

আপনি আমাদের ওখানে এমন কাউকে পাঠান যিনি আমাদেরকে দীন শেখাবেন, হাদীছ ও সুনানের তা'লীম দেবেন এবং কিতাবুল্লাহ দ্বারা আমাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলীকে (রা) বলেন, তুমি যাও :

ففقّههم فى الدين وعلّمهم السنن واحكم فيهم بكتاب الله.

অত:পর তাদেরকে দীনের গভীর তত্ত্ব শেখাও, সুনানের তা'লীম দাও এবং কিতাবুল্লাহ দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা কর।

'আলী (রা) বলেন, সেখানকার মানুষের বোধ ও বুদ্ধি কম। তারা আমার নিকট এমন সব বিষয় নিয়ে আসবে, যে বিষয়ে আমার হয়তো জানা থাকবেনা। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বুকের উপর হাত রেখে বলেন, যাও, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

---

৯৫. আত-তাবাকাত খ. ১, পৃ. ৩৫১

আনাস (রা) বলেন, ইয়ামানবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবেদন জানায় :

ابعث معنا رجلاً يعلّمنا القرأن.

আপনি আমাদের সাথে একজন লোক পাঠান যিনি আমাদেরকে কুরআনের তা'লীম দেবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ 'উবায়দাকে (রা) সাথে দেন এবং তাঁর পরিচয় দেন এভাবে : هذا أمين هذه الأمة-এ হচ্ছে এই উম্মাতের আমীন তথা অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।[৯৬]

এমনিভাবে তিনি 'আমর ইবন হাযমকে (রা) ইয়ামানবাসীদের নিকট পাঠান, যাতে তিনি যাকাত উসূলের সাথে তাদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের তা'লীম দেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তাদের নামে একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠান যাতে ইসলামের আহকাম উল্লেখ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে (রা) বানূ কায়স গোত্রের একটি শাখা গোত্রের নিকট পাঠান। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বানূ কায়স গোত্রে পাঠান, যাতে আমি তাদেরকে ইসলামী শরী'আত ও আহকামের তা'লীম দেই।

মাদীনায় তখন বিভিন্ন গোত্র ও মহল্লায় অনেক মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সব মাসজিদে যেতেন, সালাত আদায় করতেন এবং তাদেরকে তা'লীম দিতেন। মাহমুদ ইবন লাবীদ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ[৯৭]

صلّى النبىُّ صلى الله عليه وسلم صلاة المغلرب فى مسجد بنى الأشهل، فلما فرغ من صلاة قال: صلوا هاتين الركغتين فى بيو تكم.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানূ আল-আশহাল গোত্রে সালাতুল মাগরিব আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন : তোমরা এই দু' রাক'আত সালাত তোমাদের বাড়িতে আদায় করবে।

---

৯৬. হাকেম, আল-মুসতাদরিক, খ. ৩, পৃ. ২৬৭
৯৭. ইবন শুব্বা আন-নুমায়রী, তারীখ, আল-মাদীনা, খ. ১, পৃ. ৬৬

সাহাবিয়াত বা মহিলা সাহাবা

মহিলা সাহাবীদের অবস্থা উপযোগী যথারীতি তাঁদের তা'লীমের ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসে পুরুষদের সাথে উপস্থিত হতেন না। তবে তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁদের বিশেষ বৈঠকসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হয়ে তা'লীম দিতেন ও ওয়াজ করতেন। তাঁরা উম্মাহাতুল মু'মিনীন, বিশেষতঃ 'আয়িশা ও উম্মু সালামার (রা) মাধ্যমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব জেনে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত সাহাবীগণ নিজেদের স্ত্রীগণ ও ঘরের অন্যান্য মহিলাগণকে হাদীছ শোনাতেন। বৃদ্ধা ও আত্মীয় সম্পর্কের মহিলাগণ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে কথা বলে দীনী বিষয় জেনে নিতেন। বিভিন্নভাবে তাঁরা দীনী শিক্ষার নিজেদের অংশটুকু বুঝে নিতেন। আর এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজেদের জন্য সময় বরাদ্দের দাবীও জানাতেন। সহীহ বুখারীতে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :[৯৮]

قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجل، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهنَّ فيه فوعظهن وأمرهن قال لهنَّ مامنكن امرأة تُقَدِّمُ ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين

মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আপনার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পুরুষগণ আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এ কারণে আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেবল আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন। তিনি তাদের নিকট একটি দিনের অঙ্গীকার করেন। সেদিন তিনি তাদের সাথে মিলিত হতেন, তাদেরকে ওয়াজ করতেন এবং শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শোনাতেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা গেছে, তারা তাদের মায়ের জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। একথা

---

৯৮. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম : বাবু হাল নাজ'আলু লিন নিসায়ি ইওমান আলাহিদাতান ফিল 'ইলম, সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি

শুনে একজন মহিলা বললেন, যার দু'টি সন্তান মারা গেছে? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, দু'টি সন্তানও।

আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়্যা আল-আশহালিয়্যা (রা) ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী ও দীনদার মহিলা। মহিলা সাহাবীগণ নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট। তিনি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি মুসলিম মহিলাদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। তারা বলে এবং আমিও বলছি, আল্লাহ আপনাকে পুরুষ ও নারী সবার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা নারীরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি। আমরা পর্দানশীন, গৃহে অবস্থানকারিনী, পুরুষদের মনোরঞ্জনস্থল। তাদের সন্তানদের প্রতিপালনকারিনী। পুরুষ জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করে, জানাযা ও জিহাদে অংশগ্রহণ করে আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা ও ছাওয়াবের অধিকারী হচ্ছে। তারা যখন জিহাদে যায় তখন আমরা তাদের অর্থ-বিত্ত রক্ষণাবেক্ষণ করি। তাদের সন্তানদের লালন-পালন করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আমরা কি পুণ্য ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশীদার হতে পারি?

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমা' বিন্ত ইয়াযীদের (রা) এমন বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কিরামের (রা) দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আসমা বিনত ইয়াযীদের পূর্বে দীনের ব্যাপারে এর চেয়ে ভালো কোন প্রশ্ন কোন মহিলার নিকট থেকে শুনেছো? সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। এর পূর্বে এরকম কোন প্রশ্ন আমরা শুনিনি। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আসমা! এসো। এই মহিলাদেরকে বলে দাও ঃ

أنّ حسن تبعل إحداكنّ لزوجها و طلبها لمرضا ته
وأتباعها لمو افقته يعدل كل ما ذكرت للرجال.

তোমাদের কারো তার স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা, তার মেজাজ মর্জি অনুযায়ী চলা, ঐ সকল বিষয়ের সমমানের যা তোমরা পুরুষদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছো।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে এই কথাগুলো শুনে আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) দারুণ খুশি হন এবং আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতে দিতে পেছনে রেখে যাওয়া সেই মহিলাদের কাছে ফিরে যান এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী শোনান।[৯৯]

---

৯৯. ইবন 'আবদিল বার, আল-ইসতী'আব (হায়দ্রাবাদ), খ. ২, পৃ. ৭২৬

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময় ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে মহিলাদেরকে তা'লীম দিতেন। একবার তিনি বিলালকে (রা) সঙ্গে করে মহিলাদের একটি সমাবেশে যান, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করে সাদাকা ও দান খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করেন। মহিলারা কানের দুল, আঙ্গুলের আংটি খুলে খুলে দিতে থাকেন, আর বিলাল (রা) নিয়ে নিজের কোড়চে রাখতে থাকেন। হাদীছটি নিম্নরূপ।[১০০]

عن ابن عباسٍ رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ومعه بلال فظنَّ إنه لم يُسْمِعْ فوعَظَهنَّ وأمرهُنَّ بالصدقة فجعلت المرأة تُلقِى القُرْط والخاتم وبلال يأخذ فى طرف توبه.

ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে সংগে নিয়ে বের হলেন। তিনি ধারণা করলেন, তিনি (মহিলাদেরকে) শোনাতে পারেননি। অত:পর তিনি তাদেরকে ওয়াজ করলেন এবং তাদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা কানের দুল, আংটি খুলে দিচ্ছিল, আর বিলাল তা নিয়ে তার কাপড়ের এক কোণে রাখছিল।

'আয়িশা (রা) কোন বিষয়ে জানা না থাকলে, সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে তা রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে জেনে নিশ্চিত হতেন। অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের অবস্থাও এমন ছিল।

পুরুষ সাহাবীদের মত মহিলা সাহাবীদের মধ্যেও ফকীহ্, 'আলিম, মুফতী ও লেখিকা ছিলেন। 'আয়িশা (রা) ছিলেন ফাকীহাতুল উম্মাহ- উম্মাতের মহিলা ফকীহ। উম্মু সালামাও (রা) ছিলেন একজন মহিলা ফকীহ্ ও মুফতী। যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা) ছিলেন উম্মু সালামার (রা) কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে লালিত-পালিত। তাবি'ঈ আবূ রাফি (রহ) বলতেন, আমি মাদীনায় কোন মহিলাকে ফকীহ্ মনে করলে যায়নাব বিন্‌ত আবী সালামাকেই (রা) মনে করি। তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে:[১০১]

---

১০০. ইবন হাজার আল-'আসকিলানী, ফাতহুল বারী, (মিসর) খ. ১, পৃ. ১৬০, বাবু 'ইজাতিল ইমামি আন-নিসা ওয়া তালীমিহিন্না, মুসলিম, কিতাবুস সালাত

১০১. আল-ইসতী'আব খ. ২, পৃ. ৭৫৬, ইবন হাজার, তাহযীব আত-তাহযীব (হায়দ্রাবাদ) খ. ২, পৃ.৪২২

كانت من أفقه نساء أهل زمانها.

তিনি তার যুগের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ছিলেন।

উম্মুদ দারদা আল কুবরা (রা) ছিলেন একজন বুদ্ধিমতি, তাপসী ফকীহা ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারিনী মহিলা সাহাবী। সা'দা বিন্ত কামামা (রা) মহিলাদের সালাতের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁদের মাঝে দাঁড়াতেন।[১০২]

'সামরা বিন্ত নুহাইক আসাদিয়্যার (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ[১০৩]

عمَّرت وكانت تمر فى الأسواق وتأمر بالمعروف

وتنهى عن المنكر و تضرب الناس بسوط كان معها.

তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। বাজারে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সৎকাজের আদেশ করতেন এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। নিজের চাবুক দ্বারা মানুষকে মারতেন।

বহু মহিলা সাহাবী লেখা-পড়া জানতেন। 'আয়িশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) শুধু পড়তে জানতেন, তবে হাফসা (রা) লেখা ও পড়া দুটোই জানতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিফা বিন্ত 'আবদিল্লাহ আল-'আদাবিয়্যাকে (রা) বলেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে (রা) "নামলা" (ফোঁড়া)-এর ঝাঁড়-ফুঁক শিখিয়েছো সেভাবে লেখা শিখিয়ে দাও। শিফা (রা) লিখতে জানতেন। উম্মু কুলছুম (রা) বিন্ত 'উকবা ও কারীমা বিন্ত মিকদাদ লিখতেন।[১০৪]

এ সকল মহিলা সাহাবী পুরুষ সাহাবীদের মত কোন স্বতন্ত্র শিক্ষার আসর বসাননি, তবে তাঁদের সূত্রে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরাম (রা) তাঁদের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরাসরি অথবা কোন আত্মীয়ের মাধ্যমে তাঁদের থেকে হাদিছ ও ফাতওয়া জেনে নিতেন।

---

১০২. তাযরিকাতুল হুফ্ফাজ, খ. ১, পৃ. ১২৫
১০৩. আল-ইসতী'আব, খ. ১, পৃ. ৭৬০
১০৪. ফুতূহ আল-বুলদান, পৃ. ৪৫৮

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যে, 'আলিম, জাহিল, শহরবাসী, মরুবাসী, বেদুঈন, আরবী, আজমী, বৃদ্ধ, শিশু, যুবক সকলে পূর্ণরূপে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। তার সকল কথা সকলের অন্তরের গভীরে পৌঁছে যেত। আনাস (রা) বলেন :[১]

إنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنـــه، وإذا أتى على قوم فسلَّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثاً.

তিনি যখন কোন কথা বলতেন, (প্রয়োজনে) তিনবার বলতেন, যাতে তা বুঝা যায়। আর যখন কোন দল বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন এবং সালাম করতেন, তখন তাদেরকে তিনবার সালাম করতেন।

আরেকটি বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে,

إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا حـــدَّث حـــديثاً أعاده ثلاَثَ مرَّاتٍ.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তিনবার বলতেন।

আবূ হুরাইরা (রা)-একবার 'আয়িশার (রা) ঘরের কাছে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তখন 'আয়িশা (রা) সালাত আদায় করছিলেন। আবু হুরাইরা (রা) তাঁর শিক্ষার আসর শেষ করে চলে যান। 'আয়িশা (রা) সালাত শেষ করে 'উরওয়া ইবন যুবাইরকে (রা) বলেন, আবূ হুরাইরাকে (রা) পেলে আমি তার তাড়াতাড়ি হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতাম। তারপর তিনি বলেন,

---

১. সাহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম- বাবু মান আ'আদাল হাদীছা ছালাছান; ফাতহুল বারী, খ- ১, পৃ- ১৫৫

إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكـــن يســـرد الحديث سردكم.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মত হাদীছ তাড়াতাড়ি ও বিরতিহীনভাবে বর্ণনা করতেন না।

ভিন্ন একটি বর্ণনায় 'আয়িশা (রা)-একথা বলেন,[২]

إن كان رسول الله صلى الله عليـــه وســـلم لِيُحَـــدِّثَ الْحَدِيْثَ لَوْشَاءَ الْعادُّ أن يحصيه أحصاه.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এমনভাবে হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, কোন গণনাকারী ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারতো।

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শিক্ষা মাজলিসে প্রত্যেকটি বাক্য প্রয়োজনে তিনবার বলতেন এবং থেমে থেমে এমনভাবে বলতেন যাতে শ্রোতাদের অন্তরে তা বসে যায়, স্মৃতিতে ধারণকারীরা তা মুখস্থ করে নেয় এবং লেখকরা তা লিখে নেয়। কোমল ও মিষ্টি মধুর বর্ণনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির অবস্থা এমন ছিল যে, নওমুসলিম আরব বেদুঈনগণও বিমুগ্ধ হয়ে যেত। মু'আয ইবন হাকাম (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইমামতিতে আমি সালাত আদায় করছিলাম। সালাতের পরিপন্থী একটি কাজ আমার দ্বারা হয়ে যায় এবং তাতে মুসল্লীদের মধ্যে একটু অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করে আমাকে অতি নরম ভাবে বুঝান। মু'আয বলেন :

فبأبى وأمى، مارأيت معلّما قبله ولابعده أحسن تعليمًا منبه، فو الله ماكهرنى ولاضربنى ولا شتمنى، قال إن هذه الصلواة لايصلح فيها من كلام الناس، إنما هـــى التسبيح والتكبير وقراءة القران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আমার পিতামাতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক! আমি না তাঁর পূর্বে, আর না

২. সুনান আবী দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, বাবুন ফী সরদিল হাদীছ

পরে তাঁর চেয়ে ভালো কোন শিক্ষক দেখেছি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে না ধমক দিয়েছেন, না মেরেছেন, আর না গালমন্দ করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, এই সালাতে মানবীয় কোন কথাবার্তা সঙ্গত নয়। এতো হলো শুধুমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত।

সা'দ ইবন বাকর গোত্রের দাম্মাম ইবন ছা'লাবা (রা) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে এসে বলেন,

إنىّ سائلك فمشدِّد عليك فى المسئلة فلا تجد علىَّ فى نفسك.

আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে খুব কঠোরতা করবো। এজন্য আপনি যেন মনে মনে আমার উপর ক্ষেপে না যান।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথা শুনে বলেন ঃ

سَل عما بدا لكَ 'তুমি তোমার ইচ্ছা মত প্রশ্ন করতে পার।'[৩]

একবার একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতে আমরা আমাদের কাপড় নিজ হাতে তৈরি করবো? তার এমন প্রশ্ন শুনে মাজলিসে উপস্থিত সকলে হাসতে থাকেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেন:

ممَّ تضحكون؟ من جاهل يسأل عالماً

তোমরা হাসছো কেন? যে না জানে সে কোন 'আলিমকে জিজ্ঞেস করবে।

তারপর তিনি সরল সোজা বেদুঈনকে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলেন:[৪]

لا، يا أعرابى، ولكنها تشقق عنها ثمار الجنة.

ওহে বেদুঈন! না। বরং জান্নাতের ফলসমূহ ফেটে যাবে, আর সেখান থেকে কাপড় বেরিয়ে আসবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) ভীষণ জোর দিতেন এবং নিজেও খুব যত্নবান হতেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের সূরার

---

৩. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কিরাআতি ওয়াল 'আরদি আল...
৪. আল-ফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ- ২, পৃ. ১৩৭

মত গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে এই দু'আটি শেখাতেন:

اللّهمَّ أعوذبك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عـــذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بـــك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে নিস্কৃতি চাই। আমি আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আমি আশ্রয় চাই মাসীহ আদ-দাজ্জালের ফিতনা থেকে। পানাহ্ চাই জীবন ও মৃত্যু ও কবরের পরীক্ষা থেকে।

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কুরআনের সূরার মত ইস্তিখারার (সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা) তা'লীম দিতেন। তেমনিভাবে কুরআনের সূরার মত তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিতেন।

১. প্রশ্নোত্তর ও পারস্পরিক আলোচনা

মাজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট দীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাঁদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে একটি কথা শুনেছি এবং সে ব্যাপারে আমার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় আছে। তিনি বললেন,

إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ فِي الأَمْرِ فَلْيَسْئَلْنِي عَنْهُ.

যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কোন ব্যাপারে সন্দেহ করে তখন সে যেন আমাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে!

অতঃপর মিকদাদ (রা) নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সন্তোষজনক জবাব দেন।[৫]

একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রশ্ন করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তি? বললেন: যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী, সে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু

---

৫. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ- ১, পৃ. ৪৮

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, ইউসুফ ইব্‌ন নবীয়্যুল্লাহ ইবন খালীলুল্লাহ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, এটাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আমার নিকট উঁচু স্তরের সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে চাচ্ছো?

خيارهم فى الجاهلية خيا رهم فى الاسلام إذا فقهــوا وعلموا أحكام الشرع.

যারা জাহিলী যুগে ভালো ছিল তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও ভালো- যদি তারা দীনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে এবং শরী'আতের আহকাম বিষয়ে জানে।

একবার আবু যার আল গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করেন: সবচেয়ে ভালো 'আমল কোনটি? তিনি বলেন: আল্লাহর উপর ঈমান ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আবূ যার (রা) আবার প্রশ্ন করেন: কোন ধরনের দাস মুক্ত করা উত্তম? বললেন: যে তার মনিবের প্রিয়পাত্র এবং যার মূল্য বেশি। আবূ যার (রা) বলেন: যদি আমি এর কোনটি করতে সক্ষম না হই? বললেন: তুমি কোন অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করবে অথবা কোন অভ্যাগতের কাজ করে দেবে। আবূ যার (রা) বললেন: যদি আমি এটাও করতে না পারি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি তোমার অকল্যাণ থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখবে। এ এমন এক সাদাকা যা তুমি নিজেই নিজেকে করবে।

সুফইয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এমন 'আমলের কথা বলে দিন যা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। অতঃপর সে ব্যাপারে আপনি ছাড়া আর কারো নিকট জিজ্ঞেস করবো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি اٰمَنْتُ بِاللهِ (আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি) বল এবং এই বিশ্বাসের উপর অটল থাক।"

'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট কোন 'আমল সর্বাধিক প্রিয়? বললেনঃ সময় মত সালাত আদায় করা। বললামঃ তারপর? বললেনঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার উচ্চারণ করলেনঃ والله لايؤمن -আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন হবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে ব্যক্তি কে? বললেনঃ যে ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার মাজলিসে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথা বলতে বারণ করতেন। এমন কি মাঝে মধ্যে অহেতুক প্রশ্ন শুনে রেগে যেতেন। সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বলতেন, আমি যে কথা না বলবো তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ অত্যধিক প্রশ্ন এবং নিজেদের নবীদের ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি যা থেকে বিরত থাকতে বলবো, তোমরা বিরত থাকবে, আর যা করতে বলবো, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা 'আমল করবে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন সব কথা জানতে চাওয়া হয় যা তাঁর মোটেও পছন্দনীয় ছিল না। প্রশ্নকারী অবস্থা না বুঝে প্রশ্ন করতেই থাকেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের যা কিছু জিজ্ঞেস করার তা আমাকে জিজ্ঞেস কর। একজন প্রশ্ন করলো, আমার পিতা কে? বললেনঃ তোমার পিতা হুযাফা। আরেকজন বললোঃ আমার পিতা কে? বললেনঃ সলিম মাওলা শায়বা। মাজলিসে 'উমার (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করে সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা সবাই তাওবা করছি। মূল হাদীছটি এরকম :[৬]

عن أبى موسى الأشعرى قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عن أشياء، فلما اكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني ما شئتم، قال رجل من أبى؟ قال أبوك حُذافَة، فقام آخر فقال : من أبى يا رسول الله! فقال : أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما فى وجهه، قال : يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله عز وجل.

কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই মাজলিসে

---

৬. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম- বাবুল গাদাবি ফিল মাও'ইজতি ওয়াত তা'লীম; ফাতহুল বারী, খ-১, পৃ- ১৫০, হাদীছ নং ৯০, ৯১

উলস্থিত লোকদেরকে প্রশ্ন করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জবাবে সাধারণত বলতেনঃالله ورسوله أعلم -আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন । তারপর তিনি নিজেই জবাব দিয়ে শিখিয়ে দিতেন। সাহাবায়ে কিরামের রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির অবস্থা এমন ছিল যে, বিদায় হজ্জের সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট জিজ্ঞেস করেনঃ أيُّ شهر هذا এটা কোন মাস? জবাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেনঃ الله ورسوله أعلم। এভাবে তিনি আরো অনেক প্রশ্ন করেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা)-একই জবাব দিতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, আমরা বুঝেছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ গুলোর নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে নামকরণ করবেন ।

'ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যভিচার, মদপান ও চুরির ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? আমরা বললাম ঃ الله ورسوله أعلم -আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এ সবই অশ্লীল কাজ, এতে শাস্তির বিধান আছে। তারপর বলেন; আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপ কোনগুলো তা বলবো না ? আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তারপর একটু চুপ থেকে বলেন, মিথ্যা বলা।[৭]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করেন: তোমাদের মধ্যে কার নিজের ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীর ধন-সম্পদ বেশি প্রিয়? সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের সবারই তার নিজের ধন-সম্পদ বেশি প্রিয়। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে (দান খয়রাত করেছে), সেটাই তার সম্পদ। আর যে সম্পদ ছেড়ে গেছে, তা হচ্ছে উত্তরাধিকারীর সম্পদ।

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসে বসা সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রশ্ন করলেন: সেটা কোন গাছ যার পাতা ঝরে না এবং তা মুসলিমের মত। উপস্থিত সকলে এ প্রশ্ন শুনে জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের তালাশ করতে লাগলেন। অবশেষে তারা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলে দিন। ইবন 'উমার বলেন, আমার অন্তরে উদয় হয়েছিল যে, এটা খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি একজন অল্পবয়স্ক তরুণ হওয়ার কারণে তা প্রকাশ করি নি।

---

৭. ইমাম আল বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ (মিসর), বাবু 'উকূবাতি 'উকূকিল ওয়ালিদাইন

অবশেষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা খেজুর গাছ। হাদীছটি নিম্নে দেওয়া হলোঃ[৮]

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهـا وإنهـا مثـل المسلم فحدّثونى ما هى فوقع الناسُ فى شجر البوادي قال عبد الله ووقع فى نفسى أنها النخلة فا ستحييت ثم قالوا حدثنا ما هى يا رسول الله قال هى النخلة.

২. অভ্যাগতদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে দীনী বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করার সাধারণ অনুমতি ছিল এবং তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এমন কি মাঝে মাঝে নিজে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দিতেন। তা সত্ত্বেও মাজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, বেশি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন। তারা অপেক্ষায় থাকতেন, কোন একজন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করুক এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জবাব শুনবেন। তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা) উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য জীবন দানের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে বলেনঃ সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। একথার অনুসন্ধান ও সত্যায়নের জন্য সাহাবায়ে কিরাম একজন মূর্খ বেদুঈনের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করান। তিনি সে প্রশ্নের জবাব দেন। তিরমিযীতে বর্ণনাটি এসেছে এভাবেঃ[৯]

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه قـالوالأعرابى جاهل سله عمَّن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يحبتر ؤن على مسئلته، يوقرو نـه و يهـابو نـه، فسـأله الأعرابى.

---

৮. সাহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, ফাতহুল বারী, খ- ১, পৃ- ৯৭

৯. তিরমিযী, মানাকিবু আবী মুহাম্মাদ তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ একজন বেদুঈনকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিজের প্রয়োজন পূর্ণকারী-র ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কে? সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেতেন না। তাঁরা তাঁকে অতিরিক্ত সম্মান করতেন, ভীষণ ভয়ও করতেন। সুতরাং বেদুঈন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন:[১০]

كنا نهينا فى القران أن نسألَ رســول الله صــلى الله عليه وسلم عن شيئى، فكان يُعْجِبُنَا أن يَجِئَ الرجــل من أهل البادية العاقلُ فيسأله ونحن نسمع.

রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে কুরআনে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। অতএব আমরা চাইতাম গ্রাম থেকে কোন বেদুঈন আসুক এবং সে প্রশ্ন করুক, আর আমরা শুনি।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে জিবরীল অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'উমার (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় মাথায় উসকো খুসকো চুলওয়ালা একজন লোক আসলো। তার পরনের কাপড় অতি সাদা, চুল ঘনকালো। তার উপর ভ্রমনের কোন ছাপ ছিল না এবং আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে চিনতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু মিলিয়ে এবং নিজের রানের উপর হাত রেখে ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিতে থাকেন, আর সে صدَّقْتَ (সত্য বলেছেন) বলতে থাকে। আমরা অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, সে নিজেই প্রশ্ন করছে এবং নিজেই সত্যায়ন করছে। অতঃপর সে কিয়ামাত ও আলামতে কিয়ামাত বিষয়ে প্রশ্ন করলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন। এরপর সে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমারকে (রা) বললেন, তোমরা কি জান প্রশ্নকর্তা কে? 'উমার (রা) বললেন الله و رسوله أعلم (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন)

---

১০. সাহীহ্ মুসলিম, খ- ১, পৃ- ৬৯; নাসাঈ, খ- ৪, পৃ. ১২১

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

فَإِنَّهُ جِبْرِيْلٌ أَتَاكم يعلّمكم دينكم

তিনি জিবরীল (আ), তোমাদেরকে দীন শেখানোর জন্য এসেছিলেন।

উসামা ইবন শুরাইক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক বেদুঈন আসলো। তাদেরকে দেখে মাজলিসে উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে গেলেন এবং কেবল তারা কথা বলতে লাগলো। তারা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক কথায় আপত্তি কিসের? অথচ তাতে কোন পাপের কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরাসরি জবাব দানের পরিবর্তে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! যুলম ও বাড়াবাড়ি করে কারো অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়াতে আপত্তি ও পাপ আছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করে, আমরা কি চিকিৎসা করাতে পারি? বললেন: হাঁ, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কর। আল্লাহ একটি রোগ ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তারা বললো সেই রোগটি কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেটা হলো বার্ধক্য। এরপর তারা প্রশ্ন করে: ইয়া রাসূলাল্লাহ, মানুষকে সবচেয়ে ভালো কোন জিনিসটি দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন: ভালো স্বভাব-চরিত্র।[১১]

তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ (রা) বলেন, নাজদ অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলো। তার মাথার কেশ অবিন্যস্ত ছিল। আমরা তার অস্পষ্ট শব্দ শুনছিলাম, কিন্তু কী বলছে তা বুঝতে পারছিলাম না। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে কথা বললো তখন জানা গেল যে, সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। লোকটি বললো- এছাড়া অতিরিক্ত আর কোন সালাত আছে কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, তবে কেউ চাইলে নফল সালাত আদায় করতে পারে। এভাবে সে রামাদান মাসের সাওম ও যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জবাবের পর একই কথা বলতে থাকে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিতে থাকেন।

সর্বশেষে লোকটি একথা বলতে বলতে চলে যায় যে, আল্লাহর কসম! আমি না এর চেয়ে বেশি করবো, আর না এর চেয়ে কম করবো। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এন্তব্য করেন:

---

১১. আল-আদাবুল মুফরাদ, বাবু হুসনিল খুলকি ইযা ফাকিহা

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে সফলকাম হয়েছে।

সা'দ ইবন বাকর গোত্রের প্রতিনিধি দাম্মাম ইবন ছা'লাবা (রা) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে এসে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ইসলামের আরকান বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সকল প্রশ্নের জবাব দেন। তাতে মাজলিসে উপস্থিত সকলে দীনী জ্ঞান লাভ করেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলো: কিয়ামাত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট জানতে চাইলেন: তুমি সে জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? সে বললো : আমি অনেক বেশি দান-খয়রাত করে প্রস্তুতি নিতে পারি নি, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালোবাসি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: মানুষ যার সাথে প্রীতির সম্পর্ক রাখে, কিয়ামাতের দিন তার সাথে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখে এ সুসংবাদ শুনে আমরা এত পরিমাণ খুশি হই, যে পরিমাণ ইসলাম গ্রহণ করার দিন হয়েছিলাম।

৩. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা মাজলিস থেকে উঠে যাবার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) পরস্পর আলোচনা ও অনুশীলন করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এমনটি করতে তাকিদ ও উৎসাহ দিতেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি শেষ পর্যায়ের মুহাজিরদের একটি দলের সাথে ছিলাম। একজন কারী আমাদেরকে কুরআন শোনাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি করছো? আমরা বললাম:

يا رسول الله أنه كان قارى لنا يقرء علينا فكنا نستمع إلى كناب الله.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একজন কারী কুরআন পড়াচ্ছিলেন এবং কিতাবুল্লাহ শুনছিলাম।

তিনি বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকদের সৃষ্টি করেছেন যাদের সাথে আমার বসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একথা বলে তিনি

আমাদের দলটির মধ্যে বসে পড়েন এবং আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।[১২]

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, অধিকাংশ সময় আমরা ষাটজনের মত লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত থাকতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি উঠে যাবার পর আমরা সেই হাদীছ সমূহ আলোচনা ও পুনরাবৃত্তি করতাম। এমন অবস্থায় আমরা আলোচনার আসর থেকে উঠতাম যে, হাদীছগুলো আমাদের অন্তরে উদ্ভিদের মত শিকড় গেড়ে বসতো। রাফি' ইবন খাদীজ (রা) বলেন, আমরা মাসজিদে নববীতে বসে হাদীছ আলোচনা করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যে আসেন এবং বলেন, তোমরা কী করছো? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যা কিছু আপনার নিকট থেকে শুনেছি তারই আলোচনা ও পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বললেন, ঠিক করছো। তোমরা হাদীছ মুখস্থ করে অন্যদের নিকট বর্ণনা করবে। অবশ্য যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানাবে। এতটুকু বলে তিনি ভেতরে চলে যান, আর আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকলাম। তিনি বললেন, তোমরা সবাই এমন চুপ হয়ে গেলে কেন? আমরা বললাম, আপনার কথা শুনে চুপ হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, আমার কথার উদ্দেশ্য এটা নয়, বরং যে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করবে তার জন্য শাস্তির এ অঙ্গীকার। রাফী' (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনি, তা কি আমি লিখে নেব? তিনি বললেন, হাঁ লিখে নাও। এতে কোন আপত্তি নেই।[১৩]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে নববীতে দু'টি মাজলিস দেখতে পেলেন। একটি মাজলিসের সদস্যরা যিক্‌র ও দু'আর মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন, আর দ্বিতীয় মাজলিসের সদস্যরা পঠন-পাঠন ও ইসলামের বিধি-বিধান বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত আছেন। তিনি এই শেষোক্ত মাজলিসের সদস্যদের জন্য দু'আ করেন এবং সেখানে বসে পড়েন।

৪. হারাম হওয়ার বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়ার জন্য নিষিদ্ধ বস্তু হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝে যে বস্তুটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন সেটি হাতে উঠিয়ে শ্রোতাদের সামনে উঁচু করে ধরতেন। মুখে নিষিদ্ধ

---

১২. আবূ দাউদ, খ- ২, পৃ. ১৬০
১৩. কাজী হাসান রামহুরমুযী, আল-মুহাদ্দিছ-আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়াঈ, (বৈরূত), পৃ. ৩৬৯

ঘোষণার পাশাপাশি বস্তুটি বাস্তবেও দেখিয়ে দিতেন। এতে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি শ্রোতাদের অন্তরে শক্তভাবে বসে যেত, সাথে সাথে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টও হয়ে যেত। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো:[১৪]

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قــال : أخــذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَرِيْرًا بشماله وذَهَبًا بيمينه، ثم رَفَعَ بهما يَدَيْهِ فقال : إنَّ هذ ين حرامٌ على ذكور أمَّتى، حِلٌ لإنَا ثهم.

'আলী ইবন আবী তালিব রাদি আল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাম হাতে রেশম ও ডান হাতে স্বর্ণ ধরে দু'হাত উঁচু করে বলেন: এ দু'টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম, তবে নারীদের জন্য হালাল।'

عن عُبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يَاخذ الوَبَرَةَ من جنب البعير من المغنم فيقول : مالى فيه إلا مثل ما لأجدكم منــه، إياكم والغُلُول، فإن الغلول خزى على صــأحبه يــوم القيامة، أدُّوا الخــيط والمخــيَطَ ومــا فــوق ذلــك، وجاهدوافى سبيل الله تعالى القريــب والبعيــدَ، فــى الحضرو السفرِ، فإن الجهادَ بابٌ من أبواب الجنَّــةَ- إنه ليُنجى الله تبارك وتعالى به مــن الهــمِّ والغــمِّ، وأقيموا الحدود فى القريب والبعيد، ولا يأخُذْكم فى الله لومة لائم.

'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৪. আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস-বাবুন ফিল হারীর লিন নিসা; আন-নাসাঈ, কিতাবুয যীনাতি-বাবু তাহরীম আয-যাহাব 'আলার রিজাল; ইবন মাজাহ, কিতাবুল লিবাস-বাবু লুবসিল হারীর ওয়ায যাহাব লিন নিসা

ওয়া সাল্লাম) গণীমতের উটের পার্শ্বদেশ থেকে একটি পশম হাতে ধরে বলতেন: এই গণীমতের সম্পদে তোমাদের একজনের যতটুকু অধিকার আছে আমারও ততটুকুই আছে। তোমরা আত্মসাৎ থেকে দূরে থাক। কারণ কিয়ামাতের দিন এই আত্মসাৎ আত্মসাৎকারীর জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। তোমরা সুঁই-সূতা এবং এর উপরে যা কিছু আছে সবই জমা দেবে। তোমরা মহান আল্লাহর পথে নিকট ও দূরের বিরুদ্ধে আবাসে-প্রবাসে জিহাদ কর। কারণ জিহাদ হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। মহিমান্বিত আল্লাহ এর দ্বারা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন। তোমরা নিকট ও দূরবর্তীদের মধ্যে 'হদ' (নির্ধারিত শাস্তির বিধান) কায়েম কর। আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।[১৫]

৫. সঙ্গী-সাথীদের পক্ষ থেকে কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই তিনি নিজে কোন বিষয়ের জ্ঞান দান শুরু করতেন

বিশেষত: অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি এমনটি করতেন। অনেক সময় শ্রোতা বা সঙ্গীরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার ব্যাপারে মোটেও সচেতন থাকতেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীদের অন্তরে কোন একটি বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার জবাব দিয়ে দিতেন। যাতে তা অন্তরে উদয় হয়ে শক্ত ভীত গড়ে তুলতে না পারে এবং সে অনুযায়ী কোন কর্মও সম্পাদন করে না ফেলতে পারে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

আবূ হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৬]

يأ تى الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا و كـــذا؟ حتى يقول له: من خلَقَ ربَّك؟ فإذا بلغ ذلك، فليســتعذ بالله ولْينتهِ.

তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে: এরূপ, এভাবে কে সৃষ্টি

---

১৫. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ-বাবুল গুলূল; মুসনাদ আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৩৩০

১৬. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবু বুদয়িল খালক-বাবু সিফাতি ইবলীস ওয়া জুনূদিহি; কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ-বাবু মা ইউকরাহু মিন কাছরাতি আস-সু'আল; মুসলিম কিতাবুল ঈমান-বাবু বায়ানিল ওয়াসওয়াসাতি ফিল ঈমান

করেছে? এমন কি সে তাকে বলে: তোমার প্রতিপালককে (রব) কে সৃষ্টি করেছে? এ পর্যন্ত সে যখন পৌঁছে তখন তার উচিত হবে (শয়তানের এই কু-প্রচারণা থেকে) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং এ বিষয় থেকে বিরত থাকা।

অর্থাৎ তার মেধা ও মস্তিষ্ককে এভাবে শয়তানের পেছনে ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত হতে হবে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে শয়তান এই কু-প্ররোচনা দ্বারা তার দীন ও 'আকল বিনষ্ট করতে চায়। তাই অন্য কাজে মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

আবূ হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لا يزالُ الناس يتساءلون، حتى يُقال هذا : خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فمن وَجَدَ ذلك شيئًا فَلْيَقُلْ : آمنت بالله وفى رواية ثانية : فإذا قالوا ذلك، فقولوا : "اللهُ أحد، اللهُ الصَّمَد، لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، وَلم يكنْ لَه كُفُوًا أحد" ثم لَيَتْفُلْ عن يساره ثلاثا، وَلْيَسْتَعِذْ من الشيطان.

মানুষ সব সময় একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করতে থাকবে, এমন কি এরকম প্রশ্নও করা হবে : আল্লাহ সৃষ্টজগতকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ যদি এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, সে যেন বলে: 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "যখন তারা এমন কথা বলে, তোমরা বলবে: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, তিনি কাকেও জন্ম দেন নি, তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই। তারপর সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।[১৭]

আমীর 'আলা' উদ্দীন আল-ফারেসীর সম্পাদনায় ইবন হিব্বানের "সাহীহ" গ্রন্থের

---

১৭. আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাতি-বাবুন ফিল জাহমিয়্যাতি; হাফিজ আল-মুনযিরী, মুখতাসারুস সুনান, খ. ৭, পৃ. ৯১

সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো "এ পরিচ্ছেদে এমন কিছু হাদীছ সংকলন করা হলো যা দ্বারা একজন শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে যে বিষয় শিক্ষা দিতে চান তা সূচনাতেই সরাসরি উপস্থাপনের এবং ছাত্রদেরকেও এমনটি করার জন্য উৎসাহ প্রদানের বৈধতা প্রমাণ করে।"[১৮]

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য যখন হেলে গেল ঘর থেকে বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে মিম্বরের উপর উঠলেন। অতঃপর কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তার পূর্বে অনেক বড় বড় বিষয় সংঘটিত হবে। তারপর বললেন: কেউ আমার নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে জিজ্ঞেস কর। আল্লাহর কসম! আমি যতক্ষণ আমার এ স্থানে আছি তোমরা যে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আমি তার জবাব দেব।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-মুখ থেকে একথা শুনে লোকেরা প্রচুর কান্নাকাটি করলো। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বার বার বলতে থাকলেন, আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে জিজ্ঞেস কর। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার পিতা হুযাফা।

হাদীছটি আল বুখারী ও মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে অতিরিক্ত একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার বার বলতে লাগলেন, "আমাকে জিজ্ঞেস কর," তখন 'উমার হাঁটু গেড়ে বসে বললেন: আমরা আল্লাহকে রব (প্রতিপালক), ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়েছি। 'উমারের (রা)-একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ হয়ে যান। তারপর তিনি বলেন! তোমরা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, সেই সত্তার কসম! এই প্রাচীরের মধ্যভাগে এই মাত্র আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রদর্শন করা হয়েছে। আমি আজকের মত নিজেকে ভালো ও মন্দের মধ্যে আর দেখি নি।[১৯]

৬. প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো কেবল প্রশ্নকারীর প্রশ্নের

---

১৮. দ্বিতীয় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৩০৬

১৯. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম-বাবু মান বারাকা 'আলা রুকবাতাইহি 'ইনদাল ইমাম আও আল-মুহাদ্দিছ; মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল

জবাবদানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এভাবে তিনি দীনের বহু বিধি-বিধান, শরী'আতের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবন-যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যে সকল সমস্যা ও জটিলতার মুখোমুখি হতেন সে ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের আহকাম জানার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রশ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। জাবির (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ.

অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা।

অর্থাৎ অজ্ঞতারূপী রোগের চিকিৎসা কেবল জিজ্ঞাসা করে জানার মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনও প্রশ্ন করে জেনে নিতে বলেছেন:

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট প্রশ্ন কর।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন সন্দেহ-সংশয়, কোন রকম জটিলতা, অবোধ্যতার সম্মুখীন হলে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাঁদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এ জাতীয় বহু প্রশ্নোত্তর সম্বলিত হাদীছ প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে আমরা তার থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করছি:

নাওয়াস ইবন সাম'আন আল-কিলাবী (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে মাদীনায় এক বছর অবস্থান করলাম। কেবল প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোন কিছু আমাকে মাদীনায় হিজরাত থেকে বিরত রাখে নি। আমাদের কেউ মাদীনায় হিজরাত করলে সে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করতো না।

অর্থাৎ নাওয়াস (রা) যে এক বছর মাদীনায় ছিলেন, তা নিজের জন্মভূমি ও ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মুহাজির হিসেবে নয়, বরং একজন বহিরাগত অতিথি হিসেবে। আর তাঁর হিজরাত না করার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রশ্ন করে জানার সুযোগ গ্রহণ করা। কারণ, মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তেমন প্রশ্ন করতেন না, কিন্তু বহিরাগত অতিথিরা প্রশ্ন করার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতো। নাওয়াস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করলাম পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন:

البرُّ حُسْنُ الخلق، والإثم ماحاك فى نفسك وكرهت أن يَّطلع عليه الناس.

পুণ্য হলো সুন্দর চরিত্র ও নৈতিকতা, আর পাপ হলো তোমার অন্তরে যা কিছু উদয় হয় এবং মানুষ তা জেনে ফেলুক তুমি তা পছন্দ কর না।[২০]

عن رافع بن خَدِيْج قال : قلتُ : يا رسـول الله، إنـا نخاف أن نَلْقى العدوَّ غدًا، وليس معنا مُدَى، قال : ما أنهَرَ الدم وذكرَ اسمُ الله فَكُلْ، ليسَ السِّـنَّ والظُّفُـرَ، وسأُحدثُكَ، أما السن فعظْمٌ وأما الظُّفُر فمُدَى الحبشة.

রাফি' ইবন খাদীজ (রা) বলেন, আমি বললাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামী কাল শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় করছি এমতাবস্থায় যে, আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই।

তিনি বললেন: যা রক্ত প্রবাহিত করাবে এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হবে, তা খাবে। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে (রক্ত প্রবাহিত করলে) হবে না। আমি এর কারণ এখনই বলে দিচ্ছি। দাঁত হলো হাড়, আর নখ হলো হাবশাবাসীদের ছুরি।[২১]

জাহিলী যুগে এ দ্বারা ছোট ছোট পাখি যেমন চড়ুই এবং ছোট ছোট জন্তু যেমন খরগোশ জবাই করতো। ইসলাম এ জাতীয় যবেহকে হারাম ঘোষণা করে।

আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বসবাস আহলি কিতাব এর (আসমানী গ্রন্থের অধিকারী) ভূমিতে। আমরা কি তাদের পাত্রে আহার করতে পারি?

আর আমাদের বসবাস একটি শিকার-অঞ্চলে, আমি আমার ধনুক (قوس), প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর ও প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা (পশু-পাখি) শিকার করি। এসব ব্যাপারে আমাদের জন্য বৈধ পন্থা কী? উল্লেখ্য যে, আবূ ছা'লাবা (রা) ও তার গোত্র বানূ খুশান

---

২০. মুসলিম, খ. ১৬, পৃ. ১১১; কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি

২১. সাহীহ আল- বুখারী, কিতাবুয যাবায়িহ ওয়াস সায়দি-বাবু: লা ইউযাক্কি বিস-সিন্নি ওয়াল 'আজমি ওয়াস জাফারি; মুসলিম, খ. ১৩, পৃ. ১২২, কিতাবুল আদাহী-বাবু জাওয়ায আয-যাবহি বিকুল্লি মা আনহারাদ দামা

ছিল শামের অধিবাসী। তার এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

فَأَمَّا ماذكرت من أنك بأرضِ أهلِ الكتاب، فلا تأكلوا فى آنيتهم، إلاَّ أن لاتجدوا بدا، فاغسلُوها وكُلُوا فيها، وأما ماذكرت من أنك بأرض صـيْد، فمـا صِـدتَ بقوسك فذكرت الله فكُلْ. وما صدت بكلبـك المعلِّـم فذكرتَ الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك الذى ليس بمعلَّـم فأدركتَ ذكاته فكُلْ.

আর তুমি যে বললে, আহলি কিতাবের ভূমিতে তোমার বসবাস, সে ক্ষেত্রে তোমরা তাদের পাত্রে পানাহার করবে না। তবে যদি তা ব্যবহারের বিকল্প না পাও তাহলে তাদের সেই পাত্রসমূহ ভালো করে ধূয়ে তাতে পানাহার করবে। আর যে বললে, তুমি শিকার-ভূমিতে থাক, সেক্ষেত্রে তোমার ধনুক দ্বারা যা শিকার করবে, যদি আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তা খাবে। অর্থাৎ তীর-বর্শা ছোড়ার সময় যদি বিসমিল্লাহ বলে ছোড় তাহলে খাবে। আর তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা যা শিকার কর এবং (ছাড়ার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে থাক তাহলে তা খাবে। আর তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা যা শিকার কর (তা খাবে না), তবে যদি সে শিকার জীবিত অবস্থায় পাও এবং যবেহ কর, তাহলে তা খাবে।

আবূ দাঊদের বর্ণনায় বিষয়টি এভাবে এসেছে:

يا رسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخـون فى قدورهم الخنز ير، ويشربون فى انيتهم الخمـر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : إن وجـدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجـدوا غيرهـا، فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলি কিতাবের সাথে বসবাস করি, তারা

তাদের হাঁড়ি-পাতিলে শুকর রান্না করে এবং পানপাত্রে মদপান করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি তোমরা তাদের হাঁড়ি-পাতিল ও পানপাত্র ছাড়া অন্য কিছু পাও তাহলে তাতে খাও ও পান কর। আর যদি তাদের ঐগুলির বিকল্প কোন কিছু না পাও তাহলে সেগুলিই ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে এবং তাতে পানাহার করবে।[২২]

৭. একজন প্রশ্নকারী যতটুকু জানতে চাইবে তার চেয়ে বেশি অবহিত করা

কোন প্রশ্নকারী কোন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় জিজ্ঞাসিত বিষয়ের চেয়ে বেশি জ্ঞান দান করতেন। এটা তিনি করতেন যখন বুঝতেন প্রশ্নকারীর এই অতিরিক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এটা হলো রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার্থী ও অনুধ্যানশীলদের প্রতি দয়া, মহানুভবতা ও উঁচুমানের তত্ত্বাবধান ক্ষমতার প্রমাণ। এখানে দু'টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:[২৩]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سأل رجلٌ - من بنى مُدْلِجٍ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمِلُ معنا القليل من الماء، فإن توضَّأنا به عَطِشْنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطَّهُورُ ماؤُه، وَالْحِلُّ مَيْتَتُه.

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: বানূ মুদলিজের এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্র-যানের আরোহী হই এবং আমাদের সাথে অল্প পরিমাণ পানি বহন করে থাকি। যদি আমরা সেই পানি দিয়ে ওজু করি তাহলে আমাদের তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়, অতএব, আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওজু

---

২২. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫২৩

২৩. ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুত তাহারাতি-বাবুত তাহূর লিল ওদূয়ি. আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২১, কিতাবুত তাহারাতি

করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (জীব-জন্তু) হালাল।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মুদলিজ গোত্রের লোকটির প্রশ্ন- সমুদ্রের পানি দিয়ে ওজুর হুকুম কী-এর জবাব দেন। বলেন, তার পানি পবিত্র এবং তা দ্বারা ওজু করা যাবে। সাগরে যারা বিচরণ করে, যেমন নাবিক, মাঝি-মাল্লা, জেলে- মৎসজীবি ইত্যাদি শ্রেণীর আরো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে একটি হলো খাদ্যের সমস্যা। যদিও এ সমস্যার সমাধানের কথা লোকটি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট জানতে চায় নি, তা সত্ত্বেও তিনি দয়া পরবশ হয়ে লোকটিকে একথাও বলে দেন যে, সমুদ্রের মৃত জীব-জন্তু হালাল। সুতরাং প্রয়োজনে তা খাওয়া এবং কাজেও লাগানো যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই অতিরিক্ত কথার দ্বারা আরেকটি সন্দেহ আগেভাগে দূর করে দেন। সেটা হলো, সমুদ্রের পানি তো পবিত্র, কিন্তু সেই পানিতে যদি কোন সামুদ্রিক জীব জন্তু মারা যায় তাহলে কি সেই পবিত্রতা বিদ্যমান থাকবে? তাই তিনি বলে দেন, সেই পানিতে যা কিছু মারা যাক না কেন, পানির পবিত্রতা নষ্ট হবে না, বরং সেই মৃত জীবগুলোও হালাল, একজন সমুদ্রগামী ব্যক্তির এ সকল বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্নকারী মাত্র একটি বিষয় জানতে চেয়েছে। তাই মহাজ্ঞানী শিক্ষক রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোও বলে দিয়েছেন।

এ বিষয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো:[২৪]

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : رَفَعَتْ امـــرأةٌ صبيَّالها وهى حاجَّةَ – فقالت : يارســول الله ألهـــذا حجٌّ؟ قال : نعم، ولكِ أجْرٌ.

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: হজ্জ আদায়কারীনী এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে উঁচু করে ধরে বলে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ আছে? বললেন, হা, আছে। আর তোমার জন্য আছে প্রতিদান (ছাওয়াব)।

মহিলার প্রশ্ন ছিল, শিশু সন্তানের হজ্জ আছে কিনা? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

২৪. মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ-বাবু সিহহাতি হাজ্জিস সাবিয়্যি ওয়া আজরু মান হাজ্জা বিহি; আবূ দাউদ, কিতাবুল মানাসিক-বাবুন ফিস সাবিয়্যি ইয়াহুজ্জু; নাসাঈ; কিতাবু মানাসিকিল হাজ্জ (আল-হাজ্জু বিস-সাগীর)

সাল্লাম) বললেন: হ্যাঁ, তার হজ্জ আছে, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত একথাও বলে দিলেন যে, যেহেতু তার সাহায্যে শিশুটি হজ্জ আদায় করছে, তাই তিনিও এর প্রতিদান পাবেন। কথাটি এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন ছিল, তা না হলে শিশুটির মা তার প্রতিদানের কথা জানতে পারতেন না।

৮. কেউ কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জবাব দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে তার প্রসঙ্গ থেকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যেতেন। তিনি তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, এই প্রশ্নের জবাব বোধগম্য হওয়ার যোগ্যতা প্রশ্নকারীর নেই। তাই তাকে অন্য প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে যেতেন। যেমন:[২৫]

عن أنس رضى الله عنه " أنَّ رجلاً قال لرسـول الله صلى الله عليه وسلم : متى السَّاعةُ يارسول الله؟ قال : ما أعددت لها؟ قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولاصوم ولإصدقة، ولكنى أحبُّ الله ورسوله، قـال : أنت مع من أحببت.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামাত কখন হবে? তিনি বললেন: তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? সে বললো: আমি তার জন্য না বেশি সালাত আদায় করেছি, না বেশি সাওম পালন করেছি, আর না বেশি সাদাকা করেছি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যাকে তুমি ভালোবাস তার সাথেই তুমি থাকবে।

প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ছিল, কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে। যেহেতু যে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, তাই তিনি প্রশ্নকারীকে অন্য প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে গেলেন। যা জানা তার খুবই প্রয়োজন ও অত্যন্ত কল্যাণকর। আর তা হলো কিয়ামতের জন্য ভালো

---

২৫. আল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব-বাবু মানকিবি 'উমার ইবন আল-খাত্তাব; কিতাবুল আদাব-বাবু 'আলামাতিল হুববি ফিল্লাহি; কিতাবুল আহকাম-বাবুল কাদা' ওয়াল ফাতইয়া ফিত তারীক: মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি-বাবুল মারয়ি মা'আ মান আহাব্বা

কাজের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া। তাই তিনি বললেন: তুমি সেই কিয়ামাতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? সে বললো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যাকে তুমি ভালোবাস তুমি কিয়ামাতে তার সঙ্গেই থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এই জ্ঞান দান করেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষকে তার পার্থিব জীবনের সঙ্গী-সাথী ও ভালোবাসার লোকদের সাথে উঠানো হবে। একথার মধ্যে দুনিয়াতে অসৎ লোকদের সাথে উঠা-বসা করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ দুনিয়াতে যাদের সাথে উঠা-বসা করবে আখিরাতে তাদের অবস্থান যেখানে হবে তাকেও সেখানে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে।

প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্ন থেকে সরিয়ে যা তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি উপকারী সেই জ্ঞান দান করা- এ পদ্ধতিকে أسلوب الحكيم -তথা মহাজ্ঞানীদের পদ্ধতি বলা হয়। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো:[২৬]

عن ابن عمر رضى الله عنه "أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، مايَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبَسُ القميْصَ، ولا الْعمَامَةَ، ولا السراويل، ولا البُرْنُسَ، ولاثوبًا مَسَّه اَلْوَرْسُ أو الزعفرانُ، فإن لم يجد النعلين، فَلْيَلْبَسْ الخفينْ، ولْيقْطعْهُمَا حتى يكوناتحت الكعبين.

আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কী পরবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে জামা পরবে না, তেমনিভাবে পাগড়ি, পাজামা, মাথা-ওয়ালা ঢিলা কোট এবং জাফরান অথবা লাল-সবুজ রং (وَرْسٌ) স্পর্শ করেছে এমন কাপড়ও পরবে না। আর যদি জুতো না পায় তাহলে মোজা পরবে এবং তা কেটে ফেলবে যাতে তা পায়ের গোড়ালীর গিরার নিচে থাকে।

২৬. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম-বাবু মান আজাবা আস-সায়িলা বিআকছারা মিম্মা সাআলা।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করা হলো, মুহরিম ব্যক্তি কী পোশাক পরবে? তিনি জবাবে কী পোশাক পরবে না তাই বললেন। মুহরিম কী পোশাক পরবে না, তা সীমিত, পক্ষান্তরে কী পরবে তা সীমিত নয়। সুতরাং তিনি যার সংখ্যা সীমিত নয় তা থেকে সরে আসেন যা সীমিত সে দিকে। জবাব সংক্ষেপ করার জন্য। তিনি যদি কী কী পোশাক পরতে পারবে তা গুণতে শুরু করতেন তা হলে সে তালিকা অনেক দীর্ঘ হতো এবং প্রশ্নকারী তা ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্নে যা জানতে চাওয়া হয়েছিল তার থেকেও অতিরিক্ত বিষয়ও বলে দেন। যেমন জুতো না থাকলে মোজা পরবে। তিনি জরুরী অবস্থায় করণীয় কি তা বলে দেন। এটা অবশ্য প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত।

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো:[২৭]

عن أبى موس الأشعرى رضى الله عنه : "أَنَّ رجـــلاً أعرابيًا أتى النبى صلى الله عليه وسلم، فقـــال : يـــا رسول الله : الرجل يُقَاتِل للْمَغْـــنَم، والرجـــل يقاتـــل ليُذكر، والرجل يُقاتِلُ لِيُرَى مكانه، فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله أعلى، فهو فى سبيل الله.

আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি গণীমতের জন্য যুদ্ধ করে, আরেক ব্যক্তি যুদ্ধ করে মানুষের মধ্যে তার আলোচনা হবে সেজন্য, আরেক ব্যক্তি যুদ্ধ করে মানুষকে এটা দেখানোর জন্য যে, সে একজন সাহসী বীর। তাহলে আল্লাহর পথের যোদ্ধা কে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহর কালিমা উঁচু হোক এজন্য যে যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহর পথের যোদ্ধা।

এই হাদীছেও দেখা যাচ্ছে প্রশ্নকারী যে বিষয়টি জানার জন্য প্রশ্ন করছেন, রাসূলুল্লাহ্

---

২৭. প্রাগুক্ত, কিতাবুল ‘ইলম-বাবু মান সাআলা ওয়া হুয়া কায়িমুন, ‘আলিমান জালিসান; কিতাবুল জিহাদ-বাবু মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল ‘উলইয়া; বাবু মান কা-তালা লিল মাগনাম; সাহীহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরাসরি তার উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, প্রশ্নকারীর জবাব "হ্যাঁ" অথবা "না" দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার জবাব এড়িয়ে গিয়ে যোদ্ধার অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তাকে একথা বুঝিয়েছেন যে, নিয়্যাতের একনিষ্ঠতা এক্ষেত্রে মূল বিষয়।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই জবাব-

مَنْ قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله.

আল্লাহর কালিমা উঁচু হোক এজন্য যে যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহর পথের যোদ্ধা।

একটি অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক কথা। শৈল্পিক সৌন্দর্যেও তা পরিপূর্ণ। তিনি যদি জবাবে বলতেন, তুমি যা উল্লেখ করেছো, তার কোনটিই আল্লাহর পথে নয়, তখন এ সম্ভাবনা থাকতো যে, এর বাইরে যে জন্যই করুক না কেন তা আল্লাহর পথে হবে। আসলে কিন্তু তা নয়। তাই তিনি একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে অতি সংক্ষেপে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নের জবাব দেন। আর এতে সন্দেহ-সংশয় ও অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।

৯. বিষয়টি পূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্য প্রশ্নকারীর মুখ দ্বারা প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করাতেন

প্রশ্নকারী হয়তো কোন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জবাব দিয়েছেন। কিন্তু জবাবে সবকথা স্পষ্ট হয় নি। তাই তিনি প্রশ্নকারীর মুখ থেকে আবার প্রশ্নটি শুনতেন এবং পূর্বের জবাবের সাথে বিষয় সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জ্ঞানও দান করতেন। যেমন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একদিন তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা সর্বোত্তম 'আমল।

এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো:

يا رسول الله، أرأيت إن قُتِلتُ فى سبيل الله تُكَفَّرُ عنّى خطاياىَ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إنْ قُتِلْتَ فى سبيل الله وأنتَ صابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অগ্রগামী থেকে এবং পশ্চাৎগামী না হয়ে আল্লাহর পথে নিহত হও।

অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি নিহত হও তাহলে ক্ষমা করা হবে। তার পশ্চাতে তোমার কোন অন্ধ জাতি বিদ্বেষ, গণীমত লাভের ইচ্ছা এবং নাম ও খ্যাতির উদ্দেশ্য থাকবে না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: كيف قلت؟ 'তুমি কী বলছিলে? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো: যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে কি আমার সকল পাপ ক্ষমা করা হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:[২৮]

نعم، وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيرُ مُدبرٍ الاّ الـدَّيْنَ فإنَّ جبريل قال لى ذلك.

হ্যাঁ, তবে তুমি যদি ধৈর্যশীল থাক, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ কর, অগ্রগামী থাক এবং পশ্চাৎমুখী না হও। তবে ঋণ ক্ষমা করা হবে না- জিবরীল এই মাত্র আমাকে একথা বলেছেন।

অর্থাৎ ঋণ বা এ জাতীয় বান্দার হক যা আছে তা ক্ষমা করা হবে না।

১০. কেউ কোন প্রশ্ন করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় অন্য কোন সাহাবীকে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব দিতেন

অনেক সময় এমন হতো যে, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় জানার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলো, কিন্তু তিনি নিজে জবাব না দিয়ে উপস্থিত কোন একজন সাহাবীকে তার জবাব দানের দায়িত্ব দিলেন। এর উদ্দেশ্য হলো, জবাব কিভাবে দিতে হয় সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখানে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان أبو هريـــرة

---

২৮. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ-বাবু মান কুতিলা ফী সাবীলিল্লাহ; নাসাঈ; কিতাবুল জিহাদ-মান কা-তালা ফী সাবীলিল্লাহ ওয়া 'আলাইহি দায়নুন

يحدث أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم منصرفه من أحد فقال إنى رأيت اللّيلة فى المنام ظلة ينطف منها السمن والعســـل، ورأيـــت النـــاس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، ورأيـــت سببا واصلا من السماء إلـــى الأرض، ورأيتـــك يـــا رسول الله، أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل أخر من بعدك فعلا به، ثم أخذ به رجل أخر بعده فعلا به، ثم أخذ به رجل أخر بعده فانقطع به، ثم وصـــل لـــه فعلا به.

আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: আবূ হুরাইরা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ থেকে ফেরার সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলে: আমি গত রাতে স্বপ্নে একটি তাঁবু দেখলাম, যা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘি ও মধু পড়ছে। আর দেখলাম, মানুষ তা হাত পেতে ধরছে। কেউ বেশি ধরছে কেউ কম। আর দেখলাম, আকাশ থেকে একটি রশি পৃথিবীতে এসে পড়েছে। আর আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকে দেখলাম, আপনি সেটি ধরে উপরে উঠে গেছেন। আপনার পরে আরেক ব্যক্তি সেটি ধরলো এবং উপরে উঠে গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরলো এবং উপরে উঠে গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরলো এবং সেটি ছিঁড়ে গেল। তারপর আবার সংযুক্ত হলো এবং উপরে উঠে গেল।

আবূ বাকর (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোন। আল্লাহর কসম, আপনি আমাকে এই স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) করার সুযোগ দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি এর তা'বীর কর। আবূ বাকর বললেন: তাঁবু হলো ইসলামরূপী তাঁবু, আর তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ও ঘি পড়ছে, তাহলো আল-কুরআন, তার মাধুর্য ও কোমলতা। আর মানুষ যে তার থেকে হাত পেতে নিচ্ছে তা হলো, আল-কুরআন থেকে কেউ বেশি গ্রহণ করছে, আর কেউ কম। আর যে রশি আকাশ থেকে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, তাহলো সেই সত্য যার

উপর আপনার অবস্থান, আপনি তা ধরে থাকবেন, আল্লাহ আপনাকে উপরে উঠাবেন। আপনার পরে আরেকজন সেটা ধরবে এবং উপরে উঠবে। তারপর আরেক ব্যক্তি সেটা ধরবে এবং উপরে উঠবে। তারপর আরেক ব্যক্তি ধরবে, এবং তা ছিঁড়ে যাবে। তারপর আবার সংযুক্ত করা হবে এবং উপরে উঠবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোন! আমি ঠিক বলেছি না ভুল বলেছি? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

أصبتَ بعضاً و أخطأتَ بعضاً.

কিছু ঠিক বলেছো, কিছু ভুল করেছো।[২৯]

অনেক সময় অনেকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসতো ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য। তিনি বিচার-ফায়সালা শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের জন্য কোন সাহাবীকে তাঁর উপস্থিতিতে সেই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দিতেন। যেমন:[৩০]

عن عبد الله بن عمربن العاص رضى الله عنهما قال : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرين العاص: اقض بينهما، قال : وأنت هاهنا يارسول الله؟ قال : نعم، قال : على ما أقضى؟ قال إن اجتهدت فأصبت فلكَ عَشَرَةُ أجورٍ، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد.

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) বলেন: দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমর ইবন আল-'আসকে (রা) বললেন: তুমি এই দুইজনের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। 'আমর বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখানে উপস্থিত

---

২৯. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তা'বীর-বাবু রু'ইয়াল লায়ল; বাবু মান লাম ইয়ারা আর-রু'ইয়া; মুসলিম, কিতাবুর রু'ইয়া-বাবুন ফী তা'বীলির রু'ইয়া; আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ-বাবুন ফী আল-খুলাফা'

৩০. মুসনাদু আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৮৫; সুনান আদ-দারু কুতনী, খ. ৪, পৃ. ২০৩; ফাতহুল বারী, খ. ১৩, পৃ. ২১৯

থাকতে? বললেন: হ্যাঁ। 'আমর বললেন: কিসের ভিত্তিতে আমি ফায়সালা করবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যদি তুমি ইজতিহাদ কর এবং তা সঠিক হয় তাহলে তোমার জন্য রয়েছে দশটি প্রতিদান (ছাওয়াব), আর যদি ভুল কর, তাহলে তোমার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্যকে বলছেন জবাব দানের জন্য। তেমনিভাবে নিজে ফায়সালা না করে অন্যকে বলছেন ফায়সালা করার জন্য। শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দানই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাহাবীদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দানের আরেকটি দৃষ্টান্ত এরূপ:[৩১]

عن جارية بن ظَفَر الحَنَفِي اليَمَامِي رضى الله عنه، قال : إنَّ دارًا كانت بين أخوين، فحظرا فى وسطها حِظارًا، ثم هَلَكا وترك كلُّ واحد منهما عَقِبًا، فادَّعى كلُّ واحد منهما أن الخطَار له من دون صاحبه، فاختِصِم عقباهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فأرْسَلَ حذيفة بن اليمان، فقضى بينهما، فقضى بالخطار لمن وجَدَ معا قد القُمْط تليه، ثمَّ رَجَع فأخْبَرَ النَبى صلى الله عليه وسلم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أصبت وأحسنتَ.

জারিয়া ইবন জাফার আল-হানাফী আল-ইয়ামামী (রা) বলেন: দুই ভাইয়ের মালিকানায় একটি বাড়ি ছিল। তারা তার মাঝখানে একটি বেড়া দেয়। তারপর তাদের প্রত্যেকে একজন করে বংশধর রেখে মারা যায়। তারপর তাদের প্রত্যেকে দাবি করতে থাকে যে, বেড়াটির মালিক সে। এই দুই অধস্তন বংশধর রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

৩১. ইবনু মাজা, খ. ২, পৃ. ৭৮৫, কিতাবুল আহকাম; দারুকুতনী, খ. ৪, পৃ. ২২৯, কিতাবুল আকদিয়্যাতি ওয়াল আহকাম

নিকট বিচার চাইলো। তিনি হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামানকে (রা) পাঠালেন। তিনি তাদের দুইজনের বিবাদ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি বেড়ার খুঁটিতে যার দিকে রশির গিঁট দেখতে পেলেন বেড়াটি তারই বলে সিদ্ধান্ত দিলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে নবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথা শুনে মন্তব্য করেন: ঠিক করেছো এবং ভালো করেছো।

১১. সামনে যা ঘটতো তা চুপ থেকে বা অনুমোদন দিয়ে শিক্ষাদান

এটা সুন্নাহর একটি অন্যতম শ্রেণী। উছূল ও হাদীছবিদগণ এ জাতীয় সুন্নাহকে তাকরীরী সুন্নাহ বা হাদীছ বলেছেন। তার ধরণ বা প্রকৃতি এ রকম যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে কোন মুসলিম কোন কথা বা কাজ করতো, কিন্তু তিনি একেবারে চুপ থাকতেন, অথবা সেই কথা বা কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। মূলত: এই চুপ থাকা অথবা সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে সেই কথা বা কাজটির বৈধতা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু বিষয়ের জ্ঞান এ পদ্ধতিতে অর্জিত হয়েছে। এখানে মাত্র দু'টি ঘটনা বা দু'টি হাদীছ উপস্থাপন করবো।

عن أبى جُحَيْفَةَ وَهْب بن عبد الله رضى الله عنه، قال : اخَى النبىُّ صلى الله عليه وسلم بين سَلْمَان وأبــى الدَّرْداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أمَّ الــدرداء مُتبذلةً، فقال لها : ماشأنُكِ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لـــه طعامًا، فقال لسلمان كُلْ فإنى صائم، قال : ما أنا باكلٍ حتى تأكل، فأكل، فلمَّا كان الليل ذهب أبـــو الـــدرداء يقوم، فقال : نَم ، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال : نَمْ، فلمَّا كان اخرُ الليل قال سلمان : قُمْ الان، قال : فصـــلَّيْنَا،

فقال له سلمان : إن لربِّكَ عليك حَقًّا، ولنفسك عليك حَقًّا، ولأهلكَ عليك حَقًّا، فأعطِ كلَّ ذى حقٍّ حَقَّه، فأتى أبو الدرداء – النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَر ذلك له، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : صَدَقَ سلمان.

আবূ জুহায়ফা ওয়াহাব ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালমান আল-ফারিসী ও আবুদ দারদা'র মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। সালমান সাক্ষাৎ করতে গেলেন আবুদ দারদার সঙ্গে। তিনি উম্মুদ দারদা (আবু দারদা'র স্ত্রী) কে ময়লা-পুরাতন পোশাক পরা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কী ব্যাপার, আপনার এ অবস্থা কেন? উম্মুদ দারদা বললেন: আপনার ভাই আবু দারদা'র দুনিয়াতে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আবুদ দারদা' ঘরে ফিরে খাবার তৈরি করে সালমানকে বললেন: তুমি খাও, আমি সাওম পালন করছি। সালমান বললেন: তুমি না খেলে আমি খাব না। আবু দারদা' খেলেন। রাত হলো আবুদ দারদা' নামাযে দাঁড়াতে গেলেন। সালমান তাকে বললেন: ঘুমাও। তিনি ঘুমালেন এবং কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার নামাযে দাঁড়াতে গেলেন। সালমান বললেন: ঘুমাও। এভাবে যখন শেষ রাত হলো, সালমান বললেন: এখন ওঠো। তারপর দু'জন নামায আদায় করলেন। অতঃপর সালমান তাকে বললেন: তোমার উপর তোমার রব বা প্রতিপালকের অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার 'নফস' বা আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার উপর অধিকার আছে তোমার পরিবারের। অতএব, প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর।

এরপর আবুদ দারদা' (রা) নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসলেন এবং সালমানের কথা তাঁকে জানালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সালমান সত্য বলেছে।[৩২]

---

৩২. আল বুখারী, কিতাবুস সাওম-বাবু মান আকসামা 'আলা আখীহ লিউফতিরা ফিত তাতাও'উয়ি ওয়া লাম ইয়ারা 'আলাইহি কাদাআন: কিতাবুল আদাব-বাবু সুনইত তা'আমা ওয়াত তাকাল্লুফা লিদ-

অনুমোদন বা সত্যায়নের আরেকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:[৩৩]

عن عمرو بن العاص قال : احتلمتُ فى ليلةٍ بـــاردة فى غزوةِ ذات السلاسل، فاشــفقتُ إن اغتســلتُ أن أهلِكَ، فتيمَّمْتُ ثم صلَّيْتُ بأصحابى الصبح، فــذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقــال : يــاعمْرو، صلَّيْتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟ فأخبرتُه بالذى منعنــى من الإغتسال، وقلتُ : إنى ســمعت الله يقــول : ولا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا." فضحك رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَقُلْ شَيْئًا.

'আমর ইবন আল 'আস (রা) বলেন: জাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় এক প্রচন্ড ঠান্ডার রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমি আশংকা করলাম, যদি গোসল করি তাহলে মারা যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে আমার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারা ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালো। তিনি বললেন: 'আমর, তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছো? আমি গোসল করা থেকে কেন বিরত থেকেছি সে কথা তাঁকে জানালাম। আরো বললাম: আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি: 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দারুণ দয়ালু।' (আমার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দেন এবং কিছুই বললেন না।

উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত ঘটনাটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) صَدَقَ سَلْمَانُ "সালমান সত্য বলেছে" বলে সালমানের কথা ও কাজকে সত্যায়ন করেছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনাটিতে তিনি মৌনতা অবলম্বন করে ও হেসে দিয়ে 'আমরের (রা) কাজকে অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ তাদের দু'জনের কথা ও কাজই সঠিক।

দাইফ।

৩৩. আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৪১, কিতাবুত তায়াম্মুম- বাবুন ইযা খাফাল জুনুবু আল-বারদা

১২. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার সদ্ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো কোন বিষয় শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তখন হয়তো আকস্মিকভাবে একটি বিষয় বা ঘটনার অবতারণা হলো যার সাথে ঐ শিক্ষনীয় বিষয়টির মিল আছে। তিনি সাথে সাথে এই দু'টির মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে ফেলতেন এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেটির সদ্ব্যবহার করতেন। তাতে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি অধিকতর বোধগম্য ও স্পষ্ট হতো। স্বাভাবিক কথা বা বক্তৃতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে এ পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞান অধিকতর শক্ত ও দৃঢ় হয়। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো:[৩৪]

عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه. فمر بجدي ميت أسك . فتناوله فأخذ بأذنه. ثم قال "أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟" فقالوا: ما نحب أنه لنا بشئ. وما نصنع به؟ قال "أتحبون أنه لكم؟" قالوا: والله! لو كان حيا، كان عيبا فيه، لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال "فوالله! للدنيا أهون على الله، من هذا عليكم".

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি বাজারের পাশ দিয়ে মাদীনার উপকণ্ঠের একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর দু'পাশে তখন অনেক মানুষ। তিনি ছোট্ট দু'কান বিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কান ধরে তুলে নেন। তারপর বলেন: তোমাদের মধ্যে কে এটি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে চাইবে? লোকেরা বললো: কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা এটি নিতে চাইনা। আর আমরা ওটা দিয়ে কী করবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই তোমরা কি ওটা নিতে চাইবে? তারা বললো: আল্লাহর কসম! যদি ওটা জীবিতও থাকতো তাহলেও ওটা ত্রুটি পূর্ণ। কারণ, ওটার দু'কান খুব ছোট। আর

---

৩৪. মুসলিম, কিতাবুয যুহদ

এখন তো ওটা মৃত, সুতরাং কে নিতে চাইবে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট অবশ্যই এই দুনিয়া তোমাদের নিকট থাকার ব্যাপারটি এই ছাগলছানার চেয়েও অধিকতর কম গুরুত্বপূর্ণ।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سبىٌ فإذا امرأةٌ من السَّبْى تَحَلَّبَ ثَدْياها تسعى، إذ وجدت صبيًّا – لها – فى السَّبْى، أخذته فألتصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم : أترون هذه طارِحةً وَلَدَها فى النار؟ قلنا : لا، وهى تَقْدِرُ على أن لا تطرحه، فقال : اللهُ أرحَمُ بعباده من هذه بولدها.

'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) বলেন: নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী আসলো। সেই বন্দীদের মধ্যে এক মহিলা ছিল যার দুই স্তন থেকে দুধ বেয়ে পড়ছিল, আর সে দ্রুতগতিতে তার দুধপানকারী শিশুকে খুঁজছিল। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সে তার শিশুকে পেয়ে গেল। সে তাকে নিজের পেটের সাথে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করাতে লাগলো। (এ অবস্থা দেখে) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন: তোমরা কি মনে কর, এই মহিলা তার ছেলেটিকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম: না, তাকে রক্ষার ক্ষমতা থাকতে সে ফেলবে না। তিনি বললেন, এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতখানি মমতাময়ী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে বেশি দয়াশীল।[৩৫]

এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি আকস্মিক ঘটনাকে অনুরূপ আরেকটি বিষয়ের সাথে যুক্ত করে শিক্ষা দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের দয়া-মমতাকে দেখিয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া-মমতাকে বুঝাতে চেয়েছেন এবং বলেছেন এই মায়ের স্নেহ-মমতার চেয়েও আল্লাহর দয়া-মমতা অনেক বেশি। আল্লাহর দয়া-

৩৫. আল বুখারী, কিতাবুল আদাব-বাবু রাহমাতিল ওয়ালাদি-ওয়া কুবলাতাহু ও মু'আনাকাতুহু; মুসলিম, কিতাবুত তাওবা-বাবু সি'আতি রাহমাতিল্লাহ ওয়া আন্নাহা তাগলিবু গাদাবাহু

মমতাকে তিনি বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি যেন- وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

এরূপ শিক্ষাদান পদ্ধতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এরকম:[৩৬]

عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه، قال : كنا جلوسًا ليلة – مع النبى صلى الله عليه وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم سترون ربكم يوم القيامة، كما ترون هذا القمر، لاتضامُون في رؤيته.

জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন: আমরা এক রাতে নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। তারপর তিনি বললেন: তোমরা কিয়ামাতের দিন তোমাদের রব (প্রতিপালক) কে দেখবে যেমন আজ এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে ভীড়ের মুখোমুখি হবে না।

অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখতে যেমন অসংখ্য মানুষ সমবেত হয় এবং চন্দ্রের উদয় স্থল একই দিকে ও একই স্থানে হওয়ার কারণে যেমন ভীড়ের মুখোমুখি হতে হয়, কিয়ামাতের দিন রব-কে দেখতে তেমন হবে না। কারণ যে কোন দিকে তাকালেই তাঁকে দেখা যাবে।

এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে দেখার একটা সুযোগকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে দেখার বিষয়টি বাস্তবে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

১৩. কৌতুক ও রসিকতার মাধ্যমে শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে-মধ্যে সঙ্গী-সহচরদের সাথে কৌতুক-রসিকতাও করতেন। তবে এই হাস্য-কৌতুকের মধ্যে সত্য ছাড়া আজে-বাজে কথা উচ্চারণ করতেন না।

---

৩৬. আল বুখারী, কিতাবু মাওয়াকীতিস সালাতি-বাবু ফাদলি সালাতিল আসরি; কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরু সূরাতি ق, কিতাবুত তাওহীদ

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله، إنَّك تدا عبنا؟ قال : إنى لا أقول إلاَّ حقا.

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, লোকেরা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের সাথে কৌতুক রসিকতা করেন? তিনি বললেন: আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।[৩৭]

তিনি এই কৌতুক-রসিকতার ভেতর দিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে অনেক কিছু শেখাতেন। এখানে এ জাতীয় দু'টি ঘটনা উল্লেখ করবো।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدخُلُ علينا ولى أَخٌ صغيرٌ يكَنَّى أبا عُمَيْرٍ - وكان له نُغَرٌ يَلْعَبُ به، فمات، فدخل عليه النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأه حزيناً فقال : ماشأنه؟ قالوا : مات نُغَرُه، فقال : أبا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُّغَيْرُ " .

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বাড়িতে আসতেন। আবু 'উমাইর নামে আমার একজন ছোট ভাই ছিল। তার ছিল একটি 'নুগার' বা বাচ্চা চড়ুই পাখি, যা নিয়ে সে খেলতো। পাখিটি মারা গেল। এরপর একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বাড়িতে আসলেন এবং তাকে খুব বিষণ্ন দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: তার এ অবস্থা কেন? লোকেরা বললো: তার 'নুগার' পাখিটি মারা গেছে। তিনি বললেন: ইয়া আবা 'উমাইর, মা ফা'আলান নুগাইর। (ও হে আবূ 'উমাইর? তোমার নুগাইরটি কী করলো।)[৩৮]

নুগাইর অর্থ ছোট্ট বাচ্চা চড়ুই। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার মধ্যে একটি ছন্দ আছে।

---

৩৭. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ২৪১, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি-বাবু মা জাআ ফিল মাযাহ

৩৮. আল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫২৬, কিতাবুল আদাব-বাবুল ইম্বিসাত ইলান নাস; মুসলিম, কিতাবুল আদাব-বাবু জাওয়াযি তাকনিয়াতি মান লাম ইউলাদ লাহু ওয়া তাকনিযাতিস সাগীর

عن أنس رضى الله عنه قال إن رجلاً استحْمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى حامُلُك على وَلَدِ الناقة، فقال الرجل : يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تَلِدُ الإبل النُّوق.

আনাস (রা) বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট বাহন চাইলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: আমি তোমাকে উষ্ট্রী-শাবকের উপর চড়াবো। লোকটি বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উষ্ট্রী-শাবক দিয়ে কী করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: উটকে উষ্ট্রীই জন্ম দেয়।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই সূক্ষ্ম কৌতুকের মাধ্যমে তাকে এই সত্যটি শিক্ষা দেন যে, ভারবাহী বড় উটও কোন না কোন উষ্ট্রীর শাবক।

১৪. কসম বা শপথের মাধ্যমে জোর দিয়ে শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কথার সূচনা করতেন আল্লাহর নামে কসম বা শপথের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হতো তিনি যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছেন তার গুরুত্ব বুঝানো এবং শ্রোতাকে তার প্রতি মনোযোগী করা। এখানে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

---

৩৯. আবূ দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৩০০, কিতাবুল আদাব-বাবু মা জাআ ফিল মাযাহ; তিরমিযী, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি-বাবু মা জাআ ফিল মাযাহ; শাময়িল্যুত তিরমিযী

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ ঈমান না আনবে, আর তোমরা যতক্ষণ পরস্পরকে ভালো বাসবে না ততক্ষণ ঈমান আনবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলে দেব না, যেটি পালন করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[৪০]

عَنْ أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لايؤمن عبد حتى يحب لجار – أو قال – لأخيه مايحبُّ لننفسه.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! কোন বান্দা ঈমান আনবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশীর জন্য অথবা বলেন, তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[৪১]

عن أبى شريح الخُزاعى رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والله لايومن! والله لايؤمن! الله لايؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال : الذى لا يأمْن جَارُه بَوائقه.

আবূ শুরাইহ আল-খুযাঈ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহর কসম! সে ঈমান আনবে না! আল্লাহর কসম! সে ঈমান আনবে না! আল্লাহর কসম! সে ঈমান আনবে না! বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কে? বললেন: যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[৪২]

---

৪০. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৫, কিতাবুল ঈমান-বাবু বায়ানি আন্নাহু লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ইল্লাল মু'মিনূন ওয়া আন্না মুহাব্বাতাল মু'মিনীন মিনাল ঈমান

৪১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান-বাবুদ দালীল আলা আন্না মিন খিসালিল ঈমানি আন ইউহিব্বা লিআখীহি আল-মুসলিম মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি মিনাল খায়র

৪২. আল বুখারী, কিতাবুল আদাব- বাবু ইছমি মান লা ইয়া-মানু জারুহু বাওয়ায়িকাহু

উল্লেখিত হাদীছগুলোতে আমরা লক্ষ্য করেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কসম করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে একাধিকবার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষণীয় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানো এবং সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সতর্ক করা যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে। এখানে সালাম দেওয়া এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়ার সীমাহীন গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

১৫. বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দেওয়ার জন্য একাধিক বার কথার পুনরাবৃত্তি করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানো ও শ্রোতাকে সতর্ক করার জন্য একাধিকবার স্বীয় বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে শ্রোতা মনোযোগ সহকারে শোনে ও আত্মস্থ করে। ইমাম আল-বুখারী (রহ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এই ভাব ও অর্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন:

بابُ مَنْ أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم منه.

পরিচ্ছেদ: যিনি কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন, যাতে তা বুঝা যায়

এই পরিচ্ছেদে তিনি নিম্নের দু'টি হাদীছ সংকলন করেছেন:

عن أنس رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه،

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন কোন কথা বলতেন তখন সেটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা বুঝা যায়।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر سافرناه، فأدركنا وقد أَرْهَقَتْنَا الصلاةُ صلاةُ العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نَمسَحُ على أرجُلنَا، فنادى بأعلى صوته "ويلٌ لِلأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثا.

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি সফরে- যে সফরে আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম, পেছনে পড়ে যান। তিনি আমাদেরকে ধরলেন এমন সময় যখন সালাতুল আসরের ওয়াক্ত যায় যায় অবস্থা। আমরা ওজু করতে গিয়ে পায়ের ওপর মসেহ করতে লাগলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন: ধ্বংস সেই পায়ের গোড়ালিসমূহের অধিকারীদের যারা তা ধোয়ার ব্যাপারে অবহেলা করছে। দুই অথবা তিন বার কথাটি বলেন।[৪৩]

ইবন হাজার (রহ) বলেন, এই হাদীছে বেশ কয়েকটি বিষয় বিধৃত হয়েছে। যেমন: অজ্ঞ ব্যক্তিকে শেখাতে হবে, উচ্চ কণ্ঠে অস্বীকৃতি জানানো যাবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়টি বুঝানোর জন্য পুনরাবৃত্তি করা যাবে।[৪৪]

ইমাম আহমাদ (রহ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে একটি দীর্ঘ হাদীছ সংকলন করেছেন। আমদের বক্তব্যের সাথে যার মিল আছে। হাদীছটির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো:

মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহিনী নিয়ে তাবূক যুদ্ধের জন্য বের হলেন। যখন প্রভাত হলো, তিনি লোকদের নিয়ে সকালের নামায আদায় করলেন। তারপর লোকেরা বাহনের পিঠে আরোহী হলো। যখন সূর্যোদয় হলো, প্রথম রাতে ভ্রমণের কারণে লোকেরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। কিন্তু মু'আয রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করে পিছে পিছে চলতে থাকেন।

একসময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখাবরণ খুলে ফেলেন এবং মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন মু'আযের চেয়ে অধিকতর নিকটে আর কোন সৈনিক নেই। তিনি "ইয়া মু'আয" বলে তাকে ডাক দিলেন। মু'আযও (রা) হে আল্লাহর নবী, আমি হাজির বলে সাড়া দিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি আমার কাছাকাছি এসো। মু'আয (রা)-এগিয়ে গেলেন এবং এত কাছে গেলেন যে দু'জনের বাহন গায়ে গায়ে মিশে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি কিন্তু ধারণা করতে পারিনি যে, লোকেরা আমাদের থেকে এত দূরে রয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন: হে আল্লাহর নবী! লোকেরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আর তাদের বাহনগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে

---

৪৩. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীছ নং ৯৪, বাবু মান আ'আদাল হাদীছা লিইউফহামা মিনহু
৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৬

চরে বেড়াচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমিও তন্দ্রালু হয়ে পড়ছিলাম।

মু'আয (রা) যখন দেখলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতি মনোযোগী আছেন এবং নিরিবিলিতেও আছেন, তাই তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনি একটি কথা জিজ্ঞেস করার অনুমতি দিন যা আমাকে অসুস্থ, পীড়িত ও বিষণ্ন করে তুলেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। মু'আয (রা) বললেন:

يا نبى الله، حدِّثنى بعملٍ يُدخِلُنى الجنَّةَ لا أسئلك عن شيئٍ غيرها.

হে আল্লাহর নবী, আমাকে আপনি এমন একটি আমলের (কর্ম) কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এ ছাড়া আর কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করবো না।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নের কথাগুলো তিনবার করে বললেন। তাছাড়া আর কিছুই বললেন না:

بَخ بَخْ بَخْ، لقد سألت عن عظيم، لقد سألتَ عن عظيم، لقد سألتَ عن عظيم، وإنه ليسيرٌ على من أراد الله به الخير، وإنه ليسيرٌ على من أراد الله به الخير، وإنه ليسيرٌ على من أراد الله به الخير.

চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার! তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো। তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। তুমি একটি বিরাট ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তা তার জন্য খুবই সহজ। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তা তার জন্য খুবই সহজ। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তা তার জন্য খুবই সহজ।

এভাবে বার বার কথাটি উচ্চারণ করে মু'আযের (রা) সামনে বিষয়টির অত্যধিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরা ও মু'আযের মনোযোগ আকর্ষণের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تُومِنُ بالله واليوم الأخر وتُقيم الصلاة، وتعبد الله وحده لاتشركَ به شيئًا حتى تموت وأنت على ذلك.

তুমি আল্লাহর উপর ও শেষ বিচার দিনের উপর ঈমান রাখবে, সালাত কায়েম করবে, এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করবে না। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে।

মু'আয (রা) বললেন: হে আল্লাহর নবী! কথাগুলো আমাকে আবার বলুন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করেন।

তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হে মু'আয, তুমি যদি শুনতে চাও তাহলে আমি তোমাকে বলবো এই দীনের মাথা, এই দীন বা আমলের ভিত্তি ও এই দীনের চূড়ার কথা। মু'আয (রা) বললেন: হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন! হ্যাঁ, আপনি আমাকে বলুন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إنَّ رأس هذا الأمر أن تَشْهَد أن لا إله ألاَّ الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.

وإن قوام هذا الأمر إقامُ الصلاة وإيتاء الزكـــاة، وإن ذُرْوَةَ السنام منه الجهادُ فى سبيل الله، إنما أمـــرت أن أقاتل الناسَ حتى يقيموا الصـــلاة، ويؤتـــوا الزكـــاة، ويشهدوا أن لا إله إلاَّ الله وحده لاشـــريك لـــه، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصـــمُوا، وعَصَموا دماءهم وأموالهُم إلاَّ بحقَّها، وحسابُهم على الله عزوجل.

এই দীন বা আমলের মাথা হলো, একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর এই দীন

বা আমলের ভিত্তি হলো সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা, আর এর শীর্ষ চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আর একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। যখন তারা এ কাজগুলো করবে, দৃঢ় ও শক্ত হবে এবং দীনের অধিকার ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবে। আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব মহামহিম আল্লাহর উপর।[৪৫]

১৬. বসার ভঙ্গি ও অবস্থার পরিবর্তন করে ও কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বক্তব্যের গুরুত্ব শ্রোতাকে জানিয়ে দেওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে বসার ভঙ্গি ও অবস্থা পরিবর্তন এবং কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। এর দ্বারা তিনি শ্রোতাকে তাঁর নিজের কথার গুরুত্ব কতখানি তা জানিয়ে দিতেন এবং তাকে মনোযোগী করে তুলতেন। ইমাম আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো:

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنبِّئكُمْ بأكبر الكبائر؟ ألا أنبِّئُكُمْ بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول الله، قال : الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدين، وكان متَّكِيًا فجلسَ فقال : ألا وقولُ الزُّورو شهادةُ الزُّور، ألا وقولُ الزور وشهادة الزور، فما زال يقولُها حتى قلتُ : لايسْكُتُ وفى رواية مسلم : فما زال يُكررِّهُا حتى قلنا : ليته سكت.

৪৫. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ২৪৫-২৪৬; তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী হুরমাতিস সালাতি; ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান-বাবু কাফ্ফিল লিসান ফিল ফিতনাতি

আবূ বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম: হ্যাঁ করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, এতটুকু বলার পর সোজা হয়ে বসলেন, তারপর বললেন: জেনে রাখ, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। তিনি একথা বলতেই থাকলেন। এমন কি আমি (মনে মনে) বললাম: তিনি, চুপ করবেন না। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে- তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা (মনে মনে) বললাম : হায় তিনি যদি থামতেন!

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে "তিনি একথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। এমন কি (মনে মনে) বললাম: "যদি তিনি থামতেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনবার উচ্চারণ করেন: هَلْ بَلَّغْتُ আমি কি পৌঁছিয়েছি? এই বারবার একই কথা বলা এবং বসার ভঙ্গি পরিবর্তন দ্বারা তিনি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ সে সম্পর্কে শ্রোতাদের সতর্ক ও কথাটির প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

১৭. কোন কিছু না বলে বার বার শ্রোতার নাম ধরে ডেকে তাকে মনোযোগী করে তোলা

অনেক সময় তিনি যে কথা বলতে যাচ্ছেন তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বার বার শ্রোতার নাম ধরে ডাকতেন, কিন্তু কোন কথা বলতেন না। কয়েকবার এরূপ করার পর তিনি কথাটি বলতেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইতেন যে, বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবো। মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন:[৪৬]

---

৪৬. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জিহাদ-বাবু ইসমিল ফারাস ওয়াল হিমার ওয়াল লিবাস; বাবু ইরদাফির রাজুলি খালফার রাজুল; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান-বাবুদ দালীলি আলা আন্না মান মাতা আলাত তাওহীদ দাখালাল জান্নাতা কাত'আন

بينما أنا رديف النبى صلى الله عليه وسلم، ليس بينى وبينه إلا اخرة الرّحل، فقال : يامُعاذُ، قلت : لبَّيك يا رسول الله وسَعديْكَ. ثم سار ساعةً، فقال : يا معــاذُ، قلتُ : لبَّيك يا رسول الله وسَعْدَيْكَ، ثم ســار ســاعةً، فقال : يا معاذُ بن جَبَل، قلتُ : لبَّيكَ يــا رســول الله وسعديك. قال : هل تدرى ما حقٌّ الله علــى عبــاده؟ قلت : الله ورسوله أَعلمُ، قال : حقٌّ اللهِ على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ثم سارساعةً، ثم قال : يا معاذ بن جَبَل، قلتُ : لبَّيْكَ يا رسول الله وسَعَدَيْكَ، قال : هل تَدْرِى ما حق العباد غلــى الله إذا فعلــوه؟ قلتُ: اللهُ ورسوله أعلم، قال : حَقٌّ العباد على الله أن لايُعَذِّبَهُمْ.

একদিন আমি যখন একই বাহনে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে বসা ছিলাম। তাঁর ও আমার মাঝখানে হাওদার শেষ কাঠটি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এক সময় তিনি ডাকলেন: হে মু'আয! আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সমীপে হাজির! তারপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন। তারপর আবার ডাকলেন: হে মু'আয! আমি বললাম: আমি হাজির, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আবার কিছুক্ষণ চললেন, তারপর আবার বললেন: হে মু'আয ইবন জাবাল! আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাজির!

তিনি বললেন: তুমি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক বা অধিকার কী? বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হলো, তারা তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।

তিনি আবার কিছুক্ষণ চললেন। তারপর বললেন: হে মু'আয ইবন জাবাল! আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাজির। তিনি বললেন: তুমি কি জান, আল্লাহর উপর তার বান্দাদের হক বা অধিকার কী, যখন তারা আল্লাহর অধিকার পূর্ণ করে? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! তিনি বললেন: আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার হলো, তিনি যেন তাদেরকে শাস্তি না দেন।

১৮. শিক্ষাদানে মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি হয় এমন কাজ থেকে দূরে থাকা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁদের উপযুক্ত সময় ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তাঁরা ক্লান্ত বা বিরক্ত না হন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা মধ্য ও পরিমিত পন্থা অবলম্বন করতেন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তেমন কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হলো:

শাকীক আবূ ওয়ায়িল বলেন: আমরা 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) অপেক্ষায় তাঁর বাড়ির দরজায় বসে ছিলাম। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া আন-নাখা'ঈ। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদকে (রা) আমাদের অবস্থানের কথা জানাবেন। ইয়াযীদ, ইবন মাস'উদের (রা) ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইবন মাস'উদ (রা) বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন:

إنى أخبر بمكانكُمْ فما يمنعنى أن أخــرج إلــيكم إلاَّ كَرَاهِيَةُ أن أُمِلَّكُمْ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة فى الأيام مخافة السَّآمَةِ علينا.

আমাকে তোমাদের অবস্থানের কথা জানানো হয়েছে। তোমাদেরকে বিরক্ত করা আমার অপছন্দ হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তোমাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে বারণ করে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কষ্ট ও বিরক্ত হওয়ার আশঙ্কায় (সপ্তাহের) দিনগুলির মধ্যে কয়েকটি দিন আমাদের উপদেশের জন্য নির্ধারণ করে দেন।

অর্থাৎ সব সময় তিনি শিক্ষা দিতেন না। আমাদের আগ্রহ, মানসিক অবস্থা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝে সময় মত শিক্ষা দিতেন।[৪৭]

শাকীক আবূ ওয়ায়িল থেকে আল বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন:[৪৮]

كان عبد الله يذكرُ الناس فى كل خميس، فقـال لـه رجل: يا أبا عبد الرحمن–هذه كنيـة عبـد الله بـن مسعود _ إنَّا نُحِبُّ حديثك ونشتهيه، ولَودِدْنَـا أَنَّـكَ حَدَّثتنا كل يوم فقال : مايمنعنى أن أحدثكم إلا كَرَاهيةُ أن أُمِلكُم، وإنى أتخوَّلكم بالموعظة، كما كان النبـى صلى الله عليه وسلم يتخوَّلُنا بها مخافة السَّامَةَ علينا.

'আবদুল্লাহ প্রতি বৃহস্পতিবারে মানুষকে উপদেশ দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো: হে আবূ 'আবদির রহমান, (এটা 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের ডাকনাম) আমরা আপনার কথা পছন্দ করি এবং আরো শুনতে চাই। আমরা চাই প্রতিদিন আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া ও বিরক্ত করা আমার অপছন্দ হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তোমাদেরকে উপদেশ দান থেকে আমাকে বিরত রাখে নি। আমি মাঝে মাঝে নির্ধারিত দিনে তোমাদেরকে উপদেশ দান করি, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কষ্ট পাওয়া ও বিরক্ত হওয়ার আশঙ্কায় নির্ধারিত দিনে আমাদেরকে উপদেশ দিতেন।

ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ)-এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন:[৪৯]

يستفادُ من هذا الحديث استحباب ترك المداومة فـى

---

৪৭. সাহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬২, কিতাবুল 'ইলম-বাবু মা কানান নাবিয়্যু (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওইজাতি ওয়াল 'ইলম; মুসলিম, খ. ১৭, পৃ. ১৬৩, বাবুল ইকতিসাদ ফিল মাও'ইজাতি।

৪৮. সাহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৩, কিতাবুল 'ইলম- বাবু মান জা'আলা লিআহলিল 'ইলমি আইয়্যামান মা'লূমাতান, মুসলিম, খ. ১৭, পৃ. ১৬৩-১৬৪, বাবুল ইকতিসাদ ফিল মাও'ইজাতি

৪৯. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৬৩

الجدّ في العملَ الصالح خشـية المـلال، وإن كانـت المواظبةُ مطلوبة، لكنها على قسمين : إمَّا كلَّ يوم مع عدم التكلف، وإمَّا يوما بعد يوم فيكونَ يـوم التـرك لأجل الراحة، ويختلف بإختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجةُ مع مراعاة وجود النشاط.

এ হাদীছ দ্বারা একথা জানা যায় যে, ভালো কাজ নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে করা যদিও কাঙ্খিত, তবে বিরক্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হলে তা মাঝে মধ্যে বিরতি দেওয়া কাম্য। তবে তা দু'ধরনের হতে পারে। কোন রকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া প্রতিদিন করা অথবা একদিন পর একদিন করা, যাতে বিরতির দিন বিশ্রাম নিতে পারে। আর এটা ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে পার্থক্য হতে পারে। এর নিয়ম হলো, প্রয়োজন ও উৎসাহ উদ্দীপনার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি হাদীছ উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[৫০]

يَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنفِّرُوا.

তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দান করো, ভীত-আতঙ্কিত করো না।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে কোথাও পাঠাতেন তখন তাঁকে এই উপদেশ দিতেন:[৫১]

بشِّرُوا ولا تُنفِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا.

তোমরা সুসংবাদ দাও, ভীত-আতঙ্কিত করো না। সহজ করো, কঠিন করো না।

---

৫০. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম-বাবু মাকানান নাবিয়্যি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাও'ইজাতি

৫১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ- বাবু তা'মীরিল ইমামি আল-'উমারাআ 'আলাল বু'উছি

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহ) বলেন, এই হাদীছে আল্লাহর অনুগ্রহ, বিরাট ছাওয়াব, বিশাল প্রতিদান ও ব্যাপক বিস্তৃত দয়া ও করুণা লাভের সুসংবাদ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন শাস্তি ও আজাবের কথা বলে মানুষকে ভীত আতঙ্কিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই হাদীছে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীর অন্তর আকৃষ্টকরণ, শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে কঠোরতা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। তদ্রুপ যে সকল কিশোর বয়োপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং যে পাপী তাওবা করেছে তার সাথেও কঠোর আচরণ পরিহারের কথা বলা হয়েছে। তাদের সবার সাথে বিনম্র আচরণ করতে হবে। ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে ইসলামের বিধি বিধান পালনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

ইসলামের সকল বিধিবিধান পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যখন ইসলামে স্বেচ্ছায় প্রবেশকারীর উপর অথবা প্রবেশ করতে ইচ্ছুকদের জন্য সহজ করা হবে তখন তা তার জন্য পালন করা সহজ হবে। আর যদি কঠিন করা হয় তাহলে হয়তো সে ইসলামে প্রবেশ করবে না। আর করলেও আশংকা আছে ইসলামে স্থায়ী না হওয়ার অথবা ইসলামকে ভালো না লাগার।"[৫২]

হাদীছটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবন হাজার 'আসকালানী (রহ) বলেন:[৫৩]

وكذا تعليم العلم ينبغى أن يكون بالتدريج، لأن الشـــئ إذا كان فى ابتدائة سهلاً حُبِّبَ إلى من يـــدخُلُ فيـــه، وتلقَّاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبًا الازد يادَ بخلاف ضده.

তদ্রুপ জ্ঞান শিক্ষাদান, পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে তা হওয়া উচিত। কারণ, কোন জিনিস তার সূচনাতে যদি সহজ সরল হয় তাহলে তার মধ্যে যারা প্রবেশ করবে তাদের নিকট পছন্দনীয় হবে এবং প্রফুল্ল চিত্তে তা গ্রহণ করবে। আর এর ফলাফল হয় সাধারণত বৃদ্ধি ও আধিক্য। অন্যদিকে এর বিপরীতটির ফলাফলও হয় বিপরীত।

১৯. শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই ও তাদের জ্ঞানের গভীরতা জানার জন্য প্রশ্ন করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরামকে

৫২. ইমাম আন-নাবাবী, শারহু সাহীহ মুসলিম, খ. ১২, পৃ. ৪১
৫৩. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৬৩

(রা)-এমন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন যা তিনি জানতেন। এর উদ্দেশ্য হতো তাদের মেধা, মনন ও জ্ঞানের পরীক্ষা এবং চিন্তা ও অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করা। এ সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন:

بَيْنَا نحن عند النبى صلى الله عليه وسلم جلـوس إذ أُتِى بجمار نخلة، فقال وهو يأكله : إن مـن الشـجر شَجَرَةً خَضْرَاءُ لَمَا بَركتُهَا كبركة المسـلم، لايسـقط وَرَقُها، ولايتحاتُّ، وتُؤْتى أكُلُهَا كلَّ حينٍ بإذن ربِّهـا، وإنَّها مِثْلُ المسلم فحدَّثُونى ماهى؟

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট খেজুর গাছের কিছু মজ্জা আনা হলো। তিনি তা খেতে খেতে বললেন: বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন একটি সবুজ সতেজ বৃক্ষ আছে, অবশ্যই যার কল্যাণ একজন মুসলিমের কল্যাণের মত। যার পাতা পড়ে না, বিক্ষিপ্তও হয় না। তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় সে সব সময় (নির্ধারিত সময়ে) তার খাদ্য (ফল) দেয়। সে বৃক্ষটি হলো একজন মুসলিমের মত। তোমরা আমাকে বল তো সেটি কোন বৃক্ষ?

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন: লোকেরা মরুদ্যানের বিভিন্ন বৃক্ষের কথা ভাবতে লাগলো। কেউ বললো, অমুক বৃক্ষ, কেউ বললো অমুক বৃক্ষ। কিন্তু আমার মনে হলো, সেটা খেজুর গাছই হবে। আমি তা বলতে চাইলাম। কিন্তু আমি ছিলাম সেখানে উপস্থিত বয়ো:জ্যেষ্ঠদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ একজন তরুণ। তাদের সামনে কথাটি বলতে ভয় পেলাম। আমি মাজলিসের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম আমি দশম ব্যক্তি এবং সবার চেয়ে বয়সে ছোট। আরো দেখলাম, আবূ বাকর ও 'উমার উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাঁরা কোন কথা বলছেন না। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই বলে দিন, সেটি কোন বৃক্ষ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেটি হলো নাখলা বা খেজুর গাছ।

'আবদুল্লাহ বলেন: আমরা যখন মাজলিস থেকে উঠলাম, আমার পিতা 'উমারকে বললাম: আব্বা, আল্লাহর কসম! সেটা যে খেজুর গাছ তা আমার অন্তরে উদয়

হয়েছিল। তিনি বললেন: তাহলে তা বলতে বারণ করেছিল কে? বলালাম: আমি আপনাদেরকে কথা বলতে দেখলাম না। না আপনাকে, না আবূ বাকরকে। আর আমি একজন তরুণ যুবক, তাই কথা বলতে লজ্জা পেলাম। কোন কথা বলা সমীচীন মনে করলাম না। চুপ থাকলাম। 'উমার বললেন: আমার অমুক অমুক জিনিস হোক তার চেয়ে তুমি যদি কথাটি বলতে তাই ছিল আমার বেশি প্রিয়।[৫৪]

২০. দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ও তুলনার মাধ্যমে শিক্ষাদান

কোন একটি বিষয়ে করণীয় কী তা যদি স্পষ্ট না হতো অথবা তার বিধান যদি দুর্বোধ্য হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট তারই অনুরূপ একটি বা একাধিক দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্য উপস্থাপন ও তুলনা করে তার বিধান ও কারণ ব্যাখ্যা করতেন যাতে সেই বিষয়টির দুর্বোধ্যতা ও সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায় এবং তারা যেন শরী'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখানে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো: আমার মা হজ্জ আদায়ের মান্নত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মারা যান। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। তারপর তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অনুরূপ আরেকটি বিধানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন:

أرأيتِ لوكان على أمك دَيْنٌ أكنتِ قاضيةً؟

> আচ্ছা, তুমি বলতো, তোমার মায়ের যদি ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না?

মহিলা বললো: হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তদ্রুপ, আল্লাহর যে ঋণ তা তোমরা পরিশোধ কর। কারণ, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।[৫৫]

---

৫৪. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম-বাবু তারাহিল ইমাম আল-মাসআলাতা 'আলা আসহাবিহি লিইউখতাবারা মিনাল 'ইলম; বাবুল ফাহমি ফিল 'ইলম; বাবুল হায়া' ফিল 'ইলম

৫৫. সাহীহ আল-বুখারী, বাবুল হাজ্জি ওয়ান নুযূরি 'আনিল মায়্যিতি

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার কয়েকজন সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা বেশি বেশি ছাওয়াব অর্জন করছে। তারা আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের মত সাওম পালন করে, কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সাদাকা করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা সাদাকা করবে এমন কোন কিছু কি আল্লাহ তোমাদেরকে দেন নি? নিশ্চয় প্রতিটি তাসবীহ্ পাঠ একটি সাদাকা, প্রতিটি তাকবীর পাঠ একটি সাদাকা, প্রতিটি আল-হামদু লিল্লাহ পাঠ একটি সাদাকা, একটি সৎকাজের আদেশ করা একটি সাদাকা এবং স্ত্রীর সাথে একবার সহবাসও একটি সাদাকা। অর্থাৎ ধনীরা অতিরিক্ত সম্পদ দান করে যেমন প্রচুর ছাওয়াব অর্জন করছে, তেমনিভাবে বিত্তহীনরা উল্লেখিত কাজের মাধ্যমে তাদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে।

এরপর তারা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে যৌন-ইচ্ছা পূরণ করে তাতেও কি সে ছাওয়াব পাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের একথার জবাব দিলেন এভাবে:

أرأيتم لو وضَعها فى حرام أكان عليـه فيهـا وزرٌ؟
فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجرٌ.

আচ্ছা, তোমরা আমাকে বল তো, সে যদি কোন হারাম তথা অবৈধ স্থানে কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে কি তার পাপ হবে না? অনুরূপভাবে সে হালাল তথা বৈধ স্থানে সম্পন্ন করলে তাতে তার ছাওয়াব বা পুণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি চমৎকার তুলনা ও যুক্তি উপস্থাপন করে বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। বৈধ আনন্দ ও সুখ উপভোগেও যে ছাওয়াব ও প্রতিদান আছে, তা তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে না বুঝিয়ে তুলনা ও যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর ক্রয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনলাম। তিনি সরাসরি জবাব না দিয়ে সেখানে যারা বসে ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন:

أَيَنْقُصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟

তাজা খেজুর শুকালে কি ওজনে কমে যায়?" সবাই বললেন, হ্যাঁ, কমে যায়। তারপর তিনি এভাবে কেনাবেচা করতে নিষেধ করে দেন।[৫৬]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মভূমি হিজায ছিল খেজুর উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। তিনি সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তিনি অবশ্যই জানতেন, তাজা খেজুর শুকালে ওজনে কমে যায়। তারপরেও তিনি প্রশ্ন করেন: তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুরের কেনা-বেচা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। আর তা হলো তাজা খেজুর শুকানোর পর কমে যাওয়া। সুতরাং ওজনের সমতায় তা কেনা-বেচা করা বৈধ নয়। তিনি এখানে সরাসরি বৈধ নয়- একথাটি না বলে অবৈধ হওয়ার কারণটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেন।

২১. পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি হলো সংলাপ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদেরকে সতর্ক করা, জবাবদানের জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং জবাব দানের জন্য চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। জবাবদানে অক্ষম হলেও বিষয়টি যাতে সহজবোধ্য হয় এবং অন্তরে বসে যায় তা-ই এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

আল বুখারী ও মুসলিম (রহ) বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[৫৭]

أرأيتم لو أن نَهْراً بباب أحدكم، يغتسل منه كُلَّ يـوم خمس مَرَّاتٍ، هل يبقي من دَرَنه شئ؟

তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় যদি নদী থাকে, সেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তোমরা কি মনে কর তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে?

---

৫৬. আবূ দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ'-বাবুন ফিছ ছামারি বিছ ছামারি; তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ'-বাবু মা জাআ ফিন নাহয়ি 'আনিল মুহাকালা ওয়াল মুযাবানা; নাসাঈ, বাবু ইশতিরাউছ ছামার বির রুতাব

৫৭. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু মাওয়াকীতিস সালাত-বাবুস সালাওয়াতিল খামসি কাফফারাতুন; মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ১৭০, কিতাবুল মাসাজিদ-বাবু ফাদলিস সালাতিল মাকতূবাতি ফী জামা'আতিন

সাহাবায়ে কিরাম (রা) জবাব দিলেন: না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

فذلك مثل الصلوات الخمس يَمْحُو اللهُ بهنَّ الْخَطَايَا.

তদ্রুপ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এর দ্বারা আল্লাহ সকল ভুল-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা মুছে ফেলেন।

এই হাদীছে সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান ছাড়াও উপমার মাধ্যমেও শিক্ষাদান যে অধিক ফলপ্রসূ হয় সেটাও আমরা বুঝতে পারি। বিভিন্ন কারণে আমরা উপমা ব্যবহার করে থাকি। এর মূল লক্ষ্য হলো শ্রোতার নিকট স্পষ্ট করা। যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন একটি বিষয় যা সাধারণ মেধার মানুষের নিকট সহজবোধ্য নয়, সেটিকে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কোন বিষয় বা বস্তুর উপমা দিয়ে উপস্থাপন করলে সহজবোধ্য হয়। মানুষের ভুল-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা পাঁচ ওয়াকত সালাত মুছে দেয়। বিষয়টি একেবারেই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। এটাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। যেমন, কেউ যদি একটি নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকে না, তেমনি দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করলে তার পাপ মুছে যায়। শিক্ষাদানের এ এক চমৎকার পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির আরেকটি দৃষ্টান্ত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন:

أَ تَدْرُوْنَ مَا المفلس؟

তোমরা কি জান রিক্ত-নিঃস্ব কে?

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন: আমাদের মধ্যে যার কোন দিরহাম নেই, নেই কোন বিষয়-সম্পত্তি সেই হলো রিক্ত-নিঃস্ব।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :[৫৮]

إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ امَّتِى مَن يأتى يــوم القيامــة بصـــلاة وصيام وزكاةٍ، ويأتى وقدشتم هذا، وقذف هذا وأكــل مال هذا، سفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعْطى هذا من

৫৮. মুসলিম, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি-বাবু তাহরীম আজ-জুলমি

حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حَسَنَاتُه قبْل أن يُقْضِى ما عليه، أخذ من خطا ياهم فُطِرحَتْ عليه ثــم طرح فى النار.

আমার উম্মাতের রিক্ত-নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যে কিয়ামাতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত সহকারে আসবে। সে আসবে এমন অবস্থায় যে- একে গালি দিয়েছে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, অমুকের অর্থ-সম্পদ ভোগ করেছে, ওর রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং ওকে মেরেছে। তখন তার নেকি বা পুণ্য থেকে একে দেওয়া হবে, ওকে দেওয়া হবে। অতঃপর তার পুণ্য যদি শেষ হয়ে যায় তার ঋণ পরিশোধের পূর্বেই, তাহলে তাদের পাপসমূহ ধরে তার উপর ছুঁড়ে ফেলা হবে। অতঃপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

এখানে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রথমে প্রশ্ন করেছেন, তাদের জবাব শোনার পর প্রকৃত জবাবটি বলে দিয়েছেন। তিনি তাদের মন-মানসকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তোমাদের চিন্তা-চেতনা সঠিক নয়। প্রকৃত রিক্ততা ও নিঃস্বতা হলো কিয়ামাতের দিনের রিক্ততা-নিঃস্বতা।

ঈমানের আরকান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হাদীছে জিবরীল হলো সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। হাদীছটি 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) সহ বহু সাহাবী বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামকে দীনের রূপরেখা শিক্ষাদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও জিবরীল (আ)-এর মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে ঈমানের রুকন সমূহ সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে উপস্থাপিত হয়। নিম্নে হাদীছটি উপস্থাপন করা হলো:

'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) বলেন: একদিন আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট বসে আছি তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। তার পরনের কাপড় অতিরিক্ত সাদা, মাথার চুল অতিরিক্ত কালো। তার চেহারায় ভ্রমণের কোন চিহ্ন দেখা গেল না এবং আমাদের কেউ তাকে চিনতোও না। সে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'হাঁটুর সাথে নিজের দু'হাঁটু মিলিয়ে বসলো এবং নিজের দু'টি হাত নিজের উরুর উপর রাখলো। অর্থাৎ একজন ভদ্র-মার্জিত শিক্ষার্থীর মত বসলো। অতঃপর সে বললো:

ইয়া মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

الاسلام أن تشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضانَ، وتحجَّ البيت أن استطعت إليه.

ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দান করবে, রামাদান মাসে সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে-যদি সেখানে যাওয়ার সাধ্য থাকে।

লোকটি বললো: আপনি সত্য বলেছেন। 'উমার (রা) বলেন, লোকটির এভাবে প্রশ্ন করা এবং জবাব শুনে সত্যায়ন করা দেখে আমরা অবাক হলাম।

অতঃপর লোকটি আবার রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললো: আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

أن تؤ منَ بالله و ملائكتة و كتبه و رسله واليوم الاخر، و تؤمن با لقدر خيره و شره.

তা হলো এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও শেষ বিচার দিনের উপর ঈমান আনবে এবং ঈমান আনবে তাকদীরের ভালো ও মন্দের উপর।

লোকটি বললো: আপনি সত্য বলেছেন। তারপর বললো: আপনি আমাকে 'ইহ্‌সান' বিষয়ে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তাকে দেখছো। যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন। তারপর লোকটি বললো: আপনি আমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। বললেন: এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির জ্ঞান বেশি নয়।

লোকটি বললো: তাহলে তার কিছু লক্ষণ আমাকে বলুন। তিনি বললেন: দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে এবং তুমি খালি পা, নগ্ন দেহ, বহু সন্তানের অধিকারী দরিদ্র ছাগল-বাকরীর রাখালদেরকে সুউচ্চ অট্টালিকায় গর্বভরে অবস্থান করতে দেখবে।

'উমার (রা) বলেন: লোকটি চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'উমার! তুমি কি জান এই প্রশ্নকারী কে? বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন: সে জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখানোর জন্য এসেছিল।'[৫৯]

হাদীছে জিবরীল সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কোন বিজ্ঞ 'আলিমের মাজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি যদি থাকেন যিনি হয়তো কোন বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, কিন্তু অন্যরা সে বিষয়ে অজ্ঞ তাহলে তার উচিত সেই বিষয়ে সেই 'আলিমের নিকট প্রশ্ন করা। তাহলে সেই প্রশ্নের জবাব শুনে অন্যরা বিষয়টির জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এ ধরনের চমৎকার প্রশ্ন করাটাও এক ধরনের শিক্ষাদান। এ হাদীছে আমরা দেখতে পাই, জিবরীল (আ) কেবল প্রশ্ন করেছেন অন্য কোন কথা বলেন নি, কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন:

فَإِنَّه جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

সে জিবরীল, এসেছিল তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষাদানের জন্য।

২২. আগ্রহ সৃষ্টি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরেকটি শিক্ষাদান পদ্ধতি হলো যে ভালো কাজের দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান জানাতেন সে ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহ প্রদান করতেন, ঠিক তার বিপরীতে যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইতেন, সে ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন। ভালো কাজটি করলে তার ইহকালীন ও পরকালীন বিরাট লাভ ও প্রতিদান এবং খারাপ কাজটি করলে তার ভয়ংকর পরিণতির কথা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। অনেক সময় তিনি উৎসাহদানের পাশাপাশি ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কাজটি একই সাথে করতেন। য্যাতে ভয়-ভীতি মানুষের মধ্যে হতাশা ও ঘৃণার সৃষ্টি না করে, ঠিক তেমনি ভাবে অতিরিক্ত ছাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তির আস্থা তাকে অলস ও অকর্মণ্য না করে দেয়।

হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণ "أَحَادِيْثُ التَّرْغِيْبُ والترهيب" শিরোনামে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ জাতীয় হাদীছের অনেক সংকলন তৈরি করেছেন। তবে হাফিয যাকী উদ্দীন 'আবদুল আযীয আল মুনযিরীর (রহ)

---

৫৯. সাহীহ আল-বুখারী- কিতাবুল ঈমান- বাবু সুওয়ালু জিবরীল আন-নাবিয়্যা (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম); ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১১৫-১২৫; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১৫৭-১৬০, কিতাবুল ঈমান

সংকলনটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সংকলনটির শিরোনাম الترْغِيْبُ والترهيب كتاب من الحديث الشريف; গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

২৩. অতীত কোন ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামকে (রা) অতীতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বাস্তব ও সত্য ঘটনা ও ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু শ্রোতাদের প্রতি সরাসরি কোন আদেশ-নিষেধ থাকে না, বরং অন্যদের ঘটনার বিবরণ, ইতিহাস এবং পরিণাম-পরিণতি ইত্যাদি থাকে, সেজন্য শ্রোতারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয় এবং উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনও এই মহান পদ্ধতিতে তাঁর নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:[৬০]

وَكُــلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَــا نُثَبِّــتُ بِــهِ فُؤَادَكَ.

রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি।

হাদীছের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণিত বহু উপদেশমূলক ঘটনা ও কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি হাদীছ উদ্ধৃত হলো:

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং কেবলমাত্র কল্যাণ ও দীনের জন্য ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করা বিষয়ক নিম্নের হাদীছটি লক্ষ্য করুন:

عَن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صــلى الله عليه وسلم : أنَّ رجلا زار أخاًله فى قريــة أخــرى، فأرصَدَ الله له على مدرجته ملَكًا، فلما أتى عليه قال : أين تُريدُ؟ أريد أخاًلى فى هذه القرية، قال : هل لــك عليه من همة تربُّها؟ قال : لا، غير أنى أحببته فــى

---

৬০. সূরা হূদ- ১২০

الله عزَّ وجلَّ، قال : فإنى رسولُ الله إليك، بأنَّ الله قد أحَبَّك كما أحببته فيه.

আবূ হুরাইরা (রা) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি অন্য একটি গ্রামে তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। তার চলার পথে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে বসিয়ে রাখেন। যখন লোকটি তার নিকট আসলো সে বললো। তুমি কোথায় যাচ্ছো? লোকটি বললোঃ এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের নিকট যাচ্ছি। ফেরেশতা বললোঃ সে কি সেখানে তোমার কোন সম্পদ দেখাশুনা করে? লোকটি বললোঃ না। তবে আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা তখন বললোঃ আমি তোমার নিকট প্রেরিত আল্লাহর দূত। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন যেমন তুমি তার জন্য এই লোকটিকে ভালোবাস।[৬১]

অতীত ইতিহাস ও ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষাদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো সেই বিখ্যাত হাদীছটি যাতে তিনি জীব-জন্তুর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন এবং সাথে সাথে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও তাদেরকে কষ্টদানের ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। নিম্নে হাদীছটি উল্লেখ করা হলো।[৬২]

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتدَّ عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلبٌ يلهثُ يأكلُ الثرى من العطش، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثلُ الذى كان بَلَغَ منى ! فنزل البئر فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رَقِىَ فسقى الكلب، فشكر اللهُ له فغَفَرله.

৬১. মুসলিম, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি-বাবু ফাদলিল হুব্বি ফিল্লাহ তা'আলা

৬২. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব- বাবু রাহমাতিন নাসি ওয়াল বাহায়িম; মুসলিম, কিতাবুল সালাম-বাবু ফাদলু সাকয়িল বাহায়িম আল-মুহাররামা ওয়া ইত'আমুহা।

قالوا يارسول الله! وإنّ لنا فى البهائم لأجْرًا؟ فقـــال : فى كلّ كبد رطبة أجرٌ. يعنى : فى الاحسان إلى كل ذى روح وحياة أجر.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এক ব্যক্তি পথ চলাকালে প্রচন্ডভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর সে একটি পানির কূপ পায় এবং তার ভিতরে নেমে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। উপরে উঠে এসে দেখতে পায় একটি কুকুর হাপাচ্ছে এবং পিপাসা নিবারণের জন্য মাটি খাচ্ছে। লোকটি আপন মনে বললোঃ পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও সেই অবস্থা হয়েছে। সে আবার কূপের ভিতর নেমে নিজের মোজায় পানি ভরে মুখে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করায়। আল্লাহ তার কাজের প্রতিদান স্বরূপ তার পাপ ক্ষমা করে দেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীব-জন্তুর ব্যাপারে আমাদের প্রতিদান আছে? বললেনঃ প্রতিটি সজীব যকৃতের অধিকারীর ব্যাপারে প্রতিদান আছে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণী ও জীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রতিদান আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণিত এ জাতীয় আরো কয়েকটি অতীতের ঘটনা এখানে উপস্থাপন করা হলোঃ

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ[৬৩]

بينما كَلْبٌ يُطِيْفُ ببئرٍ قد كاد يقتله الْعَطَشُ، إذ رأتْـــهُ بَغِيٌّ من بَغَايَا بنى إسرائيل، فنزعت خُفَّهَـــا فأوثقتْـــهُ بخمارها، فنزعَتْ له من الماء، فسقتْهُ، إيَّاه، فغُفِرَ لها بذلك.

পিপাসায় জীবন যায় যায় অবস্থায় একটি কুকুর পানির কূপের পাশে চক্কর দিচ্ছিল। বনী ইসরাঈলের একজন বেশ্যা তা দেখতে পেয়ে নিজের

---

৬৩. সাহীহ আল-বুখারী, খ-৬, পৃ. ২৫৬, কিতাবু বাদয়িল খালক, মুসলিম, খ- ১৪, পৃ. ২৪২, কিতাবুস সালাম-বাবু ফাদলি সাকয়িল বাহায়িম আল-মুহাররামা ওয়া ইত'আমুহা

পায়ের মোজা খুলে ওড়নায় বেধে কুপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করায়। এর প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) থেকে এ জাতীয় একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ[৬৪]

عُذِّبَتْ امرأةٌ فى هرَّة ربطتها حتى ماتتْ، فدخلت فيها النار، لاهى أطعمتها، ولاسقتها إذ جبستها، ولاهـى تركتها تأكل من حشاش الأرض.

একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ায় এক মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আটক অবস্থায় সে বিড়ালটিকে খেতে দেয় নি, পানি পান করায়নি এবং তাকে পোকা, কীট-পতঙ্গ খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয় নি।

আল বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ[৬৫]

لم يتكلم فى المهد إلاَّ ثلاثه.

তিনজন ছাড়া মায়ের কোলে বা দোলনায় থাকা অবস্থায় আর কেউ কথা বলে নি।

অতঃপর তিনি সেই তিন শিশুর পরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ

১. 'ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)

২. জুরাইজ-এর সংগী-সাথী (صاحب جريج)[৬৬]

জুরাইজ ছিলেন একজন 'আবিদ ব্যক্তি। তিনি একটি গীর্জা তৈরি করে সেখানে অবস্থান করতেন। একদিন তিনি যখন উপাসনায় নিমগ্ন তখন তার মা এসে ছেলের নাম ধরে 'জুরাইজ' বলে ডাক দেন।

জুরাইজ বলেনঃ 'হে আমার প্রভু! আমার মায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপাসনা শেষ করা- এই দু'টির যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করার সক্ষমতা আমাকে দান কর।' এরপর তিনি আবার উপাসনায় মগ্ন হয়ে যান এবং তার মা ফিরে যান।

---

৬৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া', মুসলিম, খ- ১৪, পৃ. ২৪০, কিতাবুস সালাম- বাবু ফাদলি সাকয়িল বাহায়িম আল- মুহাররামা

৬৫. বুখারী, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া- বাবু (قول الله تعالى و اذكر فى الكتاب مريم) মুসলিম, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি

৬৬. সেই শিশুটি যার জন্মের ব্যাপারে জুরাইজকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল

পরের দিন তিনি যখন উপাসনায় লিপ্ত তখন তার মা আবার আসলেন এবং একইভাবে ছেলেকে ডাকলেন। জুরাইজ পূর্বের দিনের মত একই রকম আচরণ করলেন এবং মা ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন একই রকম ঘটনা ঘটলো। জুরাইজ একই রকম আচরণ করলেন। সেদিন মা বললেনঃ

اللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى يَنظر إلى وُجُوه المُوْمِسَاتِ.

হে আল্লাহ! প্রকাশ্য ব্যভিচারিণীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা ব্যতীত তুমি তার মৃত্যু দিও না।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ ও তার উপাসনার কথা ছড়িয়ে পড়লো। এক সুন্দরী বেশ্যা, যার রূপ-সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হতো, সে বললোঃ

তোমরা চাইলে আমি তাকে বিমুগ্ধ করতে পারি। অতঃপর সে নিজেকে তার সামনে উপস্থাপন করে, কিন্তু জুরাইজ তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। জুরাইজের গীর্জায় রাত্রি যাপন করতো এক রাখাল। উক্ত বেশ্যা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তার সাথে দৈহিক মিলন হয় এবং বেশ্যা গর্ভবতী হয়।

সে সন্তান প্রসবের পর বললোঃ এটি জুরাইজের সন্তান। লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে জুরাইজকে তার গীর্জা থেকে টেনে বের করে আনে, তার গীর্জাটি ভেঙ্গে গুড়ো করে দেয় এবং তাকে মারতে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ কী ব্যাপার! তোমরা এমন করছো কেন? লোকেরা বললোঃ এই বেশ্যার সাথে তুমি ব্যভিচার করেছো এবং তোমার সন্তান প্রসব করেছে।

জুরাইজ বললেনঃ শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটি নিয়ে এলো। জুরাইজ বললেনঃ তোমরা আমাকে একটু অব্যাহতি দাও, আমি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিই। উল্লেখ্য যে, তাদের শরী'আতে সালাতের বিধান ছিল। সালাত শেষ হলে শিশুটিকে তার নিকট আনা হলো। তিনি শিশুটির পেটে মৃদু আঘাত করে, মতান্তরে তার মাথা স্পর্শ করে বলেনঃ ছেলে! তোমার পিতা কে? সে বললোঃ অমুক রাখাল।

মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। সমবেত লোকেরা জুরাইজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং তাকে চুমু দিতে ও স্পর্শ করতে লাগলো। তারা প্রস্তাব দিল! আমরা তোমার জন্য সোনার গীর্জা বানিয়ে দেব। তিনি বললেনঃ না। তোমরা পূর্বের মত মাটি দিয়ে গীর্জাটি বানিয়ে দাও। তারা তাই করে।"

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তার মা এই বলে বদ-দুআ করেনঃ "হে আল্লাহ! এই আমার ছেলে জুরাইজ, আমি তার সাথে কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু সে কথা বলতে

অস্বীকৃতি জানালো। হে আল্লাহ! প্রকাশ্য ব্যভিচারিণীর মুখ দর্শন ব্যতীত তার মৃত্যু দিও না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন! যদি তার মা ব্যভিচার অথবা হত্যার অপরাধ সংঘটনের জন্য বদ-দুআ করতো, তাহলে সে তাই করতো।"

একটি বর্ণনায় একথাও এসেছেঃ "লোকেরা তাকে মানুষের মধ্যে ঘোরাতে থাকে এবং একথা বলতে থাকে যে, তুমি লোক দেখানো উপাসনার নামে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো। যখন তারা বেশ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন বেশ্যারা ঘর থেকে বেরিয়ে জুরাইজকে দেখতে থাকে। জুরাইজ তাদেরকে দেখে মৃদু হাসতে থাকে। লোকেরা বলাবলি করলোঃ সে হাসে কেন?

তারা বেশ্যালয় প্রদক্ষিণ শেষে তাকে নিয়ে তার গীর্জায় ফিরে আসে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, সত্যি করে বলতো, তুমি হাসলে কেন? সে বললোঃ আমি আমার মায়ের একটি বদ-দু'আর কথা স্মরণ করে হেসেছি। অর্থাৎ আমার এই শাস্তি ও অপমান আমার মায়ের সেই বদ-দু'আর পরিণাম।

৩. একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। তখন সুদর্শন এক পুরুষ একটি তেজোদীপ্ত বাহনে চড়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে শিশুটির মা বললোঃ হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে এই ব্যক্তির মত বানাও। শিশুটি মায়ের স্তন ছেড়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মত বানিও না। তারপর আবার সে মায়ের স্তন থেকে দুধ পানে ফিরে যায়। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি যেন দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় শাহাদাত অঙ্গুলিটি নিজের মুখে দিয়ে শিশুটির দুধ পানের দৃশ্য বর্ণনা করছেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ তারা শিশুটিকে নিয়ে এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা তখন সেই মহিলাকে মারছিল, আর বলছিল, তুমি ব্যভিচার করেছো, চুরি করেছো। আর সে বলছিলঃ আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

তখন শিশুটির মা বললোঃ হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে তার মত করো না। মায়ের একথা শুনে শিশুটি দুধপান বন্ধ করে তার দিকে তাকালো। তারপর বললোঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মত কর।

অতঃপর মা ও শিশু সন্তানের মধ্যে কিছু কথা বিনিময় হয়। যখন মা বুঝতে পারলো সত্যিই তার শিশু সন্তান কথা বলতে পারে তখন মা বললোঃ অবাক ব্যাপার! একজন সুপুরুষ যখন পাশ দিয়ে গেল তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তার মত কর। তুমি বললেঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মত করো না। তারা এই দাসীকে মারতে মারতে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আর বলছিলঃ তুমি চুরি করেছো, ব্যভিচার করেছো। আমি বললামঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে তার মত করো না। আর তুমি তখন বললে! হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মত কর।

'শিশুটি তখন বললোঃ ঐ লোকটি ছিল একজন স্বেচ্ছাচারী ও অহঙ্কারী। তাই আমি বলেছিঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মত করো না। আর এই দাসীটিকে লোকেরা বলছেঃ তুমি ব্যভিচার করেছো, কিন্তু সে ব্যভিচার করে নি, তুমি চুরি করেছো, কিন্তু সে চুরি করে নি। তাই আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। অর্থাৎ আমাকে তার মত পাপ মুক্ত রাখ।

২৪. সম্বোধিত ব্যক্তিকে মনোযোগী করে তোলার জন্য তার একটি হাত অথবা কাঁধ মুট করে ধরা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো সম্বোধিত ব্যক্তির হাত বা কাঁধ মুট করে ধরে কথা বলতেন। যাতে সে মনোযোগ সহকারে চোখ-কান খোলা রেখে ও কান দিয়ে তাঁর বক্তব্য শোনে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করে। আর এভাবে শুনলে তা শিক্ষার্থীর অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন আমরা ইমাম আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীছে দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) দু'হাতের পাঞ্জা নিজের দু'হাতের পাঞ্জার মধ্যে আঁকড়ে ধরে তাঁকে "তাশাহহুদ" শিখাচ্ছেন। ইবন মাস'উদ বলছেন:[৬৭]

عَلَّمنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكفِّى بين كفَّيْه، التشهد، كما يُعلِّمنى السورة من القرأن.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাতের পাঞ্জা তাঁর দু'পাঞ্জার মধ্যে নিয়ে আমাকে তাশাহহুদ শেখান, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শেখাতেন।

"তাশাহহুদ" শেখানোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন, ইবন মাস'উদের (রা)-এ বর্ণনা দ্বারা তাই বুঝা যায়। এই হাদীছ থেকে শিক্ষাদান বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানা যায়।

যেমন:

১. শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যোগ প্রকাশ করা, যাতে শিক্ষার্থী তার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং চোখ-কান খোলা রেখে একাগ্রতার সাথে তা ধারণ করে, অর্জিত বিষয়ে যাতে বিন্দু মাত্র হেরফের না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকে।

---

৬৭. আল বুখারী, খ-১১, পৃ. ৫৬, কিতাবুল ইসতি'যান-বাবুল আখযি বিল ইয়াদ; মুসলিম, খ ৪, পৃ. ১১৮, কিতাবুস সালাত-বাবুত তাশাহহুদ ফিস-সালাত

২. শিক্ষার্থীর হাত ধরে বিশেষ ভঙ্গিতে শিক্ষাদান বিষয়টির অত্যধিক গুরুত্বের কথা শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে। ফলে সাধারণ বক্তৃতা-ভাষণ শুনে শিক্ষা লাভের চেয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করে।

৩. অসাধারণ মেধাবী ও বিশেষ গুণের অধিকারী শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষাদান অধিকতর ফলদায়ক হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষাদানের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আরো দু'টি হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন :[৬৮]

أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَنكبى، فقـــال : كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابرسبيل، وعُدَّ نفســك من أهل القبور.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাঁধ মুট করে ধরে বলেন: দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন প্রবাসী, অথবা একজন (আড়াআড়ি) রাস্তা অতিক্রমকারী। আর নিজেকে তুমি একজন কবরবাসী বলে গণ্য কর।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন সাহাবীর উরুতে থাপপড় মেরে কথা বলতেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে একাগ্র ও মনোযোগী করে তোলা। মহান তাবি'ঈ আবুল 'আলিয়াহ (রহ) বলেন, ইবন যিয়াদ, আল-আমীর একবার দেরিতে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আস-সামিত (রা) আমার নিকট আসলেন। আমি তার বসার জন্য চেয়ার এনে দিলাম। তিনি বসলেন। আমি ইবন যিয়াদের কর্মের কথা তাকে অবহিত করলাম। আমার কথা শুনার পর তিনি দাঁত দ্বারা নিজের ঠোঁট কামড়ে আমার উরুতে থাপপড় মেরে বলেন:

إنى سألت أباذركما سألتنى، فضرب على فخذى كما ضربتُ على فخذك، وقال : إنى ســألتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى، فضرب على فخذى

---

৬৮. আল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, খ-১১, পৃ. ১৯৯; তিরমিযী, খ-৪, পৃ. ৫৬৭, কিতাবুয যুহদ-বাবু মা জাআ ফী কিসারিল আমাল

كما ضربت على فخذك، وقال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصــل، ولا تقــل : إنــى صليت فلا أصلى، فإنها زيادة خير.

আমি আবূ যার (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেমন- তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। তিনি আমার উরুতে থাপপড় মারেন যেমন আমি মেরেছি তোমার উরুতে। তারপর তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। তিনি আমার উরুতে থাপপড় মারেন যেমন আমি মেরেছি তোমার উরুতে। তারপর তিনি বলেন: যথাসময়ে সালাত আদায় কর। তারপর যদি অন্যদের সাথে সেই সালাত আবার পেয়ে যাও তাহলে আবার আদায় করবে। একথা বলবে না যে, আমি এ সালাত আদায় করেছি, তাই আর আদায় করবো না। কারণ, এই দ্বিতীয়বার আদায় করাটা হবে অতিরিক্ত কল্যাণ ও ছাওয়াবের কাজ।[৬৯]

ইমাম নাওয়াবী (রহ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন:

قوله: فضرب على فخذي أى للتبنيه و جمع الــذهن غلى ما يقوله.

আবূ যার (রা)-এর কথা: তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার উরুতে থাপপড় মারেন।

-অর্থাৎ তিনি তাকে সতর্ককরণ ও মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শোনার জন্য এ কাজ করেন।

ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ) বলেন: শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর কোন অঙ্গ স্পর্শ করার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি, তার মনোযোগ আকর্ষণ এবং তাকে সতর্ক করা। যার প্রতি গভীর স্নেহ-মমতা আছে, সাধারণত: তার সাথে এমন আচরণ করা হয়। এ হাদীছে একজনকে লক্ষ্য করে বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো বহুজন।[৭০]

---

৬৯. মুসলিম, খ ৫, পৃ. ১৫, কিতাবুল মাসাজিদ, বাবু কারাহিয়াতি তা'খীরিস সালাত 'আন ওয়াকতিহা
৭০. আর রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ১৭৮

২৫. কোন বিষয় বা বস্তুকে শ্রোতার সামনে অস্পষ্ট বা দ্ব্যার্থবোধকভাবে তুলে ধরা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে শ্রোতাকে অতিরিক্ত আগ্রহী অথবা সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। যাতে শ্রোতা তা জানার জন্য উদগ্রীব ও মনোযোগী হয়ে উঠে। আর এভাবে যখন সে বিষয়টি জানতে পারে তখন তার অন্তরে চিরদিনের জন্য গেঁথে যায়। যেমন- আনাস (রা) বলেন:[৭১]

كُنَّا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يَطلعُ الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار. تنطفُ لحيتُه من وضوئه، قد عَلَّق نَعْلَيْه بيده الشمال، فلمَّا كان الغدُ قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأ ولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضًا فَطَلَعَ ذلك الرجل على مثل حاله الأولى.

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। একসময় তিনি বললেন: এখনই তোমাদের নিকট জান্নাতের অধিবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। অতঃপর আনসারদের এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। যার দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ওজুর পানি পড়ছিল এবং বাম হাতে তার এক জোড়া জুতো ধরা ছিল। পরের দিনও নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একই কথা বললেন এবং সেই লোকটি পূর্বের দিনের মত উপস্থিত হলেন। তৃতীয় দিনেও নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একই কথা বললেন এবং পূর্বের অবস্থায় সেই লোকটি উপস্থিত হলেন।

উল্লেখ্য যে, সেই লোকটি ছিলেন সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস (রা)।[৭২]

---

৭১. মুসনাদু আহমাদ, খ-৩ পৃ. ১৬২

৭২. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৮, পৃ. ৭৪ (সা'দ ইবন আবী ওয়াককাসের (রা) জীবনী)

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أوَّلُ من يد خُــلُ من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل سعد بن أبى وقاص.

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এই দরজা দিয়ে প্রথম যে ঢুকবে সে হবে জান্নাতের অধিবাসী। অতঃপর সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস প্রবেশ করেন।

উপরোক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত রেখে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এতে সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে জানার জন্য শ্রোতাদের মনে কৌতুহল ও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ কারণে সেই মাজলিসে উপস্থিত প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-আস (রা) মাজলিস ভঙ্গের পর সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস (রা) কে অনুসরণ করে তাঁর বাড়িতে যান এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর ইবাদাত বন্দেগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, যাতে তিনিও তাঁর মত হতে পারেন।[৭৩]

অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধকভাবে শিক্ষাদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হতে পারে, এ হাদীছটিও। আবূ শুরাইহ আল-খুযা'ঈ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[৭৪]

والله لايؤمن! والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذىلا يأمن جاره بوائقه.

আল্লাহার কসম! সে ঈমানদার হবে না। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কে? বললেন: যার জুলুম-অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্রোতার আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কথাটি সরাসরি না বলে প্রথমে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধকভাবে বলেছেন। শ্রোতাকে পূর্ণ মনোযোগী করে কথাটি বলেছেন।

---

৭৩. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৩, পৃ, ১৬৬

৭৪. আল বুখারী, খ-১০, পৃ. ৩৭০, কিতাবুল আদাব-বাবু ইছমু মান লা ই'মানু জারুহু বাওয়াইকাহু

২৬. কোন একটি বিষয় প্রথমে সংক্ষেপে সার্বিকভাবে এবং পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা

শ্রোতার মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কোন একটি বিষয় সংক্ষেপে সার্বিকভাবে, তারপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন। যাতে বিষয়টি শ্রোতার অন্তরে গেঁথে যায় এবং সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো:[৭৫]

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قــال : مُرَّجبنــازةَ فأثنى عليه خيرًا فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : وجبت، وجبت، وَجَبَتْ وَمُرَّ بجنازة فأثنى عليها شرًّا، فقال نبىٌّ الله صلى الله عليه وسلم : وجَبَتْ وَجَبَــتْ، وَجَبَتْ فقال عُمرُ : فدىً أبى وأمى، مُرَّ بجنازةٍ فأثنى عليها خيرًا فَقُلْتَ : وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَــتْ، وَمُــرَّ بجنازةَ فأثنى عليها شرَاً، فقلــتَ : وَجَبــتْ وَجَبَــتْ، وَجَبَتْ.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أثنيتم عليه خيرًا وجَببت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرأ وجبــت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرض، انتم شــهداءُ الله فى الأرض، انتم شهداءُ الله فى الأرض.

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন: একটি জানাযা অতিক্রম করার সময়

---

৭৫. আল বুখারী, খ.৩, পৃ. ২৩৮, কিতাবুল জানায়িয-বাবু ছানায়িন নাসি 'আলাল মায়্যিত, খ-৫, পৃ. ২৫২, কিতাবুশ শাহাদাত; মুসলিম, খ. ৭, পৃ. ১৮, কিতাবুল জানায়িয; ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৭৮, কিতাবুল জানায়িয

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলো। তার নিন্দা-মন্দ করা হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে।

'উমার (রা) বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোন! একটি জানাযা অতিক্রম করলো, তার প্রশংসা করা হলো, আর আপনি (তিনবার) বললেন: ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলো এবং তার নিন্দা-মন্দ করা হলো, আপনি (তিনবার) বললেন: ওয়াজিব হয়ে গেছে। (এর ব্যাখ্যা কি?)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা যার প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে, আর যার নিন্দা-মন্দ করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। পৃথিবীতে তোমরা হলে আল্লাহর সাক্ষী, পৃথিবীতে তোমরা হলে আল্লাহর সাক্ষী, পৃথিবীতে তোমরা হলে আল্লাহর সাক্ষী।

عن أبى قتادة بن ربعى رضى الله عنه، أنه كان يحدث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ بجنازة، فقال : مُسْتَرِيْحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه.

قالوا : يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال : : العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريحُ منه العباد والبلاد والشجر والدوابُ.

আবূ কাতাদা রিব'ঈ (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলো। তিনি মন্তব্য করলেন: বিশ্রাম গ্রহণকারী এবং তার থেকে বিশ্রাম (বিরতি) প্রাপ্ত।

সাহাবীগণ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিশ্রাম গ্রহণকারী ও তার থেকে বিশ্রাম প্রাপ্ত- এ কথার অর্থ কি? বললেন: মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ

থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বিশ্রামে থাকবে এবং পাপী বান্দার জুলুম-অত্যাচার থেকে মানুষ, শহর, বৃক্ষ ও জীব-জন্ত বিশ্রাম লাভ করবে।[৭৬]

এক্ষেত্রে পিতামাতার সেবার ব্যাপারে সন্তানের উদাসীনতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্কীকরণ মূলক আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করা যায়:[৭৭]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رغم أنفه! ثم رغم انفــه! ثــم رغم أنفه! قيل : من يا رسول الله؟ قال : مــن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما، ثــم لــم يــدخل الجنة.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত! রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে লাঞ্ছিত হোক! সে লাঞ্ছিত হোক! সে লাঞ্ছিত হোক! বলা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে? বললেন: যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে তাদের বার্ধক্যে পেল, অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

তিনি পিতামাতার সেবায় অবহেলাকারীকে প্রথমে সাধারণভাবে সতর্ক করেছেন 'লাঞ্ছিত হোক' বলে। তারপর বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

২৭. গণনযোগ্য বিষয়ে প্রথমে সংক্ষেপে সংখ্যাটি বলে পরে বিস্তারিত বলা

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত পদ্ধতিও প্রয়োগ করতেন। এতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও মনে রাখতে সহজ হয়। এ জাতীয় শিক্ষামূলক রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله

---

৭৬. মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয বাবু মা জাআ ফী মুসতারীহিন ওয়া মুসতারাহিন মিনহু

৭৭. মুসলিম, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি: বাবু রাগমা আনফিন মান আদরাকা ওয়ালিদাইহি.......'ইনদাল কিবারি ফালাম ইয়াদ খলিল জান্নাতা

صلى الله عليه وسلم : اغتنم خمسًا قبل خمس : شَبابَكَ قبل هَرَمِكَ، صِحَّتَكَ قبل سَقَمِكَ، وغِنَاكَ قبل فقرِكَ، وفراغك قبل شُغْلك، وحَيَاتَكَ قبل موتك.

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের সুযোগ গ্রহণ কর। তোমার বার্দ্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনের, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতার, তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনাঢ্যতার, তোমার কর্মব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়ের এবং তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনের।[৭৮]

এই হাদীছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। বিপরীত জিনিসটি না আসা পর্যন্ত মানুষ তার সঠিক মূল্য বুঝতে পারে না। আরেকটি হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ.

দু'টি অনুগ্রহের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকার মধ্যে আছে: সুস্থতা ও অবসর সময়।

এ পদ্ধতির শিক্ষামূলক আরেকটি হাদীছ আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[৭৯]

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِجَمَالِهَا، وَ لِدِيْنِهَا، فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

চারটি কারণে একজন নারীকে বিয়ে করা হয়: তার ধন-সম্পদের জন্য, তার বংশ-কৌলিণ্যের জন্য, তার রূপ-সৌন্দর্যের জন্য এবং তার দীনের জন্য। সুতরাং তুমি দীনদার মহিলা বিয়ে করে সফলকাম হও। তোমার হাত ধুলিমলিন হোক!

---

৭৮. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, খ-৪, পৃ. ৩০৬

৭৯. আল বুখারী, খ-৯, পৃ. ১৩২, কিতাবুন নিকাহ: বাবুল আকফায়ি ফিদ-দীন, মুসলিম, খ-১০, পৃ-৫১, কিতাবুর রাদা', বাবু ইসতিহবাবি নিকাহি যাতিত দীন

উল্লেখিত হাদীছগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে সংক্ষেপে সংখ্যাটি বলেছেন, তারপর একটি একটি করে সবগুলো বিস্তারিত বলে দিয়েছেন।

২৮. ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে শিক্ষাদান

ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দুটি বা এ জাতীয় আয়াত সমূহের ভিত্তিতে:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদেরই উপকারে আসে।[৮০]

...إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.

...তুমি তো একজন উপদেশদাতা, তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।[৮১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বহু শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তার সাধারণ ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা ভাষণ থেকে। তিনি ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিতেন, শরী'আতের হুকুম-আহকাম, মাসয়ালা-মাসায়িল মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। হাদীছ ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁর এ জাতীয় বহু ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা-ভাষণ সংকলিত হয়েছে। এখানে আমরা আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহতে সংকলিত একটি ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপন করছি।[৮২]

عن عبد الله الرحمن بن عمرو السُّلَمى وحُجْرُبْن حجر قالا : أتينا العِرْباضَ بن سارية، فسلَّمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومُقْتَبِسين، فقال العِرْبَّاضُ : صـــلى

---

৮০. সূরা আয-যারিয়াত-৫৫
৮১. সূরা আল-গাশিয়াহ- ২১-২২
৮২. আবূ দাঊদ, খ. ৪, পৃ. ২৮০-২৮১, কিতাবুস সুন্নাহ; তিরমিযী, খ-৪, পৃ. ১৫০, কিতাবুল 'ইলম; ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১৫, আল-মুকাদ্দিমাহ ও বাবু ইত্তিবায়ি' সুন্নাতিল খুলাফা' আর রাশিদীন আল-মাহদিয়্যীন

بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنَا موْعظةً بليغة، ذرفت منهـــا العيـــون، ووجلتْ منها القلوبُ، فقال قائل : يارسول الله كـــأن هذه موعظةُ مُودِّع؟ فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال :" أوصـــيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حَبْشيًّا، فإنه من يَعِشْ منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، تمسَّكوا بها وعضَّوا عليهـــا بالنواجذ وإياكم ومحْدثاتِ الأمور! فإن كـــلَّ محدثـــة بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلاَلَةٌ.

'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আস-সুলামী ও হুজ্‌র ইবন হুজ্‌র হতে বর্ণিত। তারা বলেন: আমরা দু'জন আল-'ইরবাদ ইবন সারিয়ার (রা) নিকট গেলাম এবং সালাম করে বললাম: আমরা সাক্ষাৎ করতে এসেছি এবং কিছু অর্জন করে ফিরে যাব। আল- 'ইরবাদ (রা) বললেন: একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে, আমাদেরকে প্রাঞ্জলভাষায় ওয়াজ করলেন যা শুনে মানুষের চোখ ভিজে গেল এবং অন্তর বিগলিত হলো।

অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশবাণী? আপনি আমাদেরকে কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনা ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও সে আনুগত্য একজন হাবসী ক্রীতদাসের প্রতিই হোকনা কেন। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা খুব শীঘ্র অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা খুব শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মত ধরে থাকবে। তোমরা দীনের মধ্যে নতুন জিনিস সংযোজন থেকে

দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যেকটি নতুন জিনিস বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং ক্রোধ এত তীব্র আকার ধারণ করতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীর সতর্ককারী। এ অবস্থায় তিনি কখনো বলতেন:

بُعِثتُ أنا والساعة كها تين، و يقرِّن بين إصبعيه: السَّبابه والوسطى.

আমি প্রেরিত হয়েছি। আমি ও কিয়ামাত এই দু'টির মত। অতঃপর তিনি নিজের অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি মিলিত করে দেখান।

আবার অনেক সময় বলতেন:[৮৩]

أما بعد، فإن خير الحديث كتابُ الله، و خير الْهَدْىِ هَدْىُ محمد صلى الله عليه وسلم، و شَرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعةٍ ضلالة.

অতঃপর, সর্বোত্তম কথা হলো, আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ নির্দেশ, নিকৃষ্ট জিনিস হলো (দীনের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবিত কর্মকাণ্ডসমূহ। আর দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাসিত জিনিসসমূহ হলো পথভ্রষ্টতা।

২৯. সুন্দর আচরণ ও মহৎ স্বভাব-চরিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল পদ্ধতিতে মানুষকে শিক্ষা দিতেন তার মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ও সর্বাধিক স্পষ্ট পদ্ধতিটি হলো বাস্তব কাজের মাধ্যমে, চমৎকার স্বভাব-চরিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা। তিনি যখন কাউকে কোন কিছু করার আদেশ করতেন, প্রথমে নিজে তা 'আমল করতেন। মানুষ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমল দেখে যখন তা বুঝে যেত তখন তারা রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণে 'আমল করতো। রাসূলুল্লাহ্র

---

৮৩. মুসলিম খ. ৬, পৃ. ১৫৩, বাবুল জুমআহ; নাসাঈ, খ. ৩, পৃ. ১৮৮ বাবুল ঈদাইন; ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১৭, আল-মুকাদ্দিমা: বাবু ইজতিনাবিল বিদয়ি ওয়াল জাদালি

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বভাব চরিত্র ছিল আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন উত্তম নৈতিকতার ওপর অধিষ্ঠিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:[৮৪]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য নৈতিক চরিত্র, কর্ম ও বাস্তব অবস্থা, সর্বক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। এ ব্যাপারে, কোন সন্দেহ নেই যে, কর্ম ও 'আমলের মাধ্যমে অন্যকে শিক্ষাদান করা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ পদ্ধতি বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর অন্তরের গভীরে প্রোথিত করে। কথা ও বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেয়ে এ পদ্ধতি বিষয়টি বুঝতে, স্মৃতিতে ধারণ করতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক এবং অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান হলো শিক্ষাদানের স্বাভাবিক পদ্ধতি। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমানের বাদশাহ আল-জুলানদা-কে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য 'আমর ইবন আল-'আসকে (রা) পাঠান। তিনি আল-জুলানদা-র দরবারে উপস্থিত হয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

لقد دلني على هذا النبي الأمي : أنه لا يأمر بخير الاكان أول اخذبه، ولا ينهى عن شرّ إلا كان أول تاركٍ له، وأنّه يَغلبُ فَلاَ يَبْطَر، ويُغلَبُ فلا يُهْجُرُ_ أي لايقول القبيح من الكلام، وأنه يفى بالعهد، ويُنْجِزُا الوعد، وأشهد أنه نبى.

এই উম্মী নবীকে আমি চিনেছি তার এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে: তিনি যে

---

৮৪. সূরা আহযাব- ২১

কোন ভালো কাজের আদেশ করেন, তাঁর প্রথম বাস্তবায়নকারী হন তিনি, যে কোন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলেন, তিনিই হন সেই কাজ প্রথম বর্জনকারী, তিনি বিজয়ী হন, কিন্তু গর্ব-অহংকার করেন না, পরাজিত হন, কিন্তু তখন কোন বাজে কথা বলেন না। তিনি অঙ্গীকার পূরণ করেন, প্রতিশ্রুতি পালন করেন। (এ দেখে) আমি সাক্ষ্য দিই, তিনি অবশ্যই একজন নবী।[৮৫]

ইমাম আশ-শাতিবী (রহ) তাঁর আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে বলেন:[৮৬]

إنما كان عليه الصلاة والسلام خُلُقُه القــرآن، لأنــه حكَّم الوحى على نفسه، حتى صار فى علمه وعملــه على وفقه، فكان للوحى موافقا قائلاً مذعنا ملبِّيًا واقفًا عند حُكْمه.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল বাস্তব কুরআন, কারণ তিনি নিজের উপর কুরআনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর জ্ঞানে ও কর্মে কুরআনের অনুসারী হয়ে যান। সুতরাং তিনি ছিলেন ওহীর প্রবক্তা, ওহীর নিকট আত্মসমর্পনকারী ও ওহীর আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তার বিধিবিধানের পাশে অবস্থানকারী।

তাঁর এই বৈশিষ্ট্যই হলো তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তিনি যা আদেশ করেন, নিজে তা পালন করেন, যা নিষেধ করেন, নিজেই তা থেকে বিরত থাকেন। উপদেশ দিলে নিজে সে উপদেশ গ্রহণ করেন, ভীতি প্রদর্শন করলে নিজেও ভীতিগ্রস্তদের প্রথম ব্যক্তিতে পরিণত হন। তেমনিভাবে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের কথা শোনালে তিনিই হন আশাবাদী মানুষের অগ্রগামী ব্যক্তি। এ সবকিছুর মূল রহস্য হলো তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া শরী'আতকে দলীল হিসেবে নিজের ওপর কর্তৃত্বশীল করেন এবং তারই আলোকে জীবন পরিচালনা করেন যাকে আস-সিরাতুল মুসতাকীম-সরল-সোজা পথ বলা হয়েছে।

এ কারণে তিনি সত্যিকারেই 'আবদুল্লাহ' তথা আল্লাহর বান্দা হয়ে যান। এ পৃথিবীতে মানুষ যত নাম ধারণ করুক না কেন এই ''আবদুল্লাহ'' নামটি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত

---

৮৫. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ. ১, পৃ. ৫৩৮; আর-রাসূল আল-মু'আল্লিম, পৃ. ৬৬

৮৬. আল-ই'তিসাম, খ. ২, পৃ. ৩৩৯-৩৪০, আর-রাসূল আল-মু''আল্লিম, পৃ. ৬৬

নাম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনের একাধিক স্থানে রাসূলুল্লাহ্কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই 'আবদ' নামেই অভিহিত করেছেন। যেমন:

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মাসজিদুল হারাম হতে...।[৮৭]

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন।[৮৮]

وَإِنْ كُنتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُوْرَةٍ مِّن مِّثْلِهٖ...

আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তার অনুরূপ কোন সূরা আন...।[৮৯]

এই যখন অবস্থা তখন সৃষ্টি জগতের উপর শরী'আতের কর্তৃত্বশীল হওয়া অধিকতর সঙ্গত এবং তাদের জন্য তা এমন আলোকবর্তিকা হওয়া উচিত যা দ্বারা তারা সত্যের পথে চলতে পারে। এই শরী'আতের বিধিবিধানকে তারা যত বেশি পরিমাণ নিজেদের উপর বাস্তবায়ন করবে তত বেশি তারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। বিশ্বাস, কথা ও কাজে তারা হবে শরী'আতের আনুগত্যশীল, কেবল বুদ্ধি-বিবেকের নয়। এতেই তাদের প্রকৃত মর্যাদা। আল্লাহ তো বলেছেন, একমাত্র তাকওয়ার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা, অন্য কিছুতেই নয়। তিনি বলেন:

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...

...তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী...।[৯০]

সুন্দর আচরণ ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক প্রয়োগকৃত ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত শিক্ষা পদ্ধতি। হাদীছে এর বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এখানে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

---

৮৭. সূরা আল-ইসরা'-১
৮৮. সূরা আল-ফুরকান-১
৮৯. সূরা আল-বাকারা-২৩
৯০. সূরা আল হুজুরাত-১৩

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- একদিন খেজুরের কাঁদির একটি শুকনো দন্ড হাতে করে আমাদের এই মাসজিদে আসলেন। তারপর মাসজিদে কিবলার দিকে কিছু কফ্ দেখতে পেলেন। তিনি সেই শুকনো দন্ড দিয়ে তা ঘষে ফেলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন:

أَيُّكم يحب أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قال : فَخَشَعْنَا، ثم قال : أَيُّكُم يُحِبُّ أن يُعْـرِضَ الله عنـــه؟ قلنـــا : لا أَيُّنـــا يارسول الله.

তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন? জাবির বলেন: আমরা সবাই মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আবার বললেন: তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন? আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউই তা চায় না।

তখন তিনি বললেন:

فإنَّ أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلايبْصُقَنَّ قِبَلَ وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، فَلْيَفُلْ بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض – وفى رواية أبى داود : ووضع ثوبه على فيه ثم دلكه.

তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তার সামনে থাকেন। সুতরাং সে অবশ্যই না তার সামনের দিকে, না ডান দিকে কফ-থুথু ফেলবে। ফেলবে বাম দিকে বাম পায়ের নিচে। যদি খুব তাড়াতাড়ি ফেলার প্রয়োজন হয় তাহলে তার কাপড়ে এভাবে ফেলবে। তারপর তিনি নিজের কাপড়ের একাংশ আরেক অংশের উপর ভাঁজ করেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিজের কাপড় নিজের মুখের উপর রেখে ঘষা দেন।

তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা আমাকে কিছু সুগন্ধি দাও। তখন মহল্লার এক যুবক দৌড়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাতে করে কিছু সুগন্ধি

আনলো! রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হাতে নিয়ে খেজুর দণ্ডটির মাথায় লাগিয়ে কফের দাগ যেখানে লেগে ছিল সেখানে ঘষা দেন। (যাতে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়)।[৯১]

এই হাদীছে উম্মাতের জন্য শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে। যেমন:

১. শ্রোতা বা শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টি ভালো মত প্রতিষ্ঠার জন্য কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।

২. নিজে করে শিক্ষার্থীকে শিখিয়েছেন। এটাই শিক্ষাদানের উত্তম পদ্ধতি।

৩. নিজ হাতে কফ পরিষ্কার করে শিক্ষক হিসেবে নম্রতা ও উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

৪. শুধু কাজের মাধ্যমে শেখান নি, মুখেও বলে দিয়েছেন।

সুলায়মান ইবন বুরাইদা (রা) তাঁর পিতা বুরাইদার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট সালাতের ওয়াকত সম্পর্কে জানতে চাইলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন:

'তুমি আমাদের সাথে এই দু'দিন সালাত আদায় কর।'- صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ.

যখন সূর্য হেলে গেল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে নির্দেশ দিলেন, সে আযান দিল। তারপর আবার নির্দেশ দিলেন, সে ইকামত দিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতুজ জুহর আদায় করলেন। তারপর বিলালকে আবার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সালাতুল 'আসর আদায় করলেন। সূর্য তখন দিগন্তের ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল পরিষ্কার। তারপর তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সালাতুল মাগরিব আদায় করলেন- সূর্য তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং সালাতুল 'ঈশা আদায় করলেন-তখন আকাশের পশ্চিম দিগন্তের লালিমা দূর হয়ে গেছে। তারপর আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি প্রভাতের সূচনা প্রকাশিত হওয়ার পর সালাতুল ফজর আদায় করলেন।

দ্বিতীয় দিন আসলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে (রা) আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সালাতুজ জুহর দেরিতে আদায় করলেন। সালাতুল 'আসর সূর্য উপরে থাকতেই আদায় করলেন। তবে পূর্ব দিনের চেয়ে দেরিতে। আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে সালাতুল মাগরিব এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সালাতুল 'ঈশা এবং আকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর

---

৯১. মুসলিম, খ. ১৮, পৃ. ১৩৬, কিতাবুয যুহদ: বাবু হাদীছি জাবির; আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৩১, কিতাবুস সালাত: বাবুন ফী কারাহিয়াতিল বুযাক ফিল মাসজিদ

সালাতুল ফজর তিনি আদায় করেন। তারপর বলেন:[৯২]

أين السائل عن وقتت الصلاة؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله، قال، وقت صلاتكمْ بين مارأيتم.

সালাতের ওয়াকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: (এ দু'দিন) তোমরা যা দেখলে, তোমাদের সালাতের ওয়াকত এর মাঝখানে।

ইমাম আন-নাবাবী (রহ) বলেন:[৯৩]

ففى هذا الحديث البيانُ بالفعل، فإنه أبلغُ فى الإبضاح، والفعلُ تعُمَّ فائدتُه السائل وغيره، وفيه تأخرُ البيان إلى وقت الحاجة.

এই হাদীছে কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা-বিবরণ এসেছে। আর এটাই হলো ব্যাখ্যা- বিবরণের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। কর্মের উপকারিতা প্রশ্নকারী ও অন্যদেরকেও শামিল করে। হাদীছে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত কোন কিছুর ব্যাখ্যা বিলম্ব করা যায়, সে কথা জানা যায়।

আরেকটি হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলো! ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওজু কিভাবে করতে হয়? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখে কোন জবাব না দিয়ে একটি পাত্রে পানি আনালেন। সেই পানি দ্বারা নিজের দু'হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ও দু'হাত তিনবার ধুইলেন। তারপর মাথা মাসাহ (স্পর্শ) করলেন। দুই শাহাদাত অঙ্গুলি দু'কানের মধ্যে দিলেন, দুই বৃদ্ধা অঙ্গুলি দ্বারা দু'কানের বহির্ভাগ এবং দু'শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা দু'কানের অভ্যন্তর ভাগ স্পর্শ করলেন। তারপর দু'পা তিনবার তিনবার করে ধুইলেন, তারপর বললেন: هكذ الوضوء ওজু এ রকম।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন:[৯৪]

---

৯২. মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ১১৪, কিতাবুল মাসাজিদ: বাবু আওকাতিস সালাওয়াত আল-খামসা, তিরমিযী, কিতাবুস সালাত: নাসাঈ, খ. ১, পৃ. ২৫৮, কিতাবুল মাওয়াকীত (আওয়ালু ওয়াকতিল মাগরিব); ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ২১৯, কিতাবুস সালাত

৯৩. ইমাম নাওয়াবী, শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ১১৪

هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم، أو : ظلم وأساءَ.

ওজু এ রকম। কেউ এর বেশি অথবা কম করলে সে পাপ করবে ও যুলম করবে অথবা যুলম ও পাপ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্নকারীকে মুখে কোন জবাব না দিয়ে কর্মের মাধ্যমে বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দেন।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সালাতের ইমামতি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, পেছনের মুক্তাদীরা সকলে তাঁর কর্যক্রম দেখে যাতে শিখতে পারে। সাহল ইবন সা'দ আস্ সা'ঈদী বলেন:[৯৫]

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، فاستقبل القبلة، وكبرّ، وقام الناسُ خلفهُ فقرأ وركع، وركع الناسُ خلفهُ، ثم رفع رأسهُ، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ ثم ركع، ثم رفع رأسهُ، ثم رجع القهقَرى حتى سجد بالأرض، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بى، ولتعلّموا صلاتى.

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছি, তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। তারপর কিবলমুখী হয়ে তাকবীর দিলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি কুরআন পাঠ করলেন, রুকু করলেন। পেছনের লোকেরাও রুকু করলো। তারপর তিনি পেছনের দিকে সরে আসলেন এবং মাটির উপর সিজদা করলেন। তারপর আবার মিম্বরে ফিরে গিয়ে কুরআন পাঠ করলেন, রুকু করলেন, মাথা উঁচু

---

৯৪. আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩৩, কিতাবুত তাহারাহ: বাবুল ওয়াদূয়ি ছালাছান ছালাছান, নাসাঈ, খ. ১, পৃ. ৮৮, ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১৪৬

৯৫. আল বুখারী, খ-১, পৃ- ৪০৯, কিতাবুস সালাত: বাবুস সালাত ফিস সুতূহি ওয়াল মিম্বরি ওয়াল খাশাবি; খ. ২, পৃ. ৩৩১, কিতাবুল জুমআহ: বাবুল খুতবাহ আলাল মিম্বরি; মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ৩৫, কিতাবুল মাসাজিদ: বাবু জাওয়াযিল খুতওয়াতি ফিস সালাত

করলেন, তারপর পেছনে সরে এসে মাটিতে সিজদা করলেন। সালাত শেষ করে মানুষের দিকে ফিরে বলেন: ওহে জনমণ্ডলী! আমি এমনটি করেছি, যাতে তোমরা আমার ইকতিদা করতে পার এবং আমার সালাত আদায় শিখতে পার।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আন-নাওয়াবী (রহ) বলেন:[৯৬]

فبيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن صـــعوده المنبـــر، وصلاته عليه، إنما كان للتعليم، ليرى جميعُهم أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخـــلاف مـــا إذا كـــان علـــى الأرض، فإنه لايراه إلا بعضهم ممن قرب منه.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তার মিম্বরের উপর উঠা ও সালাত আদায় করা তা কেবল তাদের শিক্ষাদানের জন্য, যাতে তাদের সকলে তাঁর কর্মকাণ্ড দেখতে পারে। পক্ষান্তরে যখন তিনি মাটিতে সালাত আদায় করেন তখন কেবল তাঁর নিকটবর্তী কিছু লোকই তাঁকে দেখতে পারেন।

ইবন হাজার 'আসকালানীও (রহ)-একই কথা বলেছেন।[৯৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরেকটি কর্মের উল্লেখ করে বিষয়টির সমাপ্তি টানতে চাই। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত:[৯৮]

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يَسْـــلُخُ شاةً فقال له رسول الله صلى الله عليه وســـلم : تَـــنَحَّ حتى أريَكَ، فأدخَلَ رسول الله صلى الله عليه وســـلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى تـــوارَت إلـــى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلُخْ، ثم مضى وصـــلى للناس ولم يتوضَّأ.

---

৯৬. ইমাম নাওয়াবী, শারহু সাহীহু মুসলিম, খ. ৫, পৃ, ৭৫
৯৭. ফাতহুল বারী, খ-২, পৃ, ৩৩১
৯৮. আবূ দাউদ, বাবুল ওয়াদূয়ি মিন মাসসিল লাহমি; ইবন মাজাহ খ-২, পৃ. ১০৬১, কিতাবুয যাবায়িহ: বাবুস সালখি

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলার পথে একটি ছেলেকে ছাগলের চামড়া ছড়াতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন: সরে যাও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চামড়া ও গোশতের মাঝখানে নিজের হাত এমনিভাবে ঢুকিয়ে দিলেন যে তা বগল পর্যন্ত তলিয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন: ছেলে! তুমি এভাবে ছড়াও। এরপর তিনি চলে যান এবং মানুষের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তিনি ওজু করেন নি।

ছাগলের চামড়া কিভাবে ছড়াতে হয় তা তিনি বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতে যান নি, বরং কর্মের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন।

৩০. লজ্জাজনক কোন বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম ভূমিকার অবতারণা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে যখন এমন কোন বিষয় শিক্ষাদানের ইচ্ছা করতেন যা বিস্তারিত বর্ণনা করতে কিছুটা লজ্জা ও সংকোচবোধ করতেন তখন অনেক সময় একটা ছোট্ট অথচ সূক্ষ্ম ভূমিকার অবতারণা করতেন। তারপর বিষয়টি বলে দিতেন। যেমন পেশাব-পায়খানা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে বসতে হবে এবং কিভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে তা বিস্তারিত বলা কিছুটা লজ্জা ও সংকোচের বিষয়। তাই তিনি একটি ছোট্ট অথচ চমৎকার ভূমিকার অবতারণা করে বিষয়টি শেখাচ্ছেন এভাবে:[৯৯]

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنالكم مثلُ الوالد لولده أعلمُكم، إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث، والرّمّة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি তোমাদের জন্য তেমন, যেমন একজন পিতা তার সন্তানের জন্য। আমি তোমাদেরকে শেখাই। তোমরা যখন পেশাব-

---

৯৯. ইবন মাজাহ, খণ্ড. ১, পৃ. ১১৪; কিতাবুত তাহারাহ: বাবুল ইসতিনজায়ি বিল হিজারাহ, নাসাঈ, খ. ১, পৃ. ৩৮, আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩০

পায়খানায় যাবে তখন না কিবলামুখী হয়ে, আর না কিবলার দিকে পেছন দিয়ে বসবে। তিনি তিনটি পাথর দিয়ে (পরিচ্ছন্ন হওয়ার) আদেশ করেছেন। গরুর গোবর, ঘোড়া-ছাগলের লেদী এবং হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন ডান হাত দিয়ে পরিচ্ছন্ন হতে।

পেশাপ-পায়খানা বিষয়ে কিছু বলতে ও শুনতে মানুষ স্বভাবতই সংকোচবোধ করে, এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ বিষয়ে কথার শুরুতেই ছোট্ট অথচ চমৎকার একটি ভূমিকা দিয়ে কথা বলেছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা) তথা মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক একজন পিতার তার সন্তানের সাথে সম্পর্কের মত। পিতা যেমন স্নেহ-মমতার সাথে সন্তানকে ভালো-মন্দ সবকিছু শিখিয়ে থাকে, তেমনি তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ-মমতার কারণে তোমাদের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ-অকল্যাণ কিসে তা শেখাতে আমি কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ করি না। এই ছোট্ট ভূমিকাটির কারণে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের দ্বিধা-সংকোচভাব দূর হয়ে যায়।

৩১. লজ্জাজনক কোন বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপস্থাপন ও ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো এমন করতেন, আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত নিম্নের হাদীছটির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।[১০০]

عن عائشة رضى الله عنها : أنَّ أسْمَاءَ بنت شــكل، سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلىَّ الله عليه قسلم عن غُسل المحيض؟ فقال : تأخُذُ إحْداكُنَّ مَاءَها، فتَدْلُكُه دَلكًا شديدًا حتـــى تَبْلُغَ شُؤُنَ رأسِهَا، ثم تَصُبُّ عليها الماءَ، ثم تَـــأْخُـــذُ فرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطِهَّرُبها.

---

১০০. আল বুখারী, কিতাবুল হায়দঃ বাবু দালকিল মারআতি নাফসাহা ইজা তাতাহ্হারা মিনাল হায়দ; মুসলিম, কিতাবুল হায়দ

فقالت أسْماءُ : وكيف نَطَهَّرُبِها؟ قـــال : ســبحان الله تَطَهَّرينَ بها، فقالت عائشة – وكأنها تُخفـــى ذلـــك : تتبعى أثر الدَّم.

وَسَألتْهُ عن غُسْلِ الجنابة؟ فقال : تأخُذُ مَـــاءً فتطهـــرُ فتُحْسنُ الطُّهور، أو : تُبلغُ الطَّهورَ، ثم تَصُبُّ علـــى رأسها فتد لُكُهُ حتى يَبْلُغَ شُؤُونَ رأسِها، ثـــم تفـــيضُ عليها الماءَ فقالت عائشة : نعم النساء نِساءُ الأنصار، لم يَمْنَعْهُنَّ الحياءُ أن يَتَفَقَّهْنَ فى الدين.

'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। আসমা বিনত শাকাল নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট ঋতুস্রাব শেষ হলে কিভাবে গোসল করতে হবে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন: তোমাদের যে কেউ পানি ও সিদর (বরই) গাছের পাতা নেবে, তারপর পরিচ্ছন্ন হবে। পরিচ্ছন্ন হবে খুব ভালো রকম। তারপর মাথায় পানি ঢালবে এবং চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি না পৌঁছা পর্যন্ত ভালো করে ঘষবে। তারপর আবার মাথায় পানি ঢালবে। তারপর অল্প কিছু সুগন্ধি যুক্ত তুলো নিয়ে তা দ্বারা পরিচ্ছন্ন হবে।

আসমা বললো: তুলো দ্বারা কিভাবে পরিচ্ছন্ন হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পরিচ্ছন্ন হবে। বর্ণনাকারী বলেন: কেউ যেন না শুনতে পায় এমন নিচু গলায় 'আয়িশা (রা) আসমা কে বললেন: রক্ত বের হওয়ার স্থানে তুলো ভালো মত ঘষবে (যাতে গন্ধ দূর হয়ে যায়)।

সে (আসমা) জানাবাত তথা অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, পানি নেবে, অতঃপর পরিচ্ছন্ন হবে এবং ভালো মত পরিচ্ছন্ন হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে ভালো মত ঘষবে যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আবার পানি ঢালবে। 'আয়িশা (রা) বলেন:

আনসারদের নারীরা কত না সুন্দর! দীনের বিষয় জানতে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি, আসমা বিনত শাকালের (রা) সুগন্ধিযুক্ত তুলো দিয়ে কিভাবে পরিচ্ছন্ন হবে এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল বিস্ময় বোধক সুবহানাল্লাহ তাসবীহটি উচ্চারণ করেছেন। কারণ যে স্থানে সেটি ব্যবহার করতে হবে তা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ করেছেন। তিনি বিস্ময়ের সুরে তাসবীহ উচ্চারণ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার মত বয়স্কা মহিলাদের তা জানা থাকার কথা।

এই হাদীছ থেকে আমরা অনেকগুলি শিক্ষা লাভ করতে পারি:

১. গোপন ও লজ্জাজনক বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইশারা-ইঙ্গিতে বলা ভালো।

২. মহিলাদের একান্ত গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য 'আলিমের নিকট জিজ্ঞেস করতে কোন দোষ নেই।

৩. প্রশ্নকারীকে বুঝানোর জন্য প্রয়োজন হলে উত্তরের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৪. 'আলিমের উপস্থিতিতে তার ইঙ্গিতময় কথা যে বুঝতে না পারে, অন্য কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারে।

৫. উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অধমের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। যেমন 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিতিতে আসমা বিন শাকাল (রা) করেছিলেন।

৬. শিক্ষার্থীর সাথে কোমল আচরণ করতে হবে। বক্তব্য বুঝতে অক্ষম হলে রূঢ় আচরণ করা যাবে না।

৭. নারীদের দেহে জন্মগত কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে গোপনে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন এই হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সুগন্ধিযুক্ত তুলো ব্যবহার করতে বলেছেন।

৩২. অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের সময়ে কঠোর ও উত্তেজিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন শিক্ষার্থীকে এমন সব বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে এবং এমন সব প্রশ্ন করতে দেখতেন যা করা তার জন্য উচিত নয়, তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ ও কঠোর হয়ে যেতেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) বলেন:[১০১]

---

১০১. মুসনাদ আহমাদ, খ, ২, পৃ. ১৯৬; আর-রাসূলুল মু''আল্লিম পৃ. ২১০

خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أصـــحابه وهم يختصمون فى القدر، فكأنما يُفْقَأُ فى وجهه حَبُّ الرُّمَّان من الغضب، فقال : بهـــذا أمــــرتُمْ؟ أو لهـــذا خُلِقْتُمْ؟ تضربون القران بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، بهذا هَلَكَـــتْ الأمَمُ قبلكم.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের নিকট গেলেন। তখন তারা 'কদর' বিষয়ে বিতর্ক করছিলেন। রাগে তাঁর চেহারা ডালিমের দানার মত লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন: তোমাদেরকে কি এ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? অথবা তোমাদেরকে কি এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের একাংশ দিয়ে আরেক অংশকে আঘাত করছো। এরূপ কাজের জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:[১০২]

خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنازعُ فى القدر، فغضب حتى احْمَرَّ وجهه، حتى كأنما فُقِئَ فى وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّان، فقال : أبهـــذا أُمــــرتُمْ؟ أم بهـــذا أرسلْتُ إليكُمْ؟ إنما هَلَكَ من كان قبلكم حين تنــــازعوا فى هذا الأمر، عزمتُ عليكم، عَزَمْــــتُ علـــيكم، أن لاتتازعوا فيه.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন 'কদর' বিষয়ে বিতর্ক করছিলাম। তিনি এত রেগে গেলেন যে, তাঁর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। যেন তাঁর দু'গন্ডে ডালিমের দানা

১০২. তিরমিযী, বাবুল কাদার; আর-রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ২১১

রেখে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদেরকে কি এ কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? না আমাকে এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখন এ বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে তখন ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদের জন্য আবশ্যিক করে দিচ্ছি, আমি তোমাদের জন্য অপরিহার্য করে দিচ্ছি, যেন তোমরা এ বিষয়ে বিতর্ক না কর।

৩৩. একই সঙ্গে মুখে বলা ও হাত দিয়ে ইশারার মাধ্যমে শিক্ষাদান

শিক্ষনীয় বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের নিকট তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তিনি মাঝে মাঝে মুখে বলার সাথে সাথে হাত দ্বারা ইশারাও করতেন। এ ধরনের অনেক হাদীছ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি উপস্থাপিত হলো:

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضه بعضًا.

একজন মু'মিনের আরেকজন মু'মিনের সম্পর্ক হলো একটি ভবনের মত যার একাংশ আরেক অংশকে শক্তভাবে বেঁধে রাখে।

একথা বলে তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে বিজড়িত করে শক্ত বাঁধুনিটা দেখিয়ে দেন।[১০৩]

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একথাও এসেছে:[১০৪]

لو أنِّى استقبلْتُ من أمرى ما استدبرتُ، لم أسُقْ الْهَدْىَ، وجعلتُها عُمْرَةً، فمن كان منكم ليس معه هَدْىٌ فليحل وليَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشم

---

১০৩. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলমঃ বাবু নাসরিল মাজলুমঃ বাবু তা'আওনিল মু'মিনীন বা'দুহুম বা'দান; মুসলিম, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতিঃ বাবু তারাহুমিল মু'মিনীন ওয়া তা'আতুফিহিম ওয়া তা'আদুদিহিম

১০৪. মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জঃ বাবু হাজ্জাতিন নাবিয়্যি

فقال : يا رسول الله، أَلِعامنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واجدة فى الأخـــرى وقال : دَخَلَتْ العُمرةُ فى الحج، دجلت العمـــرةُ فـــى الحح، لا، بل لأبدٍ أبدٍ.

আমি আমার কোন কাজে অগ্রসর হলে পেছনে ফিরি না। আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনি নি। আমি এটাকে 'উমরা করেছি। তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে 'উমরা করে নেয়। সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বিধান কি শুধু এ বছরের জন্য, না চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন: 'উমরা হজ্জের মধ্যে ঢুকে গেছে এভাবে; 'উমরা হজ্জের মধ্যে ঢুকে গেছে এভাবে। শুধু এ বছরের জন্য নয়, বরং চিরকালের জন্য।

সুরাকা ইবন মালিকের (রা) প্রশ্নের কারণ হলো, জাহিলী যুগে হজ্জের মাসসমূহে 'উমরা নিষিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হজ্জের সাথে 'উমরার বিধান দিলেন, তখন তিনি জানতে চাইলেন তা কেবল এ বছরের জন্য কি না? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুলের মধ্যে আংগুল ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এভাবে হজ্জের মধ্যে 'উমরা ঢুকে গেছে।[১০৫]

সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ঈদী (রা) বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

أنا و كافل اليتيم فى الجنَّة كها تين.

আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে অবস্থান করবো এভাবে।

একথা মুখে বললেন, আর নিজের অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি সোজা করে মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে সে দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এভাবে :[১০৬]

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমরা কুরাইশ বংশের প্রায় আশিজন পুরুষ

---

১০৫. ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ৪৮৫; আন-নাওয়াবী, শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৮, পৃ. ১৬৬

১০৬. আল বুখারী, কিতাবুত তালাক: বাবুল লি'আন, কিতাবুল আদাব: বাবু ফাদলি মান ই'উলু ইয়াতীমান

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। কুরাইশ বংশের বাইরের কেউ ছিল না। আল্লাহর কসম! সেদিন তাদের চেহারার যে সৌন্দর্য দেখছিলাম তার চেয়ে বেশি সৌন্দর্য কোন পুরুষের চেহারায় আমি আর কখনো দেখিনি। তারা মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করলো, তাদের বিষয়ে কথা বললো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাদের সাথে কথা বললেন। এমন কি আমি চাচ্ছিলাম, তিনি চুপ থাকুন। অতঃপর তাঁর নিকট গেলাম, তিনি "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করে এই কথাগুলো বলেন:[১০৭]

أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمـــر، مـــالم تعصوا الله تعالى، فإذا عصيتموه بَعَـــثَ إلـــيكم مـــن يَلْحاكم كما يُلحْىَ هذا القضيب.

অতঃপর ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা! যতদিন তোমরা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করবে, এই বিষয়ের অধিকারী তোমরাই থাকবে। যখন তোমরা অবাধ্যতা করবে তখন তিনি তোমাদের নিকট এমন কাউকে পাঠাবেন যে তোমাদের ছাল তুলে ফেলবে যেরূপ এই ডালটির ছাল তুলে ফেলা হয়।

নিজের হাতের ডালটির দিকে ইঙ্গিত করে কথাটি বলেন। তারপর তিনি ডালটির ছাল তুলে ফেলেন। তখন সেটা উজ্জ্বল সাদা দেখাচ্ছিল।

عن سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه قـــال : قلتُ يا رسول الله حدَّثنى بأمرٍ أعْتَصمُ به، قال : قُلْ : ربِّىَ الله، ثم استَقِمْ. قلتُ : يا رسول الله، ما أخـــوف ماتخافُ عَلَىَّ؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وســـلم بلسان نفسه ثم قال : هذا.

সুফইয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ আছ-ছাকাফী (রা) বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে পারি। তিনি বললেন: বল, আল্লাহ আমার রব। তারপর এটার উপরই অটল থাক। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ!

---

১০৭. মুসনাদু আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৪৫৮; আর-রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ১২৩

আমার ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি আশংকা করেন কিসের? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত দিয়ে নিজের জিহ্বাটি ধরলেন, তারপর বললেন: এটি।[১০৮]

عن ابن عباس رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عمن قدّم شيئًا قبل شيئٍ، وشيئًا قبل شئ؟ قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبه وقال : لاحَرَجَ، لا حَرَج.

ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কুরবাণীর দিন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে হজ্জের কিছু কাজ আগে পিছে করে ফেলেছে। অর্থাৎ পরের কাজ আগে এবং আগের কাজ পরে করেছে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'হাত উঁচু করে বললেন: কোন অসুবিধা নেই, কোন বাধা নেই।[১০৯]

عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تُدْنى الشَّمْسُ يومُ القيامةِ من الْخَلْق، حتى تكونَ منهم كمقدار مَيْلٍ، فيكون الناسُ على قدْر أعمالهم فى الْعَرَق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكونُ إلى رُكْبتَيْه، منهم من يكون إلى حِقْوَيْهِ، ومنهم من يُلْجُمه العَرَقُ إلْجَامًا، وأشار رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.

আল মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

---

১০৮. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান: বাবু জামিয়ি আওসাফিল ইসলাম, তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬০৭, কিতাবুয যুহদ: বাবু মাজাআ ফী হিফজিল লিসান

১০৯. দারুকুতনী, সুনান, কিতাবুল হাজ্জ, খ. ২, পৃ. ২৫২

কিয়ামাতের দিন সূর্যকে সৃষ্টি জগতের নিকটবর্তী করা হবে। এমন কি তা তাদের থেকে এক মাইলের মত দূরত্বে থাকবে। ফলে মানুষ নিজ নিজ 'আমল তথা কর্ম অনুযায়ী ঘামের মধ্যে অবস্থান করবে। কারো ঘাম হবে তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত, কারো ঘাম হবে তার দু'হাঁটু পরিমাণ, কারো হবে তার কোমরে লুঙ্গি বাঁধার স্থান বরাবর এবং তাদের কারো মুখে ঘাম লাগাম পরিয়ে দেবে। একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের একটি হাত দিয়ে স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করেন।"[১১০]

عن عقْبَةَ بن عَامرٍ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَدنُو الشَّمْسُ من الأرض، فيعْرقُ النَاسُ ! فَمِنَ النَاس من يَبْلُغُ عَرَقُــه كعبَيْــهِ، وَمِنهم من يَبْلُغُ عَرَقُه إلى رُكبتيهِ، ومنهم من يَبْلُغُ إلى الفخذ، ومنهم من يبلُغُ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ إلى عُنُقه، ومنهم من يبلغ إلى وسط فيه، وأشار عُقْبَةُ بيده فألْجَمَ فاه، وقال : رأيتُ رســول الله صــلى الله عليه وسلم يُشِيْرُ هكذا، ومنهم مــن يُغَطِّيْــهِ عرقُــه، وضَربَ بيده، إشارة.

'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সূর্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হবে। সুতরাং মানুষ ঘামতে থাকবে। কিছু মানুষের ঘাম তাদের দু' গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কিছু মানুষের দু'হাঁটু পর্যন্ত, কিছু মানুষের কোমর পর্যন্ত, কিছু মানুষের গলা পর্যন্ত এবং কিছু মানুষের মুখের মাঝখান পর্যন্ত তাদের ঘাম পৌঁছবে। তারপর 'উকবা (রা) নিজের হাত দিয়ে ইশারা করেন এবং মুখ লাগাম পরানোর মত বন্ধ করে দেন। তারপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এভাবে ইশারা করতে দেখেছি।

---

১১০. মুসলিম, কিতাবুল জান্নাতি ওয়া না'ঈমিহা: বাবুন ফী সিফাতি ইওমিল কিয়ামাহ

আর কিছু মানুষকে তার ঘাম ঢেকে দেবে। তারপর হাত দিয়ে তিনি মাথার উপর পর্যন্ত ইঙ্গিত করেন।[১১১]

৩৪. যৌক্তিক আলোচনা ও মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে মানুষকে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মন-মানসে কোন অসার চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে থাকলে তা দূর করা অথবা কোন সত্যকে তার বা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন।

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত

আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন: একজন যুবক রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে যিনা (ব্যভিচার) করার অনুমতি দিন। উপস্থিত লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললো: থাম, থাম! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কাছে এসো। সে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে গিয়ে বসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এ কাজ পছন্দ করবে? সে বললো: না, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিত করুন! কোন মানুষই তার মায়ের জন্য পছন্দ করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার মেয়ের জন্য এ কাজ পছন্দ করবে? সে বললো: না, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিত করুন। কোন মানুষই তার মেয়ের জন্য এ কাজ পছন্দ করবে না।

তিনি বললেন: তুমি কি তোমার বোনের জন্য এ কাজ পছন্দ করবে? যুবকটি পূর্বের মত উত্তর দিল। তিনি বললেন: তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য এ কাজ পছন্দ করবে? যুবকটি একই উত্তর দিল। তিনি আবার বললেন: তুমি কি তোমার খালার জন্য এ কাজ পছন্দ করবে? যুবক একই উত্তর দিল।

আবূ উমাম আল-বাহিলী (রা) বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

১১১. আল-হায়ছামী, মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা যাওয়ায়িদ ইবন হিব্বান আলা 'আস-সাহীহায়ন" পৃ. ৬৪; আর-রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ১২৯

সাল্লাম) নিজের হাত যুবকের শরীরের উপর রেখে এই দু'আ করেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.

হে আল্লাহ! তুমি তার পাপ ক্ষমা করে দাও, তার অন্তর পবিত্র কর এবং তার লজ্জাস্থান হিফাযত কর।

আবূ উমামা (লা) বলেন: এরপর থেকে ঐ যুবক আর কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নি।[১১২]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনার কদর্যতা সম্পর্কিত কুরআনের কোন আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দিয়ে তার অন্তর থেকে এই জঘন্য কাজের প্রতি আসক্তি দূর করার চেষ্টা করেন নি। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এবং যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে তার বিবেককে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছেন এবং তাতে সফল হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল আজহা অথবা 'ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে গেলেন এবং মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন: ওহে নারী সম্প্রদায়! তোমরা দান কর। কারণ আমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশ হিসেবে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে। তারা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে? বললেন: তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর সকল অনুগ্রহ অস্বীকার কর। আমি তোমাদের ছাড়া বুদ্ধি ও দীনের অপূর্ণতা আছে এমন কাউকে দেখিনি যারা দৃঢ়-সংকল্প পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করতে পারে।

তারা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কী? বললেন: একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয় কি? তারা বললো: হ্যাঁ, অর্ধেক। তিনি বললেন: এই হলো তার বুদ্ধির অপূর্ণতা। আর যখন তার হায়েজ (মাসিক) হয়, তখন কি সে সালাত আদায় ও সাওম পালন থেকে বিরত থাকে না? তারা বললো: হ্যাঁ, বিরত থাকে। তিনি বললেন: এটাই হলো তার দীনের অপূর্ণতা।[১১৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুদ্ধিবৃত্তিক তুলনা ও আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের ত্রুটিগুলো বুঝিয়ে দেন।

---

১১২. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আল-হায়ছামী, মাজমা'উ আয-যাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ১২৯

১১৩. আল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৪৫, কিতাবুল হায়দ: বাবু তারকিল হায়িদু আস-সাওমা; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৭, কিতাবুল ঈমান: বাবু বায়ানি নুকসানিল ঈমান বিনুকসানিত তা'আত

৩৫. উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় উদ্দীষ্ট ভাব ও বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান খুবই ফলপ্রসূ বলে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট স্বীকৃত। এতে দূরের জিনিসকে নিকটে, কাল্পনিক বিষয়কে ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য ও যৌক্তিক বিষয়কে দৃষ্টিগোচর করে তোলা হয়, ফলে তা শিক্ষার্থীর বোধগম্য হওয়ার জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক যা বলতে চান শিক্ষার্থী অতি সহজে তা বুঝতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদদের মতে বাগ্মিতা শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত দানের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এর দ্বারা ভাব ও অর্থের অস্পষ্টতা দূর হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র কালামে বহু দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উপদেশবাণী, বক্তৃতা-ভাষণ ও সাধারণ কথা-বার্তায় প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ জাতীয় কথার অনেকগুলো স্বতন্ত্র সংকলন অনেকে তৈরি করেছেন। তার মধ্যে হাফিয আবুল হাসান আল-'আসকারী (মৃ. ৩১০ হি.), আবূ আহমাদ আল-'আসকারী ও কাজী আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন 'আবদির রহমান আর-রামাহুরমুযী-এর সংকলনগুলি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাছাড়া হাদীছের সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ জাতীয় কথামালা লক্ষ্য করা যায়। এখানে তার থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:[১১৪]

مَثَلُ المؤمن الذى يقرأ القران مَثَلَ الأُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. ومثلُ المؤمنِ الذى لايقرأ القرانَ كمثل التَّمرَةَ، طعمها طيب ولاريحها، ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريْحَانَهِ، رِيُحَا طيب وطعمها مُرٌّ، ومثلُ الفَاجحر الذى لايقرأ القرانَ كَمثل الحَنْظَلَه، طعمُها مُرٌّ ولاريح لها.

যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত হলো 'উতরুজ্জা' ফল,

---

১১৪. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাবঃ বাবু মান ই'উমারু আন ইউজালিসা; আর-রাসূলুল মু''আল্লিম, পৃ. ১১৩

যার ঘ্রাণও ভালো এবং স্বাদও ভালো। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হলো পাকা খেজুর, যার স্বাদ তো ভালো কিন্তু কোন ঘ্রাণ নেই। আর একজন পাপী ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত হলো 'রায়হানা' ফুল, যার ঘ্রাণ তো ভালো, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। অনুরূপভাবে যে পাপী ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হলো 'হানজালা' ফল, যার স্বাদ তিক্ত এবং যার কোন ঘ্রাণ নেই।

তিনি আরো বলেছেন:

ومثل الجليس الصَّالح كمثل صاحب المِسْكَ، إن لم يُصِبْكَ منه شئ، أصابك من ريحه. مثلُ جليس السَّوْءِ كصاحب الكير، إن لم يُصِبْكَ من سواده أصابك من دخانه.

একজন সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো মিশকের মালিক, তুমি তার থেকে কিছু না পেলেও তার থেকে কিছু সুগন্ধি পাবে। আর একজন অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো হাফরের মালিক, তার কালো রং তোমাকে স্পর্শ না করলেও তার ধোঁয়া তোমাকে স্পর্শ করবে।

মানুষকে কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে সতর্ক করণের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই উপমা ও দৃষ্টান্তধর্মী বক্তব্য একটি চমৎকার পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শ্রোতা অতি সহজেই বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ বাণীতে জ্ঞানী-গুণী ও সৎকর্মশীল মানুষ ও তাঁদের সাহচর্যের প্রতি যেমন উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি পাপাচারী ও অসৎ মানুষ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

এই পদ্ধতির আরেকটি নমুনা এ রকম:

আবূ মূসা আল-'আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১১৫]

إن مَثَلَ ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث

---

১১৫. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম: বাবু ফাদলি মান 'আলিমা ওয়া 'আল্লামা' মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল: বাবু মাছালি মা বা'আছাল্লাহু বিহী আন-নাবিয়্যা (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনাল হুদা ওয়াল 'ইলম

الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفةٌ طيّبـــةٌ نقيـــةٌ قبلت الماء فَأَنْبَتَتِ الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أَجَادِبُ أمسكت الماء فنفع الله بهـــا النـــاس فشـــربوا وسقَوْا وَزرعُوا وأصاب طائفةً أخرى منها إنما هـــى فيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولاتنبتُ كلأً.

فذلك مثلُ من فقه فى دين اللهِ ونفعه ما بعثنى اللهُ بـــه فَعلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ من لَمْ يَرَفَعْ بذلك رأسًا ولـــم يقبـــلْ هُدَى اللهِ الذى أرسلت به.

আমাকে আল্লাহ যে সঠিক পথ ও জ্ঞান সহকারে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো প্রচুর বৃষ্টি, যা কোন ভূমিতে পতিত হয়। সেই ভূমির কিছু অংশ থাকে পরিচ্ছন্ন, উৎকৃষ্ট মানের, যা পানি শুষে নেয়, অতঃপর সেখানে ঘাস ও লতা-গুল্ম গজায়। কিছু অনুর্বর ভূমি আছে যা পানি ধরে রাখে। আল্লাহ সেই পানি দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করেন। মানুষ তা পান করে, সেচ দেয় ও কৃষিকাজ করে।

সেই বৃষ্টির কিছু পড়ে এমন সমতল মসৃণ ভূমিতে যা পানি ধরে রাখতে পারে না এবং কোন উদ্ভিদও জন্ম দিতে পারে না।

এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীন বুঝেছে এবং আল্লাহ আমাকে যা দান করে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা উপকার লাভ করেছে। অতঃপর সে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। তেমনিভাবে এটা দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির যে মাথা উঁচু করে তাকায় নি এবং আল্লাহর সেই হিদায়াত যা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, গ্রহণ করে নি।

হাফেয ইবন হাজার (রহ)-এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-কুরতুবীর (রহ) বক্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে: "নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দীন নিয়ে এসেছেন তার তুলনা দিয়েছেন সেই ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সাথে যা মানুষের প্রয়োজনের সময় বর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মানুষের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বৃষ্টি যেমন মৃত শহর-গ্রামকে জীবনদান

করে, অনুরূপভাবে দীনী 'ইলমও মৃত অন্তকরণকে জীবিত করে। তারপর তিনি তাঁর কথার শ্রবণকারীদেরকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এমন বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির ভূমির সাথে তুলনা করেছেন।

তাদের মধ্যে কিছু আছে 'আমলকারী 'আলিম ও মু'আল্লিম অর্থাৎ নিজেরা শেখে, 'আমল করে এবং অন্যকে শেখায়, তারা হলো সেই উৎকৃষ্টমানের উর্বর ভূমির মত, যা বর্ষিত পানি দ্বারা নিজে উপকৃত হয় এবং উদ্ভিদ জন্ম দিয়ে অন্যদেরকে উপকৃত করে। কিছু 'আলিম এমন আছে, তারা সমকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ 'আলিম হিসেবে গণ্য, কিন্তু সেই 'ইলম অনুযায়ী 'আমল করে না, তবে তার জ্ঞান দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়। তারা হলো সেই ভূমির মত যা বর্ষিত পানি ধরে রাখে, নিজেরা তা দ্বারা উপকৃত হয় না, কিন্তু অন্যরা উপকৃত হয়। আর কিছু মানুষ এমন যারা জ্ঞানের কথা শোনে, কিন্তু সংরক্ষণ করে না, সে অনুযায়ী 'আমল করে না এবং অন্যের কাছেও তা পৌছায় না। তারা সেই ভূমির মত যা অনুর্বর ও মসৃণ, পানি ধরে রাখে না, নিজে উপকৃত হয় না, অন্যেরও উপকার করে না।

উপকার লাভের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকার কারণে এই দৃষ্টান্তে প্রশংসিত প্রথম দু'টি প্রকারকে একত্র করা হয়েছে। আর উপকার না থাকার কারণে নিন্দিত তৃতীয় প্রকারকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৬]

ইমাম নাওয়াবী (রহ)-এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন:[১১৭]

في هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثل، و منها فضل العلم و التعليم، و شدَّةُ الحثِّ عليهما، وذمِّ إلاعراض عن العلم.

এই হাদীছে অনেক প্রকারের জ্ঞান আছে: উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ, জ্ঞান ও শিক্ষার মাহাত্ম ও মর্যাদা, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের প্রতি দারুণ উৎসাহ প্রদান এবং তা উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন।

নু'মান ইবন বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:[১১৮]

---

১১৬. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৭৭

১১৭. শারহু সাহীহ মুসলিম, খ. ১৫, পৃ. ৪৮

১১৮. আল বুখারী, কিতাবুশ শারিকাহ : বাবু হাল ইউকরা'উ ফিল কিসমাতি; কিতাবুশ শাহাদাত : বাবুল কার'আহ ফিল মুশকিলাত' তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান

مثلُ القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيهـــا مَثَلُ قومٍ أستهموا سفينةً فصارَ بعضهم فـــى أســـفلها، وصارَ بعضُهم فى أعلاها، فكان الذين فـــى أســـفلها يمُرُّوْنَ بالماء على الذين فى أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسًا فجعل ينقُرُ أسفل السفينة، فأتوه فقالوا : مالـــك؟ قال : تأذَّيْتُم بى ولابد لى من الماء، فإن أخذوا علـــى يده أنجوهُ ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوْهُ وأهلكَـــوْا أنفسهم.

আল্লাহর হদ তথা সীমার উপর দন্ডায়মান, সীমার মধ্যে পতিত এবং সীমার ব্যাপারে কপটতার আশ্রয়গ্রহণকারী- এই তিন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হলো সেই দল বা সম্প্রদায়ের মত যারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি জাহাজ ক্রয় করে। তারপর তাদের কিছু লোক জাহাজের নিচতলায় এবং কিছু লোক উপরতলায় আরোহণ করে। নিচতলার আরোহীরা পানি নিয়ে উপরতলার আরোহীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তাদের একজনকে কষ্ট দেয়, অতঃপর সে একটি কুড়াল হাতে নিয়ে জাহাজের নিচে ছিদ্র করতে থাকে। অতঃপর উপর তলার লোকেরা তার নিকট এসে বলে: তোমার কী হয়েছে? সে বলে : তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়েছো, অথচ আমার পানির ভীষণ প্রয়োজন। তখন তারা যদি তার হাত ধরে তাকে বিরত থাকতে বাধ্য করে তাহলে তাকেও বাঁচাবে, নিজেরাও বাঁচবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকেও ধ্বংস করবে, নিজেরাও ধ্বংস হবে।

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:[১১৯]

مثل المنافِق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير فى

১১৯. নাসাঈ, কিতাবুল ঈমান ওয়া শারায়ি'উহু (মাছালুল মুনাফিক)

هذه مرة، و فى هذه مرَّةً، لا تدرى ايُّها تَتْبع.

মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো সেই ছাগীর মত যে দু'টি ছাগলের পালের মধ্যে কোনটির সঙ্গে যাবে সে ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। একবার এদিকে, একবার ওদিকে যায়। সে জানে না, কোনটির অনুসরণ করবে।

৩৬. মাটিতে রেখা অঙ্কন করে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝে মাটি ও ধুলোর উপর দাগ কেটে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বিশেষ কোন বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ের অনেক বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি বর্ণনা উপস্থাপিত হলো:

জাবির (রা) বলেন:[১২০]

كنّا جُلُوْسًا عند النبى صلى الله عليه وسلم، فخطَّ بيده فى الأرض خَطًّا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيلُ الله عزَّ وجلَّ، وَخَطَّ خَطَّين عن يمينه، وخطَّين عن شماله، وقال : هذه سُبُلُ الشيطانِ، ثم وَضَعَ يده فى الخطِّ الأوسط، ثم تلاهذه الاية : وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর সামনের মাটিতে এভাবে একটি রেখা আঁকলেন। তারপর বললেন: এটা হলো মহা প্রতাপশালী মহামহিম আল্লাহর পথ। তিনি আবার নিজের ডানে দু'টি রেখা ও বামে দু'টি রেখা এঁকে বললেন: এগুলো হলো শয়তানের পথ।

---

১২০. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭, আল-মুরাযী, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬, আর-রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ১১৮

তারপর মধ্যবর্তী রেখাটির উপর নিজের হাত রেখে এ আয়াতটি পাঠ করেন:

وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও। –সূরা আল আনআম-১৫৩

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন:[১২১]

خطَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّامُرَبَّعًا وَخَطَّ خطًّا فى الوَسَط خارجًا منه، وخَطَّ خطوطًا صغارا إلى هذا الذى فى الوسط، من جانبه الذى فى الوسط، فقـال : هذا الإنسانُ، وهذا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ به، وهذا الـذى هـو خارجٌ أملُهِ، وهذه الخطوطُ الصغارُ : الأعـراضُ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نَهَشَه هذا، وإن أَخطَاه كلُّها أصابَهُ الهَرَمُ.

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চারকোণ বিশিষ্ট রেখা আঁকলেন। তার বাইরে মাঝ বরাবর আরেকটি রেখা আঁকলেন। তারপর নিজের দিক থেকে মধ্যবর্তী স্থান হতে মধ্যবর্তী রেখাটির দিকে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা টেনে বললেন: এই হলো মানুষ, আর এই তার মৃত্যু যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর এর বাইরে যেটা, তা হলো তার আশা-আকাঙ্খা। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলো হলো আকস্মিক বিপদ-আপদ। যদি এটা তাকে ভুল করে, এটা তাকে দংশন করবে, এটা ভুল করলে এটা দংশন করবে। আর সবগুলো যদি তাকে ভুল করে তাহলে বার্দ্ধক্য তাকে লাভ করবে।

---

১২১. আল বুখারী, কিতাবুর রিকাক: বাবুন ফিল আমালি ওয়া তাওলিহি, ফাতহুল বারী, খ. ১১, পৃ. ২০২

এই হাদীছে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটিতে দাগ কেটে অতি চমৎকার ভাবে মানুষের মৃত্যু, তার দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা, তার প্রতিবন্ধকতা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানুষকে তার আশা-আকাঙ্খা সংক্ষেপ করার উপদেশ দান করেছেন। এই ব্যাখ্যার জন্য কেবল মাটি ও ধুলো ব্যবহার করেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন:

خَطَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعةَ خطوط، وقال : أتدرُوْنَ لم خططتُ هذه الخطوط؟ قالوا : الله ورسولهُ أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضلُ نساء أهل الجنة : خديجةُ بنتُ خويلد، وفاطمة بنتُ محمد، ومريم ابنةُ عمران، واسية بنتُ مراحم امرأةَ فرعون.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটিতে চারটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন : তোমরা কি জান আমি এই রেখাগুলো কেন টানলাম? তাঁরা বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তারপর তিনি বললেন: জান্নাতবাসী মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো: খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ, ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিনত 'ইমরান ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া বিনত মুযাহিম।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতবাসী চারজন নারীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা মুখে যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি মাটিতে দাগ কেটে চারজনকে দেখিয়ে দিয়েছেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম শ্রবণ ও দর্শন দু'টি ইদ্রিয়ের দ্বারা বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেছেন।[১২২]

৩৭. পর্যায়ক্রমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে শিক্ষার

১২২. মুসনাদু আহমাদ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, ৩১৬, ৩২২

কথা বলেছেন। শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছে। মাককায় শরী'আতের বিধান 'আকীদার পরিশুদ্ধি ও মহোত্তম নৈতিকতা শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর হিজরাতের অব্যবহিত পূর্বে সালাত ফরজ হয়। প্রথমত দু'রাকা'আত করে ফরজ হয়, পরবর্তীতে সফরে দু'রাকা'আত বহাল রেখে নিজ গৃহে অবস্থানকালে চার রাকা'আত করা হয়। মাদীনায় অন্যান্য বিধি-বিধান ফরজ করা হয়। যেমন হারাম করা হয় মদ পান, সুদ ইত্যাদি। এ সবকিছু করা হয় সুপরিকল্পিত ভাবে ক্রমান্বয়ে ও ধাপে ধাপে। যাতে আদেশসমূহ পালন করতে ও বারণসমূহ থেকে দূরে থাকতে বান্দার কোন রকম কষ্ট না হয়।

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে করার আল্লাহর যে রীতি তাই অনুসরণের শিক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁকে বলেন,

إنك ستأتى قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتّق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.

তুমি খুব শীঘ্র আহলি কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। তাদেরকে তুমি এই সাক্ষ্যদানের দিকে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার একথাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি তারা একথা মেনে নেয় তাহলে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ থেকে দূরে থাকবে, মাজলূমের বদ দু'আ

থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ, সেই বদ দু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন আড়াল থাকে না।[১২৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একথা "তুমি আহলি কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো"- তাঁর উপদেশের ভূমিকা স্বরূপ, যাতে মু'আয (রা) মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। কারণ, তিনি যাদের নিকট যাচ্ছেন তারা হলো আহলি কিতাব, মোটামুটি ভাবে তারা জ্ঞান চর্চা করে। সুতরাং মূর্তি পূজারী জাহিলদের সাথে যেভাবে কথা বলা যায় তাদের সাথে সেভাবে কথা বলা ঠিক হবে না।

তারপর তিনি মু'আযকে (রা) 'আকীদা বিষয়ে দা'ওয়াত দিতে বলেন এভাবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। কারণ এ দু'টি বিষয় ইসলামের প্রবেশদ্বার, সমগ্র দীনের মূলভিত্তি। এ দু'টি বিষয়ের স্বীকারোক্তি এবং তাদের নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া কোন 'আমল, কোন ইবাদাত কবুল হয় না।

যদি তারা এ আহ্বানে সাড়া দেয়, আল্লাহকে রব ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল বলে মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে শিক্ষা দেবে প্রাত্যহিক প্রাসঙ্গিক ফরজসমূহ ও প্রাথমিক ইবাদাতসমূহ। এগুলো হলো সালাত, সাওম ইত্যাদি যা সর্বদা ও সর্বক্ষণ বান্দা ও তাঁর রবের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান রাখে।

তারা যদি এগুলো বুঝে 'আমল করতে আরম্ভ করে তাহলে তাদেরকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মমূলক ফরজসমূহ শিক্ষা দেবে। আর তা হলো ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি যাকাত। যাকাত হলো ইসলামের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহমর্মিতার সেতুবন্ধন।

এভাবে দাওয়াত ও শিক্ষা পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে হওয়া উচিত। যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা সবার আগে, তারপর পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে। এক সঙ্গে সব শেখাতে গেলে শিক্ষার্থী হয় তো ভয়ে ও বিরক্তিতে একেবারেই দূরে সরে যেতে পারে। জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ আল বাজালী (রা) বলেন:[১২৪]

كنّا مع النبى صلى الله عليه وسلم، ونحن فتيان حزاورة، فعلّمنا الإيمانَ قبل أن نتعلّم القرانَ، ثم تعلّمْنَا القرانَ، فازددنا به إيمانًا.

---

১২৩. আল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭, কিতাবুয যাকাতঃ বাবু আখযিস সাদাকা মিনাল আগনিয়া'; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১৯৬, কিতাবুল ঈমান

১২৪. ইবন মাজাহ, আল-মুকাদ্দিমাঃ বাবুন ফিল ঈমান

আমরা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার কাছাকাছি কিছু তরুণ নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম। আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখি। তারপর কুরআন শিখি। এভাবে আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি।

আবূ 'আবদির রহমান আস-সুলামী (রহ) বলেন:[১২৫]

حَدَّثَنَا من كان يقرئنا من أصحاب النبـــي صـــلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صـــلى الله عليه وسلم عَشَرَ آيات، فلا يأخذون فـــي الْعَشْـــرِ الأخرى حتِى يعْلَمُوا ما فِى هذه من العلم والعمل.

রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, আমাদেরকে বলেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট দশটি আয়াতের পড়া শিখতেন। সেই আয়াতগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও কর্মের ('ইলম ও 'আমল) কথা আছে তা না জানা পর্যন্ত পরবর্তী দশটি আয়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন না।

একই কথা বলেছেন প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা)।' তিনি বলেন:[১২৬]

كان الرجل منا إذا تعلَّم عشر آيات لم يُجاوزهن حتى يعرفَ معانيهن والعَمَلَ بهن.

আমাদের কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন তখন তার অর্থ না জানা এবং তার উপর 'আমল না করা পর্যন্ত তা অতিক্রম করতেন না। অর্থাৎ নতুন কিছু শিখতেন না।

৩৮. ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ক যে

---

১২৫. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৪১০
১২৬. তাফসীরুত তাবারী, খ. ১, পৃ. ৩৫; আর-রাসূলুল মু'আল্লিম, পৃ. ৭৮

সকল মূল্যবোধ ও মূলনীতি জানা যায় তার মধ্যে একটি হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা:

একজন মানুষের জন্য যা উপযোগী তা অন্যের জন্য উপযোগী নয়, একটি পরিবেশে যা উপযোগী তা অন্য কোন পরিবেশে উপযুক্ত নয়। তেমনিভাবে কোন দলের ও সময়ের জন্য যা উপযুক্ত তা ভিন্ন দল ও সময়ের জন্য মোটেও প্রযোজ্য নয়। তেমনিভাবে জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একজন সুযোগ্য শিক্ষক তিনি যিনি একজন অথবা একটি দলের জন্য যা উপযুক্ত, যতটুকু তার উপযোগী এবং যে সময়ে তার জন্য কল্যাণকর তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেন।

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয়ভাবে এ বিষয়টি উম্মাতের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন:

১. যাঁরা তাঁর নিকট উপদেশ চেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে উপদেশেও ভিন্নতা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের (রা) অনেকে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপদেশ চেয়েছেন। ব্যক্তিভেদে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদেশও ভিন্ন হয়েছে। ব্যক্তির অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি তা করেছেন। এর অনেক দৃষ্টান্ত হাদীছের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। এখানে তার থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:[১২৭]

عَن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلتُ يارســول الله! أوصينى، قال : اتق الله حيثما كنت، وأتبــع السَّــيئةَ الحسنةَ تَمْحهَا، وخَالِق النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন। বললেন: তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, একটি মন্দ কাজ করার পর একটি ভালো কাজ কর যাতে তা মন্দ কাজটিকে মুছে ফেলে এবং মানুষের সাথে সুন্দর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে আচরণ কর।

এর পাশাপাশি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীছে এসেছে:[১২৮]

---

১২৭. মুসনাদু আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৫৮, তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ২৩৯ বাবু মাজাআ ফী মা'আশারিন নাস
১২৮. বাদরুদ্দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, খ. ২২, পৃ. ১৬৪; আর-রাসূলুল মু''আল্লিম, খ. ৮৬-

أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أرصنى بشئ، ولاتكْثِر عَلَيَّ لَعَلِّى أعِيهِ، قال : لاتَغْضَبْ، فَرِدَّدَ ذلك مِرارًا، كلٌّ ذلك يقول! لاتَغْضَبْ.

এক ব্যক্তি নবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমাকে কোন একটি বিষয়ে উপদেশ দিন যাতে আমি তা ধারণ করতে ও বুঝতে পারি। আমার উপর বেশি চাপাবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি রাগান্বিত হবে না। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন। প্রতিবারেই তিনি বলেন: তুমি রাগান্বিত হবে না।

উল্লেখিত হাদীছ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একই রকম আবেদনের পর দু'জন ব্যক্তিকে দু'রকম উপদেশ দিয়েছেন। আবেদনকারীদ্বয়ের অবস্থা ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। তাই দু'রকম হয়েছে।

'আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে:[১২৯]

أن رجلاً قال : يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثُرتْ على، فأخْبِر بشيئ أتشبَّثُ به، قال : لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا من ذكر الله.

এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের শরী'আত (বিধিবিধান) আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে। অতএব আপনি আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি অব্যাহতভাবে পালন করতে পারি। বললেন: আল্লাহর যিকর দ্বারা সব সময় তোমার জিহ্বা সজীব রাখবে।

সুফইয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ আছ-ছাকাফী (রা) বলেন:[১৩০]

قلتُ يارسول الله، قل لى فى الإسلام قولاً لا أسئل عنه أحدًا بعدك، قال: قُلْ آمنت بالله فاستقيم.

৮৭

১২৯. তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত: বাবু মা জাআ ফী ফাদলিয যিকরি; ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১২৪৬, কিতাবুল আদাব: বাবু ফাদলিয যিকরি

১৩০. মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৮-৯, কিতাবুল ঈমান: বাবু জামিয়ি আওসাফিল ইসলাম; তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ২২, কিতাবুয যুহদ: বাবু মা জাআ ফী হিফজিল লিসান

আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলুন যে, আপনার পরে আর কারো নিকট আমি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবো না। বললেন: বল: আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তারপর একথার উপর স্থির থাক।

ইবন মাজাহর বর্ণনায় হাদীছটি এভাবে এসেছে:[১৩১]

قلت يا رسول الله، حدِّثني بأمرٍ أعتصمُ به، قال : قُل ربِّى الله، ثم استقمْ، قلتُ يا رسول الله ما أكثـرُ مـا تخافُ عليَّ؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، ثم قال : هذا.

আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এমন কোন কথা বলে দিন যা আমি শক্তভাবে ধরে থাকতে পারি। বললেন: বল, আমার রব (প্রতিপালক) আল্লাহ। অতঃপর একথার উপর অটল থাক। বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি কিসের আশঙ্কা করেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জিহ্বাটি হাত দিয়ে ধরেন, তারপর বলেন: এইটা।

'উকবা ইবন 'আমির (রা) বলেন:[১৩২]

قلتُ يارسول الله مالنجاةُ؟ قال أمْلِكَ عليك لسانك ولْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وأبكِ على خطيئتك.

আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসে? বললেন: তোমার নিজের জিহ্বার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর। তোমার গৃহ যেন তোমাকে প্রশস্ত করে এবং তোমার ভুলের জন্য তুমি কাঁদ।

তিনি একজন উপদেশ প্রার্থীকে বললেন:

تَعْبُدُ اللهَ ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتـوْتى الزكاة وتصل الرحم.

---

১৩১. ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১৩১৪, কিতাবুল ফিতান: বাবু কাফ্‌ফিল লিসান ফিল ফিতনাতি
১৩২. তিরমিযী, প্রাগুক্ত

তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করবে না, সালাত কায়িম করবে, যাকাত দেবে এবং রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা বিদ্যমান রাখবে।

ঠিক একই রকম আরেকজন উপদেশ প্রার্থীকে তিনি বললেন:

اتَّقِ الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.

যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করবে, কোন খারাপ কাজ করলে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করবে যা খারাপটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করবে।

আরেকজনকে তিনি বললেন:

قُلْ امنتُ بِاللهِ ثم استقيم.

বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তারপর এ বিশ্বাসের উপর অটল থাক।

উল্লেখিত হাদীছগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি,

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একই ধরনের জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের জবাবে ব্যক্তির ভিন্নতা ও তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন জবাব ও উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশ প্রার্থীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল রুগ্নব্যক্তির সাথে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের আচরণের মত। নিরাময়ের জন্য যার যে ঔষধ প্রয়োজন তাই দিতেন।

২. প্রশ্নকারীদের অবস্থার ভিন্নতার কারণে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাব ও ফাতওয়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করলো: কোন 'আমল সবচেয়ে ভালো? অথবা কোন ইসলাম উত্তম? একই প্রশ্নের উত্তর এক একজনকে একেক রকম দিয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলাম: আল্লাহর নিকট উত্তম 'আমল কী কী? বললেন: সময়মত সালাত আদায় করা। বললাম: তারপর? বললেন: মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করা। বললাম: তারপর? বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে আছেন, এমন সময় আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলাম: আপনিই কি দাবী করেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? বললেন: হ্যাঁ। বললাম:

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর নিকট কোন 'আমলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রিয়? বললেন: আল্লাহর উপর ঈমান। বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর? বললেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। বললাম: তারপর কোনটি? বললেন: সৎ কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই যে একই ধরনের প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিয়েছেন, এর কারণ হলো প্রশ্নকারীদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও স্বভাবগত পার্থক্য, যা তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

মহিলারা যখন জিহাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তিনি বললেন:[১৩৪]

لكن أفضل الجهاد حج مبرور.

তবে উত্তম জিহাদ হলো আল্লাহর নিকট গৃহীত একটি হজ্জ।

সহীহ আল বুখারীতে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

قالو يا رسول الله أى الاسلامُ افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه و يده.

সাহাবীগণ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম ইসলাম কী? বললেন: যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই উত্তম মুসলিম?

আল বুখারী ও মুসলিম 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أى الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করলো: কোন ইসলাম সবচেয়ে ভালো? বললেন: তুমি মানুষকে আহার করাবে এবং যাকে তুমি চেন ও যাকে না চেন সকলকে সালাম দেবে।

শব্দের কিছু তারতম্য থাকলেও দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নের মতই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব এক নয়। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, প্রশ্নকারী

---

১৩৩. আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ৩, পৃ. ৩৩, কিতাবুল বাররি ওয়াস সিলাতি: বাবুত তারগীব ফী সিলাতির রাহিম ওয়া ইন কুতি'আত ওয়াত তারহীব মিন কাত'ইহা

১৩৪. আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ-২৭৮৮

ও শ্রোতাদের অবস্থার ভিন্নতার কারণে জবাবও ভিন্ন হয়। প্রথম প্রশ্নকারী হয়তো এমন ছিলেন যার হাত ও জিহ্বা থেকে মানুষের কষ্ট পাবার আশঙ্কা ছিল, তাই তিনি তার এ ত্রুটি দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নকারীর মধ্যে কথা ও কাজের দ্বারা মানুষের কল্যাণ করার আশা করেন, তাই তাকে সে দিকে উৎসাহিত করেন। আর কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সেই সময় উল্লেখিত দু'টি বিষয় বেশি প্রয়োজন ছিল, তাই কেবল সে দু'টিই উল্লেখ করেন। কারণ, সে সময় মানুষ দারুণ অন্নকষ্ট ও ক্ষুধার মধ্যে ছিল এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল।[১৩৫]

একই মাজলিসে একই বিষয়ে এক রকম প্রশ্নের ভিন্ন দুটি জবাবের একটি স্পষ্ট ঘটনা ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:[১৩৬]

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شابٌ فقال : يارسول الله أقبل وأناصائمٌ؟ فقال : لا فَجَاءَ شَيْخٌ فقال : يارسول الله اقبلُ وانا صائمٌ؟ فقال : نعـــم، فنظــر بعضنا إلى بعض! فقال رسول الله صــــلى الله عليـــه وسلم : قد علمتُ نَظَرَ بَعْضِكُمْ إلى بعض. إنَّ الشــيْخُ يمْلكُ نفسهُ.

আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক যুবক এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সাওম পালন অবস্থায় চুমু দিতে পারি? বললেন: না। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ এসে বললো! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সাওম পালন অবস্থায় চুমু দিতে পারি? বললেন: হ্যাঁ! জবাব শুনে আমরা অবাক দৃষ্টিতে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমি তোমাদের একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর রহস্য বুঝতে পেরেছি। আসলে বৃদ্ধ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।" তাই স্ত্রী উপগত হয়ে রোযা নষ্ট করার আশঙ্কা নেই।

---

১৩৫. ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৬২; আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ. ১৪০
১৩৬. মুসনাদু আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৮০, ২৫০

পক্ষান্তরে যুবকের ক্ষেত্রে সেই আশংকা আছে। তাই সাওম পালন অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেবে না। পরবর্তীকালে 'আলিমগণ যে বলেছেন, অবস্থার পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন হয়, উল্লেখিত হাদীছটি তার অন্যতম শার'ঈ দলীল।

৩. ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ভিন্নতার কারণে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিকা ও আচরণ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন।

এর দৃষ্টান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট আগত মরুভূমিতে বসবাসকারী বেদুঈনদের সাথে যে ধরনের ব্যবহার ও আচরণ করতেন, নিজের আশেপাশে অবস্থানকারী সাহাবীদের সাথে তেমন করতেন না। তাদের জন্য যা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, এদের জন্য তেমন দেখতেন না। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের ও বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দের অন্তর আকর্ষণ ও মন গলানোর জন্য যে রকম আচরণ করেন, তেমনটি মুহাজির ও আনসারদের সাথে করেন নি। তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথেও তাঁদের মর্যাদা ও স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী আচরণ করতেন। 'উছমান (রা) যখন তাঁর নিকট আসতেন তিনি স্বীয় উরু ও হাঁটুদ্বয় ঢেকে কাপড় ঠিকঠাক করে বসতেন, আবূ বাকর (রা) ও 'উমারের (রা) সাথে কিন্তু তেমন করতেন না। 'উছমানের (রা) বেলায় যা করতেন তা তাঁর লাজুক স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে করতেন। তিনি বলতেন:

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.

আমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা পাব না যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পায়?

বিষয়টি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন:[১৩৭]

يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر و عمر كما فزعت لعثمان؟ فقال: إن عثمان رجل حيي و إني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألايبلغ إليّ في حاجته.

হে আল্লাহর রাসূল! 'উছমানকে (রা) দেখে যেভাবে সতর্ক হন, আবু বাকর ও 'উমারকে দেখে সেভাবে সতর্ক হতে আমি আপনাকে দেখি না

---

১৩৭. মুসলিম, ফাদায়িলুস সাহাবা, হাদীছ-২৪০২

কেন? বললেন: 'উছমান একজন লাজুক মানুষ। আমি যদি (আবু বাকর ও 'উমারের সাথে যে অবস্থায় থাকি সে অবস্থায়) তাঁকে আমার নিকট আসার অনুমতি দিই তাহলে সে তাঁর কোন প্রয়োজনে আমার নিকট আসবে না।

কোন সম্প্রদায়ের কোন সম্মানীয় ব্যক্তি আসলে সম্মানের সাথে গ্রহণ করতেন। তবে কোন নির্বোধ মূর্খ অথবা দুষ্ট লোক আসলে হাসি খুশি চেহারায় ও মিষ্টি মধুর কথার মাধ্যমে গ্রহণ করতেন। এতটুকু করতেন তার অন্তর জয় ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তবে কোন ভাবেই তার অহেতুক প্রশংসা অথবা তোষামোদ করতেন না।

যাঁরা তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের কারো কারো সম্পর্কে কিছু সুসংবাদ মু'আযকে (রা) তিনি শোনান। তবে সে কথা সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেন, এই আশঙ্কায় যে, তারা তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভর) করে বসে না থাকে।[১৩৮]

যে সকল ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য দান করতেন তাদের ভিন্নতা ও শক্তি সামর্থের পার্থক্যের কারণে তাঁর আদেশ নিষেধও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকটি মানুষের উপর তার ক্ষমতা, যোগ্যতা অনুযায়ী এবং তার জন্য উপযুক্ত ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেমন মাদীনায় হিজরাত ও ছাওর গুহায় আত্মগোপনের ঘটনাটি। সে ক্ষেত্রে তিনি একাধিক ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। সেখানে যার যে ক্ষেত্রে যোগ্যতা ছিল তাকে সেই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

আবূ বাকরকে (রা) বাহন ও ভ্রমণে সঙ্গদানের, যে কোন ধরনের বিপদের মুখোমুখি হবার আশংকায় থাকায় 'আলীকে (রা) নিজ বিছানায় ঘুমানোর, আসমা বিনত আবী বাকরকে (রা) গুহায় খাবার ও বাইরের প্রতিক্রিয়ার খবরাখবর সরবরাহের এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বাকর ও 'আমির ইবন ফুহায়রাকে (রা) তাদের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবে আমরা দেখি যে, তিনি খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ ও 'আমর ইবন আল-'আসকে (রা) কিছু যুদ্ধাভিযানের দায়িত্ব দিচ্ছেন, পক্ষান্তরে হাস্সান ইবন ছাবিতকে দায়িত্ব দিচ্ছেন তাঁর কাব্য প্রতিভার মাধ্যমে কুরাইশ কবিদের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জবাবদানের।

৫. পরিবেশ-পরিস্থিতির পার্থক্যের কারণে কোন ব্যক্তি বা দলের নিকট থেকে যে ভূমিকা ও আচরণ মেনে নিয়েছেন তা অন্যের নিকট থেকে মেনে নেন নি। দৃষ্টান্ত হলো,

---

১৩৮. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম

তিনি কিছু বেদুঈনের সীমিত কিছু ফরজ আদায়ের অঙ্গীকারকে গ্রহণ করেছেন। এমন কি তাদের একজন যখন বললোঃ

وَ الله لا أزيد على هذا و لا أنقص.

আল্লাহর কসম! আমি এর বেশিও করবো না এবং কমও না।

তখন তিনি বললেনঃ أفلح إن صدق "যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে সফলকাম হয়েছে।"

শিক্ষার্থীদের মেধা ও ধারণক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদানের আরো কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহনের পিঠে আরোহী ছিলেন। মু'আয ইবন জাবালও (রা)-একই বাহনের পিঠে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে বসা ছিলেন। এক সময় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাক দিলেনঃ হে মু'আয! মু'আয জবাব দিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাজির। এভাবে তিনবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আযের (রা) নাম ধরে ডাকলেন এবং মু'আযও জবাব দিলেন। অবশেষে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ[১৩৯]

مامن عبد يشهدُ أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عَبــدهُ ورسولُه، صدقًا من قلبه إلاَّ حرَّمه الله على النار، قال : يارسول الله. أَفلا أخبر به الناس فيستبشر؟ قــال : إذا يتكلوا.

এমন প্রত্যেক বান্দা যে খাঁটি অন্তকরণে একথা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হারাম করে দিয়েছেন। মু'আয বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি একথা মানুষকে বলে দেব, তাহলে তারা উৎফুল্ল হবে? বললেনঃ না। তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।

মু'আযের (রা) মেধা যে পর্যায়ের তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একথার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে একথা প্রচার হলে

---

১৩৯. ছাহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২২২, কিতাবুল 'ইলমঃ বাবু মান [illegible] 'ইলমি কাওমান দূনা কাওমিন; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৪০, কিতাবুল ঈমান

কম মেধার শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবে, তাই তিনি মু'আযকে (রা) তা প্রচার করতে নিষেধ করেন। অবশ্য মু'আয (রা) জ্ঞান গোপন করা হবে, এমন চিন্তায় মৃত্যুর পূর্বে এ হাদীছ প্রচার করে যান।

عن أبى هريرة رضى الله عنه:أن أعرابيًا جاء إلـــى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال : يارسول الله : دُلَّنى على عمل إذا عَمِلْتُه دخلتُ الجنَّةَ، قـــال : تَعْبُــدُ الله لاتَشرك به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبـــة، وتُــؤدِّى الزكاةَ المفروضة، وتصوم رمضان، قـــال : والـــذى نفسى بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقصن منه. فلما ولّى قال النبى صلى الله عليه وسلم : من ســرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.

আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত: একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু আমলের দিক নির্দেশনা দিন যেগুলো করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করবে না। ফরজ সালাত কায়িম করবে, ফরজ যাকাত আদায় করবে এবং রামাদান মাসে সাওম পালন করবে। লোকটি বললো: যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ। আমি কখনো এর চেয়ে একটুও বেশি করবো না এবং কমও করবো না।

লোকটি যখন পেছনে ফিরে চলে গেল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কেউ যদি কোন জান্নাতী লোককে দেখে খুশী হতে চায়, তার উচিত এই লোকটিকে দেখা।[১৪০]

এখানে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ অন্য

---

১৪০. আল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ২৬১, কিতাবুয যাকাত: বাবুওজূবিয যাকাত; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১৭৪, কিতাবুল ঈমান

কারো সম্পর্ক বলতে পারে না। রাসূলও (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন।

একজন সত্যিকার শিক্ষকের ভূমিকা ও অবস্থান এমনই হবে। তাঁর উচিত হবে তাঁর ছাত্রদের পরিবেশ পরিস্থিতি, সাধারণ ও বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা, তাদের প্রতিটি দলের, এমন কি প্রত্যেকের অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা যাতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত প্রত্যেকের উপযুক্ত ঔষধ দিতে পারেন। তিনি বড়দের সাথে যেভাবে যে ভাষায় কথা বলেন সেভাবে সে ভাষায় কথা বলবেন না ছোটদের সাথে, যুবককে যেভাবে সম্বোধন করবেন যুবতীকে সেভাবে করবেন না, ব্যক্তি বিশেষকে যা দেন সাধারণভাবে তা দেবেন না, তীক্ষ্ণ মেধাবীকে যে দায়িত্ব দেবেন, কম মেধাবীকে তা দেবেন না, শহুরে মানুষকে যে আদেশ করবেন বেদুঈন যাযাবরকে তা করবেন না। বরং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার মান ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দেবেন। এ শিক্ষা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

৩৯. শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও সনদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ছাত্রদের পরীক্ষাও নিতেন। ইমাম আল বুখারী (রহ) বলেন:

باب طرح الامام المسئلة على الصحابة ليختبر ما عندهم من العلم.

(অর্জিত জ্ঞানের মান নির্ণয়ের জন্য ইমামের তাঁর সঙ্গীদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া) শিরোনামের অধ্যায়ে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোন কিছু শোনার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং কিছু কথা শুদ্ধ করে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারা' ইবন 'আযিবকে (রা) ঘুমানোর পূর্বে পড়ার জন্য এ দু'আটি শিখিয়ে দেন:

اللهم أسلمت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لاملجأ ولامنجئ منك إلا إليك، امنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت.

হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল তোমার নিকট নত করলাম, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে রেখে দিলাম তোমার প্রতি মুগ্ধতা ও ভীতির সাথে। একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন মুক্তি ও আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি এবং যে নবী তুমি পাঠিয়েছো তার প্রতিও।

বারা' (রা) বলেন, আমি এ দু'আ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পড়ে শোনালাম এবং وبِنَبِيِّكَ এর স্থলে و برسولك পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বুকের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন: وبِنَبِيِّكَ এই দু'আ পড়ে যে ব্যক্তি ঘুমাবে সেই রাতে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে সে মৃত্যু হবে فطرت তথা স্বভাবগত মৃত্যু।[১৪১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একটি শব্দ শুদ্ধ করে দেন। অথচ দু'টি শব্দই সমার্থবোধক। এ দ্বারা বুঝা যায় মাসনূন তথা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেখানো দু'আ সমূহের শব্দের পার্থক্যের কারণে তা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও ভিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন: সৃষ্টি জগতের মধ্যে কার ঈমান তোমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ফেরেশতাদের নাম উচ্চারণ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তারা কেন ঈমান আনবে না, তারা তাদের "রব" (প্রভু)-এর নিকট অবস্থান করে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী-রাসূলগণের কথা বললেন, তিনি বললেন: তারা কেন ঈমান আনবেন না? তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল হয়। এবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, আমাদের ঈমানই সৃষ্টি জগতের ঈমানের চেয়ে ভালো। তিনি বললেন, তোমরা কেন ঈমান আনবে না? আমি তো তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন:[১৪২]

إن أعجب الخلق إليَّ إيماناً لقومٌ من بعـــدكم يجـــدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها.

---

১৪১. আল কিফাইয়া ফী 'ইলমির রিওয়াইয়া, পৃ. ১৭৫
১৪২. শারফু আসহাবিল হাদীছ, পৃ. ৩৩

আমার নিকট সৃষ্টি জগতের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে অধিক প্রিয় ঐ সকল মানুষ যারা তোমাদের পরে আসবে, সহীফা আকারে আল্লাহর কিতাব লাভ করবে এবং তার প্রতি ঈমান আনবে।

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন: তুমি আমাকে কুরআন শোনাও। বললাম, আমি আপনাকে কুরআন শোনাবো? এ কুরআন তো আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন: আমি অন্যের মুখে তা শুনতে চাই। আমি সূরা আন-নিসা'র তিলাওয়াত শুরু করলাম। যখন এ আয়াতে পৌঁছলাম:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

তখন কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং আপনাকে উপস্থাপন করবো সাক্ষী হিসেবে এদের সকলের বিরুদ্ধে? –সূরা আন নিসা ঃ ৪১।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: থাম! ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

একবার 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলে তিনি তাঁকে খুব বাহবা দেন এবং বলেন: أَحْسَنْتَ 'খুব ভালো করেছো।'[১৪৩] একবার তিনি একটি অভিযানে কয়েকজন সাহাবীকে পাঠান। যাত্রার আগে সকলের কুরআন পাঠ শোনেন। তাদের মধ্যে একজন নওজোয়ানের পূর্ণ সূরা আল বাকারা মুখস্থ ছিল। তিনি তাকেই সেই বাহিনীর আমীর নিয়োগ করেন। তিনি বলেন: إذهب فأنت أميرهم 'যাও, তুমি তাঁদের আমীর।'[১৪৪] রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই ইবন কা'বের (রা)-মুখ থেকেও কুরআন পাঠ শুনতেন। এমনিভাবে আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) সুমধুর কণ্ঠধ্বনিও উপভোগ করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পাঠ সমাপণকারীদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখে সনদ ও সার্টিফিকেট দেয়া হতো। তিনি তাদেরকে দীন ও 'ইলমের গভীরতার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নিকট থেকে 'ইলম হাসিলের জন্য উম্মাতকে তাকিদ

---

১৪৩. আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ.২, পৃ. ১৩৪

১৪৪. তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী সূরাতিল বাকারাহ ওয়া আয়াতিল কুরস্যিয়্যি

দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: আমার পরে আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) অনুসরণ করবে, এই চারজন থেকে কুরআন শিখবে: 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, মু'আয ইবন জাবাল ও উবাই ইবন কা'ব (রা)। মু'আয ইবন জাবাল (রা) আমার উম্মাতের মধ্যে হালাল-হারাম বিষয়ের সবচেয়ে বড় 'আলিম। যে ব্যক্তির সবুজ-সতেজ কুরআন পাঠ পছন্দ সে যেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'মাস'ঊদের (রা) নিকট পড়ে। যায়দ ইবন ছাবিত (রা) আমার উম্মাতের মধ্যে ফারায়েজের সবচেয়ে বড় 'আলিম, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) কুরআনের সবচেয়ে ভালো মুখপাত্র, আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে (রা) দাঊদের বংশধরদের রাজত্ব দেয়া হয়েছে।

৪০. কুরআন শিক্ষাদানের দু'টি পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন শিক্ষার দু'টি পদ্ধতি ছিল। একটি হলো, সাধারণভাবে শিক্ষার্থীগণ প্রয়োজন পরিমাণ অথবা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলতেন। এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী থাকতেন। বহিরাগত শিক্ষার্থীগণ সাধারণভাবে প্রয়োজন পরিমাণ মুখস্থ করতেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: শিক্ষার্থীগণ তাফসীর, তাবীল ও বিধি বিধান জেনে-বুঝে কুরআন পড়তেন। এরা ছিলেন বিশিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থী। ইবন কুতায়বা (রহ) তাঁর مشكل القرآن গ্রন্থে বলেন:[১৪৫]

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام ومنتهى العلم، إنما يقرء الرجل منهم السورتين والثلاث والأربع و البيض والشطرمن القران إلا نفرًا منهم وفقهم الله لجمعه وسهل عليهم حفظه.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন পৃথিবীর প্রদীপ তুল্য, মানবজাতির নেতা এবং জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়। তাঁদের কেউ দু'তিন ও চারটি সূরা এবং কুরআনের একটা অংশ পড়ে নিতেন। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ কুরআন সংগ্রহ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং

১৪৫. ইবন কুতায়বা, মুশকিলুল কুরআন, পৃ. ১৮১

তাঁদের জন্য কুরআন হিফয করা সহজ করে দিয়েছেন, তাঁরা পূর্ণ কুরআন সংগ্রহ ও হিফয করেন।

নওমুসলিম সাহাবীগণ হিজরাত করে মাদীনায় আসেন, তখন সবকিছুর পূর্বে তাদেরকে কুরআনের তা'লীম দেয়া হতো। 'উবাদা ইবন সামিত (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি হিজরাত করে মাদীনায় আসতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কারো নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাকে কুরআনের তা'লীম দিতেন। এমন লোকদের অতিরিক্ত তিলাওয়াতের শব্দে মাসজিদ গমগম করতো। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিচু স্বরে পড়ার আদেশ করতেন যাতে কোন ভুল না হয়।[১৪৬]

জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় আমরা ছিলাম সুস্থ সবল বালক। আমরা কুরআনের তা'লীম নেয়ার আগে ঈমানকে জেনেছি, তারপর কুরআন শিখেছি। আর এ কারণে আমাদের ঈমান আরো শক্ত হয়ে যায়।[১৪৭]

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, আমি সেই যুগ পেয়েছি যখন আমাদের কোন ব্যক্তি কুরআনের তা'লীমের পূর্বে ঈমান আনতো। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর কোন সূরা নাযিল হতো তখন আমরা তাঁর নিকট থেকে সেই সূরার হালাল-হারাম ও তত্ত্বজ্ঞান শিখে নিতাম। যেমন আজ তোমরা আমার নিকট থেকে শিখছো। এরপরে আমি দেখলাম, মানুষ ঈমানের পূর্বে কুরআন পড়ছে এবং সূরা আল ফাতিহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলে, কিন্তু তাদের আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির জ্ঞান অর্জিত হয় না। তারা কুরআন পড়ে বেপরোয়াভাবে ও অমনোযোগী অবস্থায়।[১৪৮]

'উকবা ইবন 'আমির (রা) বলেন, আমরা ছিলাম সুফফার সদস্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে চায়, নাতজান অথবা আকীক উপত্যকায় যেয়ে কোন অন্যায়-অপরাধ ছাড়াই বিনামূল্যে দু'টি উন্নত জাতের উটনী নিয়ে আসে? আমরা বললাম, আমরা সবাই চাই। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মাসজিদে গিয়ে কুরআনের দু'টি আয়াত শিখবে, এটা দু'টি উটনী থেকেও উত্তম, আর তিন আয়াত তিনটি উট থেকেও উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত শিখবে তা হবে তত উট থেকে উত্তম।[১৪৯]

---

১৪৬. মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন, খ.২, পৃ. ২০৮
১৪৭. আত তারীখ আল কাবীর, খ. ১/১, পৃ. ২২০
১৪৮. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ১৪৪
১৪৯. আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২১২; বাবু ছাওয়াবি কুর্‌রায়িল কুরআন

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আপনি আমাকে কুরআন পড়ান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি ذوات الراء (রা) বিশিষ্ট) তিনটি সূরা পড়ে নাও। লোকটি বললেন: আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে, অন্তর কঠিন হয়ে গেছে এবং জিহ্বাও মোটা হয়ে গেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ঠিক আছে, তুমি ذوات حم (حم) বিশিষ্ট) তিনটি সূরা পড়ে নাও। লোকটি একই কথা বললেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তাহলে তুমি ذوات السبحات (السبحات বিশিষ্ট) তিনটি সূরা পড়ে নাও। এবার লোকটি একথাও বললেন যে, আপনি আমাকে একটি জামি' (ব্যাপক অর্থবোধক) সূরা পড়িয়ে দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ পড়িয়ে দেন।

বেদুঈন ও অনারব শিক্ষার্থীগণ সাধারণ আরবদের মত কুরআন মাজীদ শুদ্ধ করে পড়তে পারতো না এবং শব্দ-বর্ণের উচ্চারণে তারা ভীষণ সমস্যায় পড়তো। এমন অসহায় লোকদের জন্য নিজেদের মত করে পড়ার অনুমতি ছিল। জাবির (রা) বলেন, আমরা কুরআন পড়ছিলাম। আমাদের মধ্যে বেদুঈন ও অনারব লোকও ছিল। রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বললেন: اِقْرَؤُا فكل حَسَنٌ তোমারা পড়, সবই সুন্দর।[১৫০]

নু'মান ইবন কাওকাল আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, আমি যতটুকু কুরআন পড়ি, ভুলে যাই। অথচ সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন কিছু নেই। আমার এ কথার পরে তিনি বললেন:

يا إبن قوقل المرءمع من أحب ولإمرئ ما احتسب.

হে ইবন কাওকাল! মানুষ যাকে ভালোবাসে তারই সঙ্গে থাকে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম তার নিয়্যাত ও ধারণার উপর নির্ভরশীল।

আবূ 'আবদির রহমান আস সুলামী (রহ) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আমাদেরকে বলতেন, তাঁরা দশ আয়াত পড়ে তার অন্তর্গত সকল জ্ঞান অর্জন না করে পরবর্তী দশ আয়াত পড়তেন না। তাঁরা তাঁদের এই অর্জিত জ্ঞানের উপর 'আমল করতেন।[১৫১]

---

১৫০. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ৫২
১৫১. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ১৪৪

'উমার (রা) দশ বছরে তাফসীর, তাবীল ও তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি সহকারে সূরা আল বাকারার পাঠ শেষ করেন। আর এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে উট যবেহ করেন। তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) চার বছরে একই ভাবে সূরা আল বাকারার পাঠ শেষ করেন।[১৫২]

'আলী (রা)-একবার এক ভাষণে বলেন, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আল্লাহর কসম! তোমরা যে প্রশ্ন করবে আমি তার জবাব দেব। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে প্রশ্ন কর। আল্লাহর কসম! প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, তা দিনে না রাতে, সমতল ভূমিতে না পার্বত্য ভূমিতে, কার সম্পর্কে এবং কোথায় নাযিল হয়েছিল।

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের প্রত্যেকটি আয়াত সম্পর্কে জানি যে, তা কোথায় এবং কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যদি আমি জানতে পারি, কোন ব্যক্তি আমার চেয়েও আল্লাহর কিতাবের বড় 'আলিম তাহলে আমি বাহনের পিঠে চড়ে তার নিকট যাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে সত্তর (৭০)-এর অধিক সূরা অর্জন করেছি। সাহাবীগণ (রা) জানেন, আমি তাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় 'আলিম। যদিও আমি তাদের সবার চেয়ে ভালো নই- وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ.

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সম্পর্কে বলেছেন: نِعْمَ تَرْجُمَانُ القرآن أنت-তুমি কুরআনের কত না সুন্দর মুখপাত্র ও ভাষ্যকার!

আর তিনি আমার জন্য এই দু'আ করেছেন:

اَللّٰهُمَّ بارك فيه و انشر علمه. اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فى الـــدين و عَلِّمْهُ التأ وِيل، اَللّٰهُمَّ آتِهِ الحكمة.

হে আল্লাহ! তার জ্ঞানে সমৃদ্ধি দান কর, তার জ্ঞানের প্রসার ঘটাও। হে আল্লাহ! তাকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান দান কর, তাকে (কুরআনের) তা'বীল শিক্ষা দাও। হে আল্লাহ! তাকে হিকমাত দান কর।

বহু সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে কুরআনের তা'বীল ও তাফসীরের তা'লীম পেয়েছিলেন। তাঁরা আদেশ, নিষেধ, হুকুম-আহকাম, গূঢ় রহস্য, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) তাঁর "আল -ইতকান" গ্রন্থে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দশজনের নাম

---

১৫২. তাবাকাত, খ. ১/১, পৃ. ১২১

উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন: আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, উবাই ইবন কা'ব, যায়দ ইবন ছাবিত, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রাদি আল্লাহু আনহুম। চারজন খালীফার মধ্যে 'আলী (রা) থেকে কুরআনের তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা সবচেয়ে বেশি এবং তুলনামূলকভাবে অন্য তিনজনের বর্ণনা কম। যেমন তাঁদের থেকে হাদীছের বর্ণনাও কম। কারণ তাঁদের সময়ে সাধারণভাবে বর্ণনার প্রচলন ছিল না। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইবন আব্বাসের (রা) তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা সবচেয়ে বেশি।[১৫৩]

৪১. কুরআন হিফয ও কুরআনের হাফিয

সাধারণভাবে আরববাসী উম্মী (নিরক্ষর) ছিল। লেখাপড়া জানতো না। নিজেদের নানা বিষয় স্মৃতিতে ধরে রাখতো। তারা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত প্রখর স্মৃতি শক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে মুখে মুখে কুরআন মুখস্থ করাতেন। থেমে থেমে পড়াতেন ও শোনাতেন এবং কুরআন মুখস্থ করার জন্য তাদের তাকিদ দিতেন। সাধারণভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা) মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, নফল সালাতে তিলাওয়াত করতেন এবং বাড়িতেও তিলাওয়াত করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সায়্যিদুল হুফফায অর্থাৎ হাফিযগণের নেতা। তার বহু সাহাবী কুরআনের হাফিয ছিলেন। যেমন, মুহাজিরদের মধ্যে আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, তালহা, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, হুযায়ফা, আবূ হুরাইরা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আমর ইবন আল-'আস, মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবয যুবায়ব, 'আবদুল্লাহ ইবন সায়িব, 'আয়িশা, উম্মু সালামা (রা)-এবং আনসারদের মধ্যে: উবাই ইবন কা'ব মু'আয ইবন জাবাল, যায়দ ইবন ছাবিত, আবুদ দারদা, মাজমা' ইবন হারিছা, আনাস ইবন মালিক, আবূ যায়দ (কায়স ইবন সাকান) রাদি আল্লাহু আনহুম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই হাফিয সাহাবায়ে কিরামের অনেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর কুরআন হিফয করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বি'রে মা'উনা এর ঘটনায় সত্তর (৭০) জন কুরআনের হাফিয শহীদ হন। তেমনিভাবে প্রথম খালীফা আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফাতকালে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিয সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এর দ্বারাই অনুমান করা যায়, সাহাবায়ে

---

১৫৩. আস-সুয়ূতী, আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন (মিসর), খ.২, পৃ. ১৮৮-১৮৯

কিরামের (রা) মধ্যে কত বেশি সংখ্যক হাফিয ছিলেন। এর বাইরেও বহু সংখ্যক সাহাবী কুরআনের হাফিয ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে কুরআন লিখে মাসহাফের আকারে সংগ্রহ করেছিলেন।

৪২. তাজবীদ ও শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনি

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন "সায়্যিদুল হুফ্ফায ওয়া সায়্যিদুল কুররা।" অত্যন্ত চমৎকার সুরে এবং তাজবীদের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার সালাতে- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করেন এবং এমন সুমধুর সুরে পাঠ করেন যে,

فَمَا سَمِعْتُ أحدًا أَحْسَنُ صَوْتاً منه.

আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠধ্বনি আর কারো কণ্ঠে শুনিনি।

তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বলেছিলেন, যে সবুজ সতেজ কুরআন পড়তে চায়, যেমন তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবন উম্মে 'আবদ ('আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ)-এর পাঠ অনুযায়ী কুরআন পড়ে। আর উবাই ইবন কা'ব (রা) সম্পর্কে তিনি বলেন, সে আমার উম্মাতের সব চেয়ে বড় কারী। সাহাবায়ে কিরামের (রা)-এধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) সম্পর্কে ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) লিখেছেন:[১৫৪]

أعطى حظًّا عظيماً فى تجويد القرآن.

তাজবীদুল কুরআন তথা সুন্দরকরে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে তাকে একটি বিরাট অংশ দান করা হয়েছিল।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) এবং তার গোত্রের লোকেরা চমৎকার কণ্ঠে কুরআন পাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল।

৪৩. কুরআনের শব্দ ও অর্থের মধ্যে মত পার্থক্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের শব্দ ও বর্ণের উচ্চারণ এবং অর্থ ও ভাবের মধ্যে মত পার্থক্য করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মাতগণ নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা)-এক ব্যক্তিকে একটি

---

১৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০০

আয়াত পড়তে শুনলেন। সেই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তিনি ভিন্নভাবে শুনেছিলেন। তিনি বলেন, আমি লোকটির হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো।

তিনি বললেন, তোমরা পড়। তোমরা দু'জনই সঠিকভাবে পড়েছো। মতপার্থক্য করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মতপার্থক্য করেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে।

'উমার (রা) বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীমকে (রা) সালাতে আল-ফুরকান পড়তে শুনলাম। তার কিরাআতে শব্দ ও বর্ণসমূহের উচ্চারণে পার্থক্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এই সূরাটি ভিন্নভাবে পড়িয়েছিলেন। তাই এ ব্যাপারে হিশাম ও আমার মধ্যে একটু কঠোর বাক্য বিনিময় হয় এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে যাই। আমি বললাম, তিনি 'সূরাতুল ফুরকান' সেই কিরাআতের সাথে অমিল এক কিরাআতে পাঠ করেছেন যে কিরাআতে আমাকে আপনি পড়িয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিশামের পাঠ শোনেন এবং বলেন:[১৫৫]

كذلك أنزلت، أن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسَّر منه.

এ সূরা এভাবে নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফের উপর নাযিল হয়েছে। এ কারণে যেটি সহজ হয় সেভাবে পড়।

سبعة أحرف—সাত হরফের ব্যাপারে 'আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার 'আসকালানী (রহ) লিখেছেন:[১৫৬]

أى على سبعة أوجه، بجوز أن يقرء بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولاجملة تُقرء على سبعة أوجهٍ، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءت فى الكلمة الواحدة إلى سبعةٍ.

অর্থাৎ সাতটি পন্থার মধ্যে যে কোন একটি পন্থায় কুরআন পড়া জায়িয।

---

১৫৫. আল বুখারী, বাবু উনযিলাল কুরআনু 'আলা সাব'আতি আহরুফ, খ. ২, পৃ. ১৪৭
১৫৬. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ২৩

অর্থ এই নয় যে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ অথবা প্রতিটি বাক্য সাত পন্থায় পড়া যাবে, বরং এর অর্থ হলো একটি كلمة তথা শব্দে কিরাআতের চূড়ান্ত সীমা সাত পর্যন্ত।

কুরাইশ, যাঁরা ছিলেন "আফসাহুল আরব" তথা আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষী, তাঁদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়। আরবের অন্যান্য স্থান ও গোত্রের লোকেরা তাদের স্থানীয় বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণে আরবী ভাষা বলতো। দীর্ঘকাল যাবত যা তাদের ভাষায় চালু ছিল। উচ্চারণের সময় তারা একটি বর্ণকে অন্য একটি বর্ণে পরিবর্তন করে ফেলতো। ই'রাব ও হরকতেও পরিবর্তন করতো। এ কারণে তারা কুরাইশদের ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন পড়তে পারতো না। কিছু কিছু বর্ণ ও ধ্বনি উচ্চারণ করা তাদের জন্য ভীষণ কঠিন মনে হতো। এ কারণে তারা তাদের নিজেদের মত করে উচ্চারণ করতো। শব্দ ও বর্ণের এই ভিন্ন উচ্চারণে ভাব ও অর্থের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতো না। যেমন: রাবীআ ও মুদার গোত্রদ্বয় স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত ك এর শেষে ش যোগ করতো এবং পুং লিঙ্গের ك এর শেষে س বাড়িয়ে দিত। তামীম গোত্র ألف কে ع এ পরিবর্তন করতো এবং বানূ হুযাইল ح কে ع বলতো। বানূ হুযাইল, বানূ আযদ, বানূ কায়স ও মাদীনার আনসারগণ ع সাকিনকে ن দ্বারা পরিবর্তন করতো।

আশা'ইরা গোত্র لام এর স্থলে م বলতো। এভাবে إمالة، قصر، مدّ، حركت প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্র নিজেদের মত করে পড়তো। অনেক গোত্র স্ত্রী লিঙ্গের ك বর্ণটি ش এ পরিবর্তন করে এ আয়াতটি– قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحتَكِ سَرِيًّا পড়তো এভাবে :

قَدْ جَعَلَ رَبُّشِ تَحتَشِ سَرِيًّا

তবে পড়াতে শব্দের পার্থক্যের কারণে অর্থে কোন পরিবর্তন হয় নি।[১৫৭]

এ ধরনের শব্দ, বর্ণ ও ধ্বনিগত পার্থক্য প্রায় সকল ভাষাতেই হয়ে থাকে এবং একটাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে ভাব ও অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য হয় না।

৪৪. হাদীছের তা'লীম

নুবুওয়াত লাভের পর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ

১৫৭. বিস্তারিত জানার জন্য সুয়ূতির 'আল মুযহির ফিল লুগাহ, ছা'আলিবীর 'ফিকহুল লুগাহ' ও ইবন কুতায়বার 'আদাবুল কাতিব', দ্রষ্টব্য

লিখতে নিষেধ করেন। কারণ ওহী লেখালেখির সাথে হাদীছ লেখালেখি হলে দু'টিতেই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হতে পারতো। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন:

لا تكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن فمن كتب عنى شيئا فليمحه.

তোমরা আমার থেকে কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখবে না। কেউ যদি কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেল।

তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাতে আমাদেরকে হাদীছ লেখার অনুমতি দেন সে জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নি।[১৫৮]

তবে পরে হাদীছ লেখার অনুমতি দেয়া হয়। একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দারসের মাজলিসে বসে হাদীছ শুনতেন, কিন্তু তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন না। তিনি সেকথা অত্যন্ত দুঃখের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানালেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:

تعن بيمينك و أو مَأ بيده الخطَّ.

তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও।

একথা বলে তিনি নিজের হাত দিয়ে লেখার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১৫৯]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) ইবন আল-'আস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আমি আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনি তা কি লিখে নেব? বললেন: হ্যাঁ। 'আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন: আপনার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থার যাবতীয় কথা কি লিখবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমার মুখ থেকে সর্ব অবস্থায় কেবল সত্যই উচ্চারিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাদীছ স্মৃতিতে ধারণকারী ও লিপিবদ্ধকারী, উভয় শ্রেণীরই ছিলেন। তাঁদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা ছিল, হাদীছে যেন কোন ভাবেই পার্থক্য না হয়। আর যদি কিছু শব্দ ও বাচনভঙ্গিতে সামান্য পরিবর্তন হয়ে যায় তবে যেন ভাব ও অর্থ এবং উদ্দেশ্যে যেন

---

১৫৮. আল মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃ. ৩৭৯

১৫৯. তিরমিযী, বাবুন ফির রুখ্সাতি ফী কিতাবাতিল 'ইলম

ভিন্নতা না হয়। সুলায়মান ইবন উকায়মা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, আমরা আপনার নিকট থেকে যেভাবে হাদীছ শুনি তা হুবহু সেভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হই না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إذا لم تُحِلُّوا حرَاماً وَلَمْ تُحَرِّمــوا حَــلاَلاً وَ أصــبتم المعنى فلاَ بأس به.

যখন তোমরা হারামকে হালাল, হালালকে হারাম করবে না এবং সঠিক ভাব ও অর্থ বর্ণনা করবে, তখন তাতে কোন দোষ নেই।[১৬০]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারা' ইবন 'আযিবকে (রা) ঘুমানোর সময় পড়ার জন্য একটি দু'আ শিক্ষা দেন। দু'আটির মধ্যে এই কথাগুলো ছিল:

اَمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ.

আমি ঈমান এনেছি আপনার কিতাবের উপর যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর উপর যাঁকে আপনি পাঠিয়েছেন।

বারা' (রা) পরবর্তীতে দু'আটি আবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শোনান, কিন্তু بِنَبِيِّكَ এর স্থলে بِرَسُوْلِكَ পাঠ করেন। সাথে সাথে তিনি بِنَبِيِّكَ বলে বারার (রা) ভুল সংশোধন করে দেন।[১৬১]

এ কারণে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অনেকে رواية باللفظ অর্থাৎ শ্রুত হাদীছ শব্দ ও বাক্য হুবহু বর্ণনার উপর জোর দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাবে তা 'আমল করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের এ দু'আ শিক্ষা দেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعُوْثَاءِ السَّفَرِوكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ.

হে আল্লাহ! আমি সফরের ক্লান্তি এবং স্থান পরিবর্তনের কষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

আবূ হুরাইরা (রা)-এ হাদীছের বর্ণনার ক্ষেত্রে وَعُوْثَاءِ বলতেন। অথচ তিনি আরবী ভাষাভাষী ছিলেন। তিনি وَعْثَاءِ বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে যা শুনেছেন তা-ই বলতেন।

---

১৬০. জাম'উল ফাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ৫১; আল-কিফাইয়া, পৃ. ১৯৯
১৬১. আল-কিফাইয়া, পৃ. ১৭৫

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশা'ইরা গোত্রের উপভাষা বলেন:

ليس من امبرّ، امصيام فى امسفر (لَيْسَ مِـنَ الْبِـرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)

সফরে সাওম পালন কোন পুণ্যের কাজ নয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে বলেছেন, হুবহু সেইভাবে বর্ণনা করতেন। আশাইরা গোত্র ل কে م এ পরিবর্তন করে বলতো।[১৬২]

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন:

من كذبَ عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। মাজলিস ভেঙ্গে গেলে আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কিভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন, অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এমন শাস্তির কথা বললেন? তাঁরা হেসে বললেন? ভাতিজা! আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছি তা আমাদের নিকট গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।[১৬৩]

ইয়াযীদ ইবন সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আমি আপনার মুখ থেকে বহু হাদীছ শুনেছি। আমার ভয় হয় যে, শেষের দিকে শোনা হাদীছগুলো প্রথম দিকে শোনা হাদীছগুলোকে ভুলিয়ে না দেয়। এ কারণে আপনি আমাকে একটি ব্যাপক অর্থবোধক হাদীছ শোনান। তিনি বললেন:

اتَّقِ اللهَ فِيْ مَا تَعْلَمُ

তুমি যা জান সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, মানুষে বলাবলি করে যে, আবূ হুরাইরা (রা) অনেক বেশি

---

১৬২. প্রাগুক্ত
১৬৩. আল মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃ. ৩৭৮

হাদীছ বর্ণনা করে। আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করতাম না, যদি আল্লাহর কিতাবে এ দু'টি আয়াত না থাকতো:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدٰى الٰــى قَوْلِهِ الرَّحِيْم.

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। –সূরা আল বাকারা : ১৫৯-১৬০।

আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে বাজারে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যস্ত রেখেছিল, আর আমাদের আনসার ভাইদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল তাদের উদ্যান ও ক্ষেত খামার। আর আবূ হুরাইরা (রা) ন্যুনতম খাবার খেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে পড়ে থাকতো। তারা যেখানে উপস্থিত থাকতে পারতো না, আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম। আর যে সব কথা তারা মনে রাখতে পারতো না আমি তা মুখস্থ করে নিতাম। একবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে বহু হাদীছ শুনে থাকি এবং তা ভুলে যাই। তিনি বললেন: তুমি তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। আমি আদেশ পালন করলাম। তিনি চাদরের উপর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা গুটিয়ে নাও। আমি তাই করলাম। এরপর থেকে আমি কোন হাদীছ ভুলিনি। আমার চেয়ে কোন ব্যক্তি হাদীছের বড় 'আলিম ছিল না। অবশ্য 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) সকল হাদীছ লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।[১৬৪]

কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে ইসলামী শরী'আত ও বিধি-বিধান এবং তার মৌলনীতি ও শাখা-প্রশাখা বর্ণিত হয়েছে। আর তাই হলো যাবতীয় মাসআলা ও ফাতওয়ার উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়কালে ফিকহ এর ভিন্ন কোন শিরোনাম ছিল না। আর تَفَقُّهٌ বলতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি বুঝাতো।

৪৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেখা শেখার উপর জোর দেন

তৎকালীন আরবে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল অনেক কম, তারা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত স্মৃতিশক্তির কারণে লেখার তেমন প্রয়োজন বোধ করতো না, এমন কি আরবের

১৬৪. আল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ৪৪

সবচেয়ে বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবের সময় মাত্র সতেরো (১৭) জন মানুষ লিখতে জানতো। তারা ছিল কা'বার মুতাওয়াল্লী, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের, রোম ও পারস্যের শাসকগণের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল এবং তারা ছিল সমগ্র আরবের ধর্মীয় পুরোহিত। এতকিছু সত্ত্বেও তাদের লেখাপড়া ছিল খুবই কম। মক্কায় যে সতেরো ব্যক্তি লিখতে জানতেন বালাযুরীর বর্ণনা মতে তাঁরা হলেন ঃ

'উমার ইবন আল- খাত্তাব, 'আলী ইবন আবী তালিব, 'উছমান ইবন 'আফ্ফান, আবু 'উবায়দা ইবন আল- জাররাহ্, তালহা, ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান, আবু হুযায়ফা ইবন 'উতবা ইবন রাবী'আ, হাতিব ইবন 'আমর আল-আমিরী, আবূ সালামা ইবন 'আবদিল আসাদ আল মাখযূমী, আবান ইবন সা'ঈদ ইবন আল- 'আস ইবন উমাইয়্যা, তাঁর ভাই খালিদ ইবন সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবী সারাহ আল-'আমিরী, হুয়ায়তিব ইবন 'আবদিল 'উযযা আল- 'আমিরী, আবু সুফইয়ান ইবন হার্‌ব ইবন উমাইয়্যা, মু'আবিয়্যা ইবন আবী সুফইয়ান, জুহাইম ইবন আস-সাল্‌ত ইবন মাখরামা, আল- 'আলা' ইবন আল-হাদরামী। শেষোক্ত জন প্রকৃতপক্ষে কুরাইশ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কুরাইশদের হালীফ তথা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি।[১৬৫]

এমনি ভাবে মাদীনার আনসার গোত্রসমূহের মধ্যেও এর প্রচলন কম ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোক লিখতে জানতো। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েক জন হলেন: সা'দ ইবন 'উবাদা, মুনযির ইবন 'আমর, উবাই ইবন কা'ব, যায়দ ইবন ছাবিত, রাফি' ইবন মালিক, উসাইদ ইবন হুদাইর, মা'ন ইবন আদী বালবী- হালীফুল আনসার, বাশীর ইবন সা'দ ইবন রাবী', আওস ইবন খাওলী, 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই মুনাফিক, এবং পরবর্তীতে যায়দ ইবন ছাবিত আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষাতে লিখতেন।[১৬৬] 'উবাদা ইবন সামিতও (রা) লিখতে জানতেন এবং অন্যদেরকে লেখা শেখাতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাদানের সাথে লিখতে শেখার ব্যবস্থাও করেন। যায়দ ইবন ছাবিতকে (রা) হিব্রু ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার নির্দেশ দেন। কারণ ইহুদীদের সাথে তাঁর চুক্তি পত্র ও চিঠিপত্র লেখালেখির খুবই প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ[১৬৭]

---

১৬৫. বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান, খ.৩, পৃ.৫৮০

১৬৬. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৮৩

১৬৭. আল বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু তারজামাতুল হুক্কাম; তিরমিযী, খ.৪, পৃ. ১৬৭; কিতাবুল ইসতি'যান ওয়াল আদাবঃ বাবুন ফী তা'লীম আস-সুরইয়ানিয়্যাহ্

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلّم له كلماتٍ من كتاب يهود، وقال : إني والله ما امن يهود على كتابي، قال : فما مَرَّبي نصف شهرٍ حتى تَعلَّمْتُهُ له، قال : فلما تعلَّمتُه كان إذا كتب إلى يهود كتبتُ إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابهم.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁর জন্য ইহুদীদের লেখার কিছু কথা শিখি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম ! আমার লেখা-লেখির ব্যাপারে আমি ইহুদীদের উপর বিশ্বাস করতে পারি না। যায়দ বলেন, অতঃপর অর্ধমাস অতিক্রম না করতেই আমি তা শিখে ফেলি। আমার লেখা শেখার পর যখনই তিনি ইহুদীদের প্রতি কোন কিছু লিখতে চাইতেন, আমি তা লিখতাম। আর ইহুদীরা তাঁকে কোন কিছু লিখলে আমি তাদের সেই লেখা পড়তাম।

অবশ্য তিরমিযীর বর্ণনায় সুরইয়ানী ভাষার কথা এসেছে। যেমনঃ যায়দ- ইবন ছাবিত বলেনঃ

أمرني رسول الله صلى الله عيه وسلم أن أتعلم السُّريانية.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে সুরইয়ানী ভাষা শেখার নির্দেশ দেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই কর্মদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী দা'ওয়াত, তাবলীগ ও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা শিখতে হবে।

হিজরাতের দ্বিতীয় বছরে বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের বন্দী করে মাদীনায় আনা হয়। তাদের অনেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়। আর যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি, তবে লেখা জানতো, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা মুক্তিপণ হিসেবে দশজন মুসলিম কিশোরকে লেখা শেখাবে। তাবাকাতে ইবন সা'দে এসেছে।

كان فداء أسارىٰ بدر أربعة آلاف ألى ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شئ أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة.

বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ ছিল চারহাজার দিরহাম বা তার চেয়ে কম। যে বন্দীর কিছুই ছিল না তাকে আনসারদের দশজন কিশোরকে লেখা শেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

ইবন সা'দ অন্যত্র বলেন:[১৬৮]

فمن لم يكن عنده علَّم عشرة من المسلمين الكتابة.

যাদের নিকট মুক্তিপণের অর্থ ছিল না তারা দশজন মুসলিমকে লেখা শেখায়।

একটি বর্ণনা মতে ষাটজন বন্দী এমন ছিল যারা প্রত্যেকে আনসারদের দশজন কিশোরকে লেখা শেখায় এবং সর্বমোট ছয়শো জন আনসার কিশোর লেখা শেখে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) লেখা শেখাতেন। 'উবাদা ইবন সামিত (রা) "আসহাবে সুফ্‌ফা"কে কুরআনের তা'লীমের সাথে সাথে লেখার তা'লীমও দিতেন। একবার তাঁর একজন ছাত্র তাঁকে একটি ধনুক উপহার দেন এবং সেই ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবহিত করেন এভাবে:[১৬৯]

علَّمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتاب فأهدى إلى رجل منهم قوسًا ألخ.

আমি আহ্‌লি সুফ্‌ফার কয়েকজন লোককে কুরআন ও লেখার তা'লীম দিয়েছি এবং তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা গ্রহণ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেন।

শিফা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ 'আদাবিয়্যা (রা) জাহিলী যুগেই লিখতে জানতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:

عن عبد الله بن عبد الله بن عقبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله العدوية: ألاتعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة، و كانت الشفاء كاتبة فى الجاهليه.

---

১৬৮. তাবাকাত, খ.২, পৃ.২২
১৬৯. আবূ দাঊদ, কিতাবুল ইজারাহ্ : বাবু কাসবিল 'ইলম

তুমি হাফসাকে (রা) লেখা শিখিয়েছো, 'নামলা'র ঝাঁড়-ফুঁকও শিখিয়ে দাও।[১৭০]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশেষ উদ্যোগ এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) অত্যধিক আবেগ-আগ্রহের কারণে অতিদ্রুত লেখালেখি ব্যাপক হয়ে যায়। প্রতিটি গৃহে লেখাপড়া জানা লোক তৈরি হয়ে যায়। যাঁরা এক সময় কলম ধরতে জানতেন না তাঁরাই আল্লাহর ওহী ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ ছাড়াও দুনিয়ার বাদশাহ্ ও সম্রাটদের নিকট পত্র লিখতে আরম্ভ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে লিখতে জানতেন না, তবে লেখকদেরকে লেখার আদব-কায়দা শেখাতেন। তিনি বলেন:

إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربّه فإنه أنجح للحاجة.

তোমাদের কেউ যখন কিছু লেখে তখন তার উপর যেন মাটি ছড়িয়ে দেয়। কারণ এ জাতীয় লেখা উদ্দেশ্য সাধনে বেশি কার্যকরী।

সদ্য লেখার উপর মাটি ছড়িয়ে দেয়ার একটি বাহ্যিক উপকারিতা এই হতে পারে যে, কালি ছাড়িয়ে পড়বে না এবং অক্ষরগুলো স্পষ্ট হবে। ফলে তা পড়তে ও বুঝতে কোন সমস্যা হবে না। যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম, তখন তাঁর সামনে একজন লেখক কিছু লিখছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেনঃ[১৭১]

ضع القلم على أذنك فانه أذكر للمملى.

তুমি কলমটি তোমার কানের উপর রাখ। এতে লেখক যা লিখতে চায় তা স্মরণ হবে।

৪৬. علم الأنساب বা বংশ বিদ্যা শেখার জন্য উৎসাহদান

ইলমে দীন অর্জন ছাড়াও অন্য কিছু জ্ঞানও প্রয়োজন পরিমাণ অর্জন করার অনুমতি ছিল। বিশেষ করে علم الأنساب বা বংশ বিদ্যার গুরুত্ব ছিল অনেক। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিদ্যা অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) উৎসাহ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। উত্তরাধিকার, বিয়ে-শাদী, রক্ত সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর

---

১৭০. ফুতূহ আল-বুলদান, খ.৩, পৃ.৫৮০
১৭১. তিরমিযী, বাবু মা জা আ ফী তাতরীবিল কিতাব

প্রয়োজন পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

تَعَلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فان صلة الرحم محبة فى الأهل، مثرا ة فى المال، منساة فـــى الأثر، مرضاة للرب.

তোমরা বংশ বিদ্যার এতটুকু শেখ যাতে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পার, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখলে পরিবারের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসা, অর্থ-সম্পদের বৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু এবং রব বা প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বয়ে আনে।

সাহাবায়ে কিরামের (রা)-মধ্যে আবূ বাকর সিদ্দীক, আবু জাহ্‌ম ইবন হুযায়ফা আল-'আদাবী, জুবাইর ইবন মুত'ঈম ইবন 'আদী (রা) علم الأنساب (কুষ্ঠি বিদ্যা)-এর সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। 'উমার, 'উছমান ও 'আলীর (রা)-এ বিষয়ে খ্যাতি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিতকে (রা) বলেন, প্রয়োজনের সময় আবু বাকরের (রা) নিকট থেকে কুরাইশদের বংশ বিষয়ে তথ্যাবলী গ্রহণ করবে।[১৭২]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে নববীতে গেলেন। দেখলেন, কিছু সাহাবী এক ব্যক্তির নিকট বসে আছেন। তিনি এভাবে বসে থাকার কারণ জানতে চাইলেন। সাহাবীগণ বললেন, একজন 'আল্লামা (বড় জ্ঞানী ব্যক্তি)-এসেছেন। তিনি জানতে চাইলেন, এর অর্থ কি? সাহাবীগণ বললেন, এ ব্যক্তি মানব জাতির অতীত ঘটনাবলী, আরবদের ইতিহাস, কবিতা এবং আরবদের বংশ বিদ্যার 'আলিম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ বিদ্যা ক্ষতিকর নয়।[১৭৩]

৪৭. স্থানীয় শিক্ষার্থী তথা আসহাবে সুফ্‌ফার থাকা-খাওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা মাজলিসে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনা ছিল পৃথক পৃথক। স্থানীয় শিক্ষার্থী অর্থাৎ আসহাবে সুফ্‌ফার আবাসস্থল ছিল মাসজিদে নববী এবং এর সুফ্‌ফা। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ষাট-

---

১৭২. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, পৃ.৮
১৭৩. সাম'আনী, আনসাবুল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ৮

সত্তর (৬০-৭০) জন হতো। প্রথম দিকে আসহাবে সুফ্ফা ভীষণ অর্থকষ্ট ও দরিদ্রক্লীষ্ট জীবন যাপন করতেন। আবূ হুরাইরা (রা) নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ আমি ক্ষুধার কারণে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। একদিন মাসজিদে নববীর দরজায় বসে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, আবু হুরাইরা! আমার সাথে চলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে চললাম। তিনি ভেতরে যেয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি ভেতরে ঢুকে দেখি একটি পিয়ালায় কিছু দুধ। তিনি ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? বলা হলো, অমুক আপনাকে হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আবু হুরাইরা! তুমি আসহাবে সুফ্ফার সকলকে ডেকে আন। আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাঁদের না ছিল পরিবার-পরিজন, না ছিল অর্থ-বিত্ত এবং না ছিল তাদের কোন দায়িত্ব গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু দান-সাদাকা আসলে তিনি তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নিজে তা কোন কাজে লাগাতেন না। তবে হাদিয়া- উপহার আসলে নিজে ব্যবহার করতেন। আসহাবে সুফ্ফাকেও তাতে শরীক করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশের পর আমি ভাবলাম দুধ মাত্র এক পেয়ালা আর আসহাবে সুফ্ফার সংখ্যা অনেক। যদি এতটুকু দুধ আমি একা পান করতে পারতাম তাহলে একটু শক্তি পেতাম। যাই হোক, আমি সবাইকে ডেকে আনলাম। যখন সবাই বসে গেল তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাদের হাতে পেয়ালা দাও। আমি নির্দেশ পালন করলাম। প্রত্যেকে দুধ পান করে পেয়ালাটি আমার হাতে দিচ্ছিল, আর আমি আরেকজনকে দিচ্ছিলাম। এভাবে সকলে পেট ভরে দুধ পান করলো। সবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেয়ালাটি হাতে নেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, এখন আমি আর তুমি। তুমি পান কর। আমি পান করলাম এবং শেষে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আর এক ঢোকও পান করতে পারবো না। তারপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজে পান করেন।

ফুদালা ইবন 'উবায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে ইমামতি করতেন। পেছনে আসহাবে সুফ্ফা প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে পড়ে যেতেন। বহিরাগত বেদুঈনরা তাদেরকে পাগল ও বিকৃত মস্তিস্ক মনে করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করে তাদের নিকট যেতেন এবং এই বলে সান্ত্বনা দিতেন :

لو تعلمون مالكم عند الله تعالى لأحببتم أن تــزدادوا فاقة وحاجة.

যদি তোমরা জানতে আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে, তাহলে তোমরা চাইতে যে, তোমাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র আরো বেড়ে যাক।

তালহা ইবন 'আমর আল-বাসরী (রা) আসহাবে সুফ্ফার একজন। তিনি বলেন, আমি মাদীনায় আসলাম। সেখানে আমার কোন আত্মীয় বা পরিচিত জন ছিল না। এ কারণে সুফ্ফাতে একজনের সাথে থাকতে লাগলাম। আমরা দু'জন প্রতিদিন এক মুঠ পরিমাণ খেজুর পেতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন। আসহাবে সুফ্ফার এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে বলেনঃ

يَارَسُوْلَ اللهِ أحرق التمر بطوننــا وتحرفــت علينــا الحرف.

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খেজুর আমাদের পেট জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের কাজসমূহও কঠিন হয়ে গেছে।

লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরের উপর গিয়ে বসেন এবং ভাষণ দেন। তাতে বলেন: মক্কায় আমার ও আমার সাহাবীদের উপর দিয়ে এমন দশদিন অতিক্রান্ত হয়েছে যাতে আমরা কেবল 'ইরাক' (إراك) বৃক্ষের ফল খেয়ে বেঁচে থেকেছি। আর যখন আমরা হিজরাত করে আমাদের ভাই আনসারদের এখানে এসেছি তখন দেখলাম যে, তাদের সাধারণ খাদ্য হলো খেজুর। তারা আমাদের প্রতি সব রকম সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তারপর বলেন:[১৭৪]

ولو أجد لكم جدكم الخبز واللحم لأطعمتكم ولكن لعلكم ستد ركون زمانًا أومن أدركه منكم يلبسون فيه مثــل أستار الكعبة ويغدى ويراح عليكم بالجفان.

যদি আমি তোমাদের জন্য গোশত-রুটি পেতাম তাহলে তাই খাওয়াতাম। ধৈর্য ধর। অতি শীঘ্র তোমরা এমন সময় লাভ করবে অথবা তোমাদের কেউ কেউ লাভ করবে যখন কা'বার গিলাফের মত দামী

১৭৪. উসুদুল গাবা, খ. ৩, পৃ. ৬২; ওয়াফা' আল-ওয়াফা' পৃ.৪০৬

পোশাক পরিধান করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের নিকট খাবারের খাঞ্চা উপস্থিত হবে।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি এমন সময় মাসজিদে গেলাম, যখন সাধারণত যাই না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এ সময় কেন এসেছো? আমি তীব্র ক্ষুধার কথা জানালাম। এর মধ্যে সুফ্ফার আরো কয়েকজন সদস্য এসে গেল। তিনি ভেতর থেকে খেজুর ভর্তি একটি ডালি আনিয়ে আমাদের প্রত্যেকের হাতে দু'টি করে খেজুর দিয়ে বলেন, তোমরা এগুলো খেয়ে পানি পান করবে। আজকের মত এই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[১৭৫]

পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের খাবারের ভিন্ন ব্যবস্থা করেন। তিনি আনসারদের নির্দেশ দেন, যার গৃহে দু'জনের খাবার আছে সে তৃতীয় একজন সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর যার গৃহে চারজনের খাবার আছে সে পঞ্চম ও ষষ্ঠ জনকে নিয়ে যাবে। আনসারগণ নিজেরাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতেন, আমাদের বাড়িতে একজন, দু'জন করে লোক পাঠিয়ে দিন। মালে গনীমতের যে অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে আসতো তা দ্বারাও আসহাবে সুফ্ফা ও বহিরাগত শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বানূ নাদীর, বানূ কুরায়জা, খাইবার, ফিদাক প্রভৃতি স্থান হতে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত অংশে গরীব-মিসকীন, মুসাফির ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের অংশ ছিল।

আনসারদের মধ্যে সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) আসহাবে সুফ্ফা ও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আরব প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় সবার চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। জাহিলী যুগ থেকেই তাঁর পিতা, পিতামহ এবং নিজে বদান্যতা ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রতিদিন তাঁদের বাড়ি থেকে ঘোষণা করা হতো, "যারা গোশত ও চর্বি খেতে চাও, চলে এসো।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আসার পর তাঁর নিকট সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) বাড়ি থেকে খাবারের খাঞ্চা আসতো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্ধ্যায় আমাদের নিকট আসতেন এবং একজন সাহাবীর সাথে এক বা একাধিক সুফ্ফার সদস্যকে পাঠিয়ে দিতেন। অনেক সময় প্রায় দশজন সদস্য অতিরিক্ত থেকে যেতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাবার আনা হতো এবং সকলে একসাথে খেয়ে নিতাম। তারপর তিনি বলতেন: ناموا

---

১৭৫. তাবাকাত, খ.৪ পৃ. ৩২৯

في المسجد তোমরা সবাই মাসজিদে ঘুমিয়ে পড়। সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) অনেক সময় রাতে আশিজন আসহাবে সুফ্ফাকে খাওয়াতেন।[১৭৬]

আসহাবে সুফ্ফার অনেকে নিজ নিজ খাদ্য ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতেন, অন্যের বোঝা হতে চাইতেন না। বি'রে মা'উনার ঘটনায় যে সত্তর (৭০) জন কারী শহীদ হন তাঁদের সম্পর্কে আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন:[১৭৭]

وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد و يحتطيون ويبيعونه، يشترون الطعام لأهــل الصــفة والفقراء.

তাঁরা দিনে পানি এনে মাসজিদে রাখতেন, কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করতেন এবং সেই অর্থ দিয়ে আসহাবে সুফ্ফা ও দরিদ্রদের খাবার কিনতেন।

একবার আবূ বাকর সিদ্দিক (রা) সুফ্ফার তিন সদস্যকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আহার করেন। সালাতুল 'ইশার পর গভীর রাতে বাড়িতে ফিরে জানতে পারেন, তাঁরা তখনও আহার করেননি। বেগম সাহেবার নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। অতঃপর তাঁরা আহার করেন এবং সেই খাবারে খুবই বরকত হয়েছিল।

আসহাবে সুফ্ফার পানাহারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণভাবে আবূ হুরাইরার (রা) উপর ছিল। তিনি খাইবার যুদ্ধের পর মাদীনায় আসেন। সে সময় তাঁর বয়স তিরিশ বছরের কিছু বেশি ছিল। আর তখন থেকেই স্থায়ীভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য অবলম্বন করেন। তাঁর মধ্যে অতিথি সেবার বিশেষ রুচি ছিল। গিফার গোত্রের একজন অতিথি বলেন, আমি আবূ হুরাইরার (রা) অতিথি হয়েছি, সাহাবী সমাজের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় অতিথি সেবক আর কাউকে দেখিনি।

আনসারগণ আসহাবে সুফ্ফার জন্য নিজেদের বাগান থেকে খেজুরের কাঁদি কেটে পাঠাতেন এবং তা মাসজিদে নববীর দুই স্তম্ভের মাঝখানে রশি টানিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আসহাবে সুফ্ফা সেখান থেকে খেজুর ছিঁড়ে খেতেন। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মু'আয ইবন জাবাল (রা)। এই খেজুর ঝুলিয়ে রাখার প্রথা পরবর্তী বহু

---

১৭৬. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ.৩, পৃ.৮০
১৭৭. ফাতহুল বারী, খ.৭, পৃ.৩৮৭

বছর যাবত বিদ্যমান ছিল। মাদীনাবাসীগণ তাদের বাগানের খেজুরের কাঁদি মাসজিদে নববীতে রশিতে ঝুলিয়ে রাখতো এবং মুসল্লীগণ সেখান থেকে ছিঁড়ে খেত।[১৭৮]

মাসজিদে নববীই ছিল আসহাবে সুফ্ফার আবাসন। এছাড়া তাঁদের আর কোন ঠিকানা ছিল না। সেখানেই তাঁরা ঘুমাতেন। তাখফা ইবন কায়স আল গিফারী (রা) ছিলেন সুফ্ফার সদস্য। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে নববীতে রাতের শেষাংশে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পা ধরে নাড়া দেয় এবং বলে এভাবে শোয়া আল্লাহর পছন্দ নয়। আমি তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে আছেন।

৪৮. বহিরাগত শিক্ষার্থী অর্থাৎ প্রতিনিধিদল ও বিভিন্ন ব্যক্তির থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা

বহিরাগত শিক্ষার্থী অর্থাৎ যাঁরা নতুন এসেছেন, প্রতিনিধি দল- যাঁরা দূর-দূরান্ত ও বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিসে উপস্থিত হয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্হ ও ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করতেন, মাদীনায় তাঁদের অবস্থান হতো সাময়িক। তাঁরা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকায় তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ব্যাপক ভাবে ছাড়িয়ে দিতেন। শিক্ষার্থীরা বিপদসঙ্কুল ও কষ্টকর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসতেন। আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল বাহরাইন থেকে আসেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট। তাঁরা বলেন, আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফির গোত্র মুদার-এর অবস্থান। এ কারণে কেবল হারাম মাসগুলোতে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি। আপনি আমাদেরকে দীন শিক্ষা দিন, যাতে আমরা তা আমাদের স্থানীয় লোকদের শিখিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। 'আবদুল কায়স গোত্র মাদীনায় উপস্থিত হবার পূর্বেই সেদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে অবহিত করেন যে, মুশরিক গোত্র 'আবদুল কায়স এর কাফিলা আসছে, তাদের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা অর্থ-বিত্ত লাভের আশায়ও আসছে না। হে আল্লাহ! 'আবদুল কায়স গোত্রকে তুমি ক্ষমা কর। তারা পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ।

কোন প্রতিনিধিদলের আগমনে মাদীনায় দারুণ সাড়া পড়ে যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের স্বাগতম জানাতেন এবং তাদেরকে খুশি করার ও অতিথেয়তার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করতেন। তাদের শিক্ষাদান কর্মসূচির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১৭৮. ওয়াফা' আল- ওয়াফা; পৃ. ৪৫৩-৪৫৮

ছাড়াও আবূ বাকর, উবাই ইবন কা'ব, সা'দ ইবন উবাদা, উবাদা ইবন সামিত (রা) প্রমুখ সাহাবাই (রা) তাদেরকে কুরআন, ফিক্হ ও ইসলামী শরী'আতের তা'লীম দিতেন। 'আবদুল কায়স গোত্রের নেতা 'আবদুল্লাহ আল-আশাজ্জ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ[১৭৯]

يسأل رسول الله صلى عليه وسلم عن الفقه و القرآن.

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ফিক্হ ও কুরআন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে মাসজিদে নববীর চত্বরে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেন। যাতে তারা মানুষের কুরআন পড়া শুনতে পায় ও সালাত আদায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা) ছিলেন সবচেয়ে অল্প বয়সী, তবে তিনি সবার চেয়ে বেশি কুরআনের তা'লীম হাসিল করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরাও কুরআন পড়েন। তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وُعلِّمُوْا القرآن

তাদেরকে কুরআনের তা'লীম দেয়া হয়।[১৮০]

গামিদ গোত্রের প্রতিনিধিদল মাদীনায় এসে জান্নাতুল বাকী' এলাকায় অবস্থান নেন। উবাই ইবন কা'ব (রা) তাদের নিকট যেয়ে কুরআন শিক্ষা দেন। আবূ ছা'লাবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনি আমাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিন যিনি আমাকে ভালো মত কুরআনের তা'লীম দিতে পারেন। তিনি আমাকে আবূ উবায়দা ইবন আল-জার্রাহর (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন এবং বলেন ঃ

دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك و أدبك

আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠালাম যে তোমাকে ভালোমত তা'লীম দেবে ও আদব শিখাবে।

খাওলান প্রতিনিধিদলের জন্য রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ নির্দেশনা ছিল যে, তাদেরকে যেন কুরআন ও সুন্নাহ্র তা'লীম দেয়া হয়। বানূ হানীফা প্রতিনিধিদলের সদস্য রাহহাল ইবন 'আনফারা (রা) উবাই ইবন কা'বের (রা) নিকট

---

১৭৯. তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ৩১৫
১৮০. প্রাগুক্ত; যাদুল মা'আদ, খ. ১, পৃ. ৩১৫

গিয়ে কুরআন শিখতেন। মুরাদ গোত্রের ফারওয়া ইবন মাসীক ওঠেন সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) বাড়িতে এবং তাঁর নিকট থেকেই কুরআন, ইসলামের ফরজ সমূহ ও শরী'আতের তা'লীম পান। মুসায়লামা আল-কায্যাবের পাঠানো প্রতিনিধি দলটির মধ্যে ওয়াবরাহ ইবন মাশহার হানাফীও ছিলেন। দলটির অন্য সদস্যরা ফিরে গেলেও ওয়াবরাহ্ ইবন মাশহার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে থেকে যান এবং কুরআনের তা'লীম লাভ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতিকালের পর তিনি 'আকার' নামক স্থানে তাঁর মায়ের নিকট চলে যান। বাহ্‌রা-এর প্রতিনিধিদলটি ইসলাম গ্রহণের পর কয়েকদিন মাদীনায় অবস্থান করেন এবং কুরআনের তা'লীম লাভ করেন। রুহাবীনের প্রতিনিধিদলটি কুরআন ও ইসলামের ফরজসমূহের শিক্ষা লাভ করেন। বালআম্বর প্রতিনিধিদলের হারমালা ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন, আমাদের দলটি ফেরার সময় আমি চিন্তা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট অবস্থান করে আমি আরো বেশি তা'লীম নেব। আমি থেকে গেলাম এবং প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ফিরে গেল।

তুজীব প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। তারা বলেলো, আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের ওখানকার লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাৎ ও তাঁর সাথে কথা বলার ঘটনাবলী শোনাবো। বানূ 'আব্‌সের প্রতিনিধিদল বলেন যে, আমাদের কারীগণ মাদীনা থেকে ফিরে গিয়ে বলেছেন, হিজরাত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের আছে অর্থ-সম্পদ ও পালিত জীব-জন্তু, যার উপর আমাদের জীবিকা নির্ভরশীল। যদি কথা এটাই হয় তাহলে সবকিছু বিক্রি করে আমরা এখান থেকে হিজরাত করে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ইসলামী আবেগ ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা দেখে বলেন, তোমরা তোমাদের আবাসভূমিতে থেকে যাও, তোমাদের 'আমলে কোন ঘাটতি হবে না।

এই বহিরাগত শিক্ষার্থীগণ তথা আরব প্রতিনিধিদলের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সদস্যগণের থাকার ব্যবস্থা করা হতো সাধারণভাবে রামলা বিন্‌ত ছা'লাবা আল-আনসারিয়্যার (রা) গৃহে। এটাকে 'দারু আদ-দিয়াফা' বা অতিথি ভবন বলা হতো। এই বাড়িটি ছিল বেশ বড়। বানূ কুরায়জার ছয়- সাত শো কয়েদী এখানে রাখা হয়েছিল। মূলত এটাই ছিল বহিরাগত শিক্ষার্থীদের আবাসস্থল। এখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হয় তুজীব, বানূ মুহারিব, খাওলান, বানূ কিলাব, বুজায়লা, বানূ হানীফা, গাস্‌সান, 'আযরাহ্, রুহাবীন, মুযহিজ, নাখা' প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধিদলের ব্যক্তিবর্গ ও সদস্যদের।

এছাড়া প্রয়োজন ও বহিরাগতদের মর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য স্থানেও থাকার ব্যবস্থা করা হতো । গামিদ প্রতিনিধিদলটি অবস্থান করেন জান্নাতুল বাকী'তে। দাওস গোত্রের

প্রতিনিধিদলে আবূ হুরাইরাও (রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'হার্‌রাতু আদ-দুজাজ'-এ তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। বালী প্রতিনিধিদলটিকে তিনি বানূ জুদায়লা এলাকার একটি বাড়িতে রাখেন। কিন্দা প্রতিনিধিদলের সাথে হাদরামাওতের প্রতিনিধিদলও ছিল। তাঁদের সঙ্গে ইয়ামানের শাহী খান্দানের কয়েকজন সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওয়ায়িল ইবন হাজার আল কিন্দীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের মর্যাদার উপযুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদেরকে 'হাররা' এলাকায় রাখার জন্য মু'আবিয়াকে (রা) নির্দেশ দেন। ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে মুগীরা ইবন শু'বা (রা) নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন।

বানূ মালিক প্রতিনিধিদলটির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে নববীর আঙ্গি'নায় তাঁবু স্থাপন করেন। যুবায়দ গোত্রের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বিখ্যাত অশ্বারোহী যোদ্ধা 'আমর ইবন মা'দিকারাব ছিলেন। মাদীনায় পৌছে তিনি জিজ্ঞেস করেন, বানূ 'আমর ইবন 'আমির- এর নেতা কে? মানুষ সা'দ ইবন উবাদার (রা) নাম উচ্চারণ করলে তিনি তাঁর বাহনের মুখ তাঁর বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেন। সা'দ (রা) তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং আরব লোক কাহিনী ও বংশীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আদর আপ্যায়ন করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে হাজির করেন। বাহ্‌রা' গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মাদীনায় এসে মিকদাদ ইবন আসওয়াদের (রা) বাড়ির দরজায় থামেন। দাবা'আ বিন্‌ত যুবায়র ইবন 'আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমরা বানূ জুদায়লায় আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) আমাদের নিকট আসেন এবং আমরা নিজেদের জন্য যে হালুয়া তৈরি করেছিলাম, সেই পাত্রটি উঠিয়ে নিয়ে যান। সেই হালুয়া দিয়ে বাহ্‌রা' প্রতিনিধিদলটির আতিথেয়তা করেন। দলটির সকল সদস্য পেট ভরে খাবার পর যা অবশিষ্ট ছিল তা আমাদের নিকট ফেরত আসে।

সাদা' গোত্রের প্রতিনিধিদলটিকে সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি নিয়ে প্রথমে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং অত্যন্ত তা'জীমের সাথে তাদের আতিথেয়তা করেন। তারপর আবার তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। ফারওয়া ইবন মাসীক আল মুরাদীও সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) বাড়িতে অবস্থান করে কুরআন শেখেন এবং ইসলামের ফরজসমূহ ও শরী'আতের বিধি-বিধানের তা'লীম নেন। রুয়াইফি' ইবন ছাবিত বালাবী (রা) পূর্ব থেকেই মাদীনায় থাকতেন। তিনি বলেন আমার গোত্র বানূ বালা'র প্রতিনিধিদল মাদীনায় আসলে আমি তাদেরকে বানূ জুদায়লায় আমার বাড়িতে নিয়ে যাই এবং প্রাথমিক সেবা- আপ্যায়নের পর তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট নিয়ে যাই। তাঁর সাথে অবস্থানকালীন

সময়ে তাঁরা দীনের তা'লীম নেন। তারপর আমি তাদেরকে আবার আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে পেছনে খেজুরের ঝুড়ি নিয়ে এসে বলেন, এগুলো অতিথি সেবায় ব্যবহার করবে। অতিথিরা অন্যদের দেয়া খেজুরের সাথে এই খেজুরও খেত।

স্থানীয় শিক্ষার্থী তথা আসহাবে সুফ্ফার খাবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আবূ হুরাইরা (রা), আর মু'আয ইবন জাবাল (রা) ছিলেন খেজুরের কাঁদির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে। বহিরাগত শিক্ষার্থী তথা আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদলের খাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন বিলাল (রা), আর তাঁর সহকারী ছিলেন ছাওবান (রা)। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের আদর- আপ্যায়ন, আতিথেয়তা ও মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। বানূ হানীফার প্রতিনিধি দলটি অবস্থান করতো দারু রামলা'-তে। বিলাল (রা) সকাল- সন্ধ্যা দু'বেলা তাদের খাবার পৌছাতেন। হিমইয়ার গোত্রের প্রতিনিধিদলটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে (রা) নির্দেশ দেন, তাদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে আতিথেয়তা করবে। সালামান- এর প্রতিনিধিদলটি আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের খাদিম ছাওবানকে (রা) বলেন, যেখানে প্রতিনিধিদল সমূহ থাকে তাদেরকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা কর। 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলটি দশ দিন পর্যন্ত রামলা বিন্ত হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান করে, আর এ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের অতিথি সেবা চলতে থাকে। তুজীব গোত্রের প্রতিনিধিদলটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে (রা) নির্দেশ দেন, তাদের আতিথেয়তা যেন ভালো মত হয়। মুহারিব- এর প্রতিনিধিদলটি রামলা বিন্ত হারিছ- এর গৃহে অবস্থান করে এবং বিলাল (রা) সকাল- সন্ধ্যা দু'বেলা তাদের খাবার পৌঁছাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাককা' গোত্রের প্রতিনিধিদলটির থাকা-খাওয়ার ব্যাপারেও বিশেষ নির্দেশনা দান করেন।

কোন কোন সময় প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি হতো। তাদের সকলের থাকা, খাওয়া ও ঘুম বিশ্রামের আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হতো। আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলে ছিল বিশ জন, তামীম গোত্রের দলে ছিল এগারো জন পুরুষ, এগারো জন নারী, তিরিশ জন শিশু। একটি বর্ণনা মতে তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল নব্বই জন (৯০)। বুজায়লার দলে ছিল এক শো পঞ্চাশ (১৫০), নাখা'র দলে ছিল দু' শো (২০০)-এবং মুযায়নার দলে ছিল চার শো (৪০০) জন সদস্য। থাকা-খাওয়া ও আদর-আপ্যায়নের সাথে সাথে আরবের প্রথা অনুযায়ী প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যবান হাদিয়া-তোহফাও দেয়া হতো। অন্য কথায়, বহিরাগত শিক্ষার্থীদের যাওয়া-আসার খরচ, পাথেয়, সবকিছু শিক্ষা

মাজলিসের খরচের খাত থেকে দেয়া হতো। আর এ অর্থ আসতো বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে আসা অর্থ থেকে।

৪৯. লেখার সাহায্য গ্রহণ

তা'লীম ও তাবলীগ (শিক্ষাদান ও প্রচার)-এর কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেখার সাহায্যও নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পনের জনেরও অধিক কাতিব বা লেখক ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনে কুরআন লিখতেন। এছাড়া আরো কিছু কাতিব ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত যে সকল পত্রাদি পৌঁছাতেন তা লিখতেন। এর বাইরে আরো কিছু লেখক ছিলেন যাঁরা অন্যান্য লেখালেখির সাথে জড়িত থাকতেন।[১৮১]

যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনে কুরআন লিখতেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লোখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, চার খলীফা: আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা)। এছাড়া অন্যরা হলেন: যায়িদ ইবন ছাবিত, উবাই ইবন কা'ব, যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম, খালিদ ইবন সা'ঈদ, তাঁর ভাই আবান ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আস, হানজালা ইবন আর-রাবী, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তিনি তাঁদেরকে ডাকতেন এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ -এর মুখ থেকে শুনে লিখে ফেলতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত সাহীহ হাদীছের মধ্যামে জানা যায় যে, তিনি কোন কোন সাহাবীকে হাদীছ লেখার অনুমতি দেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন সাহাবীকে লেখার নির্দেশও দেন। এখানে লেখা বিষয়ক কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপিত হলো :

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন:[১৮২]

كنت أكتب كلّ شيئ أسمعُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدُ حفظهُ، فنهتني قريش، وقالوا! أتكتُبُ كلّ شئٍ تسمعُهُ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم

---

১৮১. 'আবদুল হাই আল- কাত্তানী, আতা- তারাতীব আল-ইদারিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১১৪
১৮২. আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪, কিতাবুল 'ইলম 'বাবুন ফী কিতাবাতিল 'ইলম

بشرٌ يتكلم في الغضب والرِّضَا؟ فأمسكتُ عن الكتاب أى الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليـــه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال : اكتُبْ فوالـــذى نفسى بيده مايخرُجُ منه إلاَّحق.

আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে যা কিছু শুনতাম সবই লিখে রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য হতো তা মুখস্থ করা। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে বারণ করলো। তারা বললো : তুমি যা কিছু শোন সবই লিখে নাও? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-একজন মানুষ, তিনি রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় কথা বলেন। আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং সব কথা রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালাম। তিনি নিজের আংগুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন : তুমি লেখ। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। সেখান থেকে সত্য ছাড়া কিছুই বের হয় না।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-মক্কা বিজয়ের পর জনগণের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানের পর তিনি বলেন :

إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهـــا رســوله والمؤمنين، فإنها لا تحلُّ لأحـــد بعـــدى، فـــلا ينفـــر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولاتحلُّ لُقَطَتُها إلاَّ لمُنشد، ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يُقَيد.

আল্লাহ হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ ঠেকিয়ে দেন এবং তার উপর স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। আমার পরে এই মক্কা আর কারো জন্য হালাল হবে না। সুতরাং এখানকার শিকারকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না, কাটাযুক্ত উদ্ভিদ

ও গাছপালা উপড়ানো যাবেনা, পড়ে থাকা জিনিস একমাত্র মালিক ছাড়া কারো জন্য হালাল হবে না এবং কোন ঘাতক যদি সেখানে নিহত হয়, তাহলে দু'টি পন্থার যে কোন একটি বেছে নিতে পারবেঃ হয় তার ফিদইয়া বা রক্তমূল্য দেবে অথবা বন্দী করা হবে।

'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তবে 'ইযখির' (এক প্রকার ঘাস), আমরা এ ঘাস আমাদের কবর ও বাড়ির কাজে লাগাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তবে 'ইযখির' ব্যতিক্রম । অর্থাৎ তা উপড়ানো যাবে।

অত:পর আবূ শাহ নামের ইয়ামানের একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কথাগুলো আমাকে লিখে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা আবূ শাহকে কথাগুলো লিখে দাও।[১৮৩]

"আবূ জুহায়ফা (রহ) বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার বিশেষ কিছু অংশ কি আপনার নিকট লিখিত আছে? তিনি বললেনঃ না। তবে আল্লাহর কিতাব আছে। অথবা আছে এমন বোধ ও বুদ্ধি যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়েছে অথবা এই সাহীফায় (পুস্তিকা) যা কিছু লিখিত আছে। আমি বললামঃ এই সাহীফাতে কী আছে ? বললেনঃ এতে আছে মুক্তিপণ, বন্দীমুক্তি এবং কাফিরের বিপরীতে মুসলিমকে হত্যা করা যাবেনা। উল্লেখ্য যে, এ তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের হাদীছও উক্ত পুস্তিকায় ছিল।[১৮৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে তৎকালীন বিশ্বের বহু রাজা বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দের নিকট বহু চিঠি -পত্র পাঠানো হয়েছিল। সেই সকল পত্রে ইসলামের দিকে আহ্বান ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা এবং ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ইতিহাস, সীরাত ও হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ■

---

১৮৩. ছাহীহ আল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ৮৭, কিতাবুল 'ইলমঃ বাবু কিতাবাতিল 'ইলম; মুসলিম, খ. ৯, পৃ. ১২৯, কিতাবুল হাজ্জঃ বাবু তাহরীমি মাক্কাহ্ ওয়া তাহরীমে সাইদিহা

১৮৪. দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ২০৫; ফায়জুল বারী, খ. ১, পৃ. ২১৩

উপসংহার

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা ভাবনা, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করেছি, তার সাথে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রগত মহৎ গুণাবলীরও কিছু আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতো। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। তবুও দু'একটি দিক সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করতে চাই। যেমন আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাক্যালাপের ধরন সম্পর্কে বলেছেন: তিনি তোমাদের মত অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না, বরং ধীরস্থির ভাবে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন। ফলে তাঁর নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথ ভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কথা (প্রয়োজনে) তিনবারও পুনর্ব্যক্ত করতেন, যাতে (শ্রোতা) তাঁর কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

হাসান ইবন 'আলীর (রা) মামা হিন্দ ইবন আবী হালা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুণাবলী বর্ণনাকারীদের একজন। একদিন তিনি ভাগিনা হাসানের (রা) অনুরোধে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেন এভাবে :[১]

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْه وسلم مُتَوَاصِلَ الاَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةَ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلٌ السَّكَتِ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيرِ حَاجَةٍ، يُفْتَحُ الْكَلاَمَ وَ يَخْتِمُهُ بِسم الله تعالى، ويَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وكَلاَمُهُ فَصلٌ، لاَ فُضُوْلَ وَلاَ تَقْصِيْرَ.

لَيْسَ بِالْجَافِيْ وَلاَ الْمُهَيْنُ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَاِنْ دَقَّتْ، لاَ يَذُمُّ مَنْهَا شَيْئاً، غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقاً وَلاَ يَمْدَحُهُ،

---

১. তিরমিযী, আশ- শামায়িল (বিআইসি, ঢাকা) পৃ. ১০৬-১০৭, হাদীছ-২১৭

وَلاَ تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلاَ مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا يُعُدِّىَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَئٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلاَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا.

وَاِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَاِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، وَاِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ اَبْهَامِهِ الْيُسْرَى، وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ، وَاِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرَفَهُ، جُلَّ ضَحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتُرُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (উম্মাতের ভাবনায়) সর্বদা বিষণ্ন ও চিন্তামগ্ন থাকতেন, তাঁর কোন শান্তি ও আরাম ছিল না। দীর্ঘ নিরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। মহান আল্লাহর নামে কথা আরম্ভ ও শেষ করতেন। সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথার শব্দ একটি অপরটি থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হতো। তাঁর কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেমন হতো না, তেমনি কমও হতো না।

তিনি কারো প্রতি কঠোরভাষীও ছিলেন না এবং কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করতেন না। তিনি (আল্লাহর) অনুগ্রহের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন, তা যত ছোটই হোক না কেন এবং কখনো তার নিন্দা করতেন না। খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও তিনি কোনরূপ নিন্দা-মন্দ করতেন না, আবার অহেতুক প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব কোন কিছুর জন্য তিনি রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু সত্য-ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘিত হলে তাঁর রাগ কিছুতেই থামতো না, যতক্ষণ না তার প্রতিকার করা হতো। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না।

তিরি কারো প্রতি ইশারা করলে পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন। কোন বিষয়ে বিস্ময়বোধ করলে তিনি হাত উল্টে দিতেন। যখন কথা

বলতেন, দু'হাতের তালু মিলাতেন, কখনো বা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটে চাপ দিতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন। যখন আনন্দিত হতেন, দৃষ্টি অবনত করতেন। তাঁর বেশির ভাগ হাসিই ছিল মৃদু। তখন দাঁতগুলো বৃষ্টির ফেনার মত দেখাতো।

এই মহান শিক্ষকের একান্ত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :[২]

كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلَبُ شَاتَهُ وَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ.

তিনি (সাধারণ) মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দুইতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন।

'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলতেন :[৩]

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَّلاَ صَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَ يَصْفَحُ.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বভাবগতভাবে যেমন নোংরা ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না, তেমনি ইচ্ছা করেও কখনো অশ্লীলভাষী হতেন না। তিনি হাট-বাজারেও হৈ চৈ ও শোরগোল করতেন না। তিনি অন্যায়ের প্রতিদান অন্যায় দ্বারা দিতেন না, বরং উপেক্ষা ও ক্ষমা করতেন।

হুসাইন ইবনু 'আলী (রা) একবার তাঁর পিতা 'আলীর (রা) নিকট জানতে চাইলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং মাজলিসে উপস্থিত লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহর

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯, হাদীছ-৩২৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২, হাদীছ-৩৩২

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আচরণ কেমন ছিল? 'আলী বললেন :[৪]

كَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عَلَيْه وَسلم دَائمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلاَ صَخَّابٍ وَّلاَ فَحَّاشٍ وَّلاَ عَيَّابٍ وَّلاَ مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِيْ وَلاَ يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيَهُ، وَلاَ يُخِيْبُ فِيْهِ.

قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاَثٍ: الْمِرَاءِ وَالاكْثَارِ وَمَا لاَ يَعْنِيْهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاَثٍ: كَانَ لاَ يَذُمُّ اَحَدًا وَلاَ يَعِيْبُهُ وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهُ.

وَاِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَاَنَّمَا عَلى رَؤْسِهِمُ الطَّيْرُ، فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لاَ يَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثُ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ اَنْصَتُوْا لَهُ حَتّى يَفْرُغَ.

حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهُ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلى الْجَفْوَةِ فِيْ مَنْطِقِهِ وَمَسْئَلَتِهِ حَتّى اِنْ كَانَ اَصْحَابَهُ يَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ، وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتَهُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَّطْلُبُهَا فَارْفَدُوْهُ وَلاَ يَقْبَلُ الثَّنَاءَ اِلاَّ مَنْ مُكَافِيْءٍ وَلاَ يَقْطَعُ عَلى اَحَدٍ حَدِيْثَهُ حَتّى يَجُوْرَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ اَوْقِيَامٍ.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষাণ হৃদয় ছিলেন না, ঝগড়াটেও ছিলেন না,

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫, হাদীছ-৩৩৬

অশ্লীলভাষীও ছিলেন না, ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না এবং অতিরঞ্জিত প্রশংসাকারীও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্খিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কোন প্রত্যাশাকারীকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতেন না, আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না।

তিনি অবশ্যই তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন : ঝগড়া, (কথা বা সম্পদের) আধিক্য এবং অহেতুক (কথা বা কাজ)। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন : কারো দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি কেবল এরূপ কথাই বলতেন যা থেকে সাওয়াবের আশা করতেন।

তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন এমনভাবে নিরব ও স্থির থাকতেন, যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি কথা বন্ধ করলে তাঁরা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তাঁরা কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন না। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নিরব থাকতেন।

তাঁর সাথে তাঁদের প্রত্যেকের কথা তাঁদের প্রথম ব্যক্তির কথার ন্যায় হতো। অর্থাৎ সকলের কথার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন। কোন কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোন বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগন্তুকের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসংগত প্রশ্নে তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন, এমনকি তাঁর সাহাবীগণও যদি সেই আগন্তুককে (তাঁর মাজলিসে) নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন কেউ কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তার সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারিতার প্রশ্রয় দিতেন না, অবশ্য তাঁর উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় নিরব থাকতেন। তিনি কারো কোন কথায় বাধা দিতেন না, যতক্ষণ না সে সীমা লঙ্ঘন করতো। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাজলিসে উপস্থিত সকল সদস্যের প্রতি সমান মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতেন। ফলে প্রত্যেকেই মনে করতেন, তিনিই রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রিয় ব্যক্তি। 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :[৫]

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩, হাদীছ-৩২১

كان يُعْطِيْ كُلَّ جُلَسائِهِ بِنَصِيْبِهِ لاَ يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ اَنَّ احَدًا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنهُ...

সভাস্থ সকলের প্রতি তিনি তার প্রাপ্য দিতেন। ফলে তাঁদের প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট অন্যদের চাইতে অধিক মর্যাদাবান...।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার্থী, জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং দুর্বল মেধার মানুষের প্রতি খুবই বিনয়ী আচরণ করতেন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এর বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এখানে একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করা হলো। :[৬]

عن أبى رفَاعة العَدَ وِى رضى الله عنه قال : انتهيتُ إلى النَّبِى صلى الله عليه وسلم وهو يخطُبُ، قال : فقلتُ : يا رسول الله، رَجُلٌ غَرِيبٌ جاء يسألُ عن دينه، لايدرى مادينُه.

قال : فَأَقبلَ عَلَىَّ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وتَركَ خُطْبَتَه حتى اِنتهى ألىَّ، فأُتى بكرسِىٍّ حَسِبْتُ قَوائمهُ حَدِيْدا، قال : فقَعَدَ عليه رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلَّم وجَعَلَ يُعَلِّمِنُى مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتىَ خُطْبَتَه فأتم آخِرَه.

আবূ রিফা'আ আল- 'আদাবী (রা) বলেন : আমি যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে থামলাম তখন তিনি খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি একজন বহিরাগত মানুষ যে জানে না তার দীন কি, সে তার দীন সম্পর্কে জানতে এসেছে।

---

৬. ইমাম আল-বুখারী, আল-আদাব আল-মুফরাদ, বাবুল জুলূস 'আলাস সারীব; সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আহ; আন নাসাঈ, কিতাবুয যীনাহ্ : বাবুল জুলূস 'আলাল কুরসীয়্যি

তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং ভাষণ বন্ধ করে আমার নিকট আসলেন। একটি চেয়ার আনা হলো। আমার মনে হলো চেয়ারটির পায়া লোহার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর বসে আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তার কিছু আমাকে শেখাতে লাগলেন। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তা বর্ণনা করে কখনো শেষ করা যাবে না। তাই সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরাম (রহ) যখন তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট জানতে চান, তখন তিনি যে জবাবটি দিয়েছিলেন তা ছিলো অতি চমৎকার। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কি আল কুরআন পাঠ করো না? আল-কুরআনই ছিলো তাঁর স্বভাব-চরিত্র।" তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব রূপ। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকেও তেমন করেই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা ছিলেন যেন আল-কুরআনের এক একটা কপি। এ প্রসঙ্গে শহীদ সাইয়্যেদ কুত্ব (রহ)-এর একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টানছি। তিনি বলেন :[৭]

لقد نسخ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عشرات النسخ من المصحف، بل مئات، بل ألوفاً، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، ولكنه نسخها بمدادٍ من النور على صفحات القلوب.

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহু দশ সংখ্যক না, বহু শত সংখ্যক না বরং বহু হাজার সংখ্যক কুরআনের কপি করেন। তবে তিনি তা দোয়াতের কালি দ্বারা কাগজের পৃষ্ঠায় করেন নি; বরং তিনি সে কপি করেছেন নূরের কালি দ্বারা অন্তরসমূহের পৃষ্ঠায়।
তাঁরাই হলেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রী বা সাহাবা। ■

---

৭. উদ্ধৃত, মাহমূদ আল-মিসরী, আসহাবুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাকতাবুস সাফা, কায়রো), পৃ. ৩৫৩